বাঘের জঙ্গলে

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ—কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩
মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

বাঘ ও শিকারী	...	১
শিকারের দুই সঙ্গী	...	১৭
শিকারের প্রথম পাঠ—পালামৌ-রামগড়	...	২০
শিকার সন্ধানে	...	২৫
শিকার প্রয়াসে ধানগাঁই	...	৪৪
কালীপাহাড়ী	...	৫০
মহাদেও স্থান	...	৫৫
বাঘ নয়, ভালুক	...	৬৭
মাধোপুর জঙ্গলে একরাত	...	৭০
বিষণপুর পাহাড়	...	৮২
একতারা—পথের মায়া	...	৮৮
বাঘের পাঞ্জা	...	৯৬
"নবী আক্তার মর্ গিয়া"		১০৫
বনে জঙ্গলে, রজৌলী	...	১১৯
রজৌলি—আর এক রাত	...	১৩১
পরবতার বাঘ	...	১৪১
হাওদা শিকার	...	১৫২
চম্পকারণ্যে	...	১৫৪
চট্টলে—হাতী খেদা	...	১৭০
ভোলার জঙ্গলে—প্যান্থার শিকার	...	১৮০
হরিণ, শম্বর ও অন্যান্য	...	১৮৬
ব্যাঘ্রীর জীবনকথা	...	১৯২

ভূমিকা

কর্ম্মজীবনের ক্ষীণ অবকাশে, ছুটি-ছাটায় শিকারে যেতাম। ক্ষাত্রবৃত্তির তাগিদ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু অরণ্যের আকর্ষণও কম ছিল না। আর একটা আনন্দ ছিল বন্ধুদের সাহচর্য্যে।

আমার চোখে পাহাড় এক বিস্ময়, অরণ্যও এক বিস্ময়। শিকার-সন্ধানে এদের সঙ্গে পরিচয় হ'ত অন্তরের। অরণ্যানীর পাদপ্রান্তে শিকার-ক্যাম্প, সন্ধ্যায় সে হ'ত গল্পমুখর। শুনতাম বিভিন্ন শিকারীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা। রহস্য আর রোমাঞ্চে ভ'রে যেত বাইরের অন্ধকার। আর একে গাম্ভীর্য্য দিত নির্ব্বাক পাহাড়শ্রেণী। মনে হ'ত এরাও কাণ পেতে সব কথা শুনছে। এই গ্রন্থে এই সাব্জেক্টিভ্ দিকটা বিশেষ স্থান লাভ ক'রেছে।

আমাদের শিকারে রাজোচিত ধনাঢ্য আয়োজন ছিল না। তাই অনেক পর্য্যটন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। এই ব্যর্থতা হয়ত পাঠককে পীড়া দেবে। কিন্তু শিকারে সার্থকতাই এর একমাত্র কথা নয়। প্রত্যেক শিকার যদি সার্থক হ'ত, তা'হ'লে শিকারে কোন থ্রিল্ থাকত না। তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা আজও অভিযানকারীকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কত মরণভোলা বীর ভেসে গেছে তুষারস্রোতে; কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা আজও মানুষের অধিগত হয়নি। তাইত অনন্তকাল ধ'রে সে রহস্যে ভরপুর। এই গ্রন্থ প্রকাশের এই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

বইখানা উৎসর্গ করছি বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীশরদিন্দুমোহন ঘোষালকে। এই পুস্তকে তিনি ডাঃ চৌধুরী নামে পরিচিত। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিকারেও তাঁর নেতৃত্ব ছিল সহজ ও সুশৃঙ্খল। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আবাল্য বন্ধু শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এম্. এল্-কে, প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখার্জ্জীকে, শ্রীমতী মণিকাদেবী এম্. এ-কে, অরণ্য-সাধক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালকে, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদকে ও শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেনকে। এঁদের সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

লেখক

বাঘ ও শিকারী

বড় বড় শিকারীরা বলেন, "বনের বাঘের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হয় এমন দুঃসাহসী মানুষ আজও জন্মায়নি।" হাতী এবং গণ্ডারের দেহের শক্তি অসাধারণ, তাদের অবয়বও বৃহত্তর ; কিন্তু বাঘ শুধু অমিত বলশালী নয়, বাঘ জিঘাংসুও। তার চেহারা, দৃষ্টি, গতিভঙ্গী আতঙ্ক সঞ্চার করে।

সমস্ত বৃহৎ জানোয়ার বাঘের খাদ্য। হরিণ, বন্যবরাহ বাঘের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বাঘ হাতীর বাচ্চা মেরে খেয়েছে, ভালুকের মাংস খেয়েছে, ছোট বাঘ মেরে উদর পূর্ত্তি করেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

বাঘের দংষ্ট্রা ও নখর সুদৃঢ় এবং সুতীক্ষ্ণ। বাঁকা ইস্পাতের ছুরির মতই ভগবদ্দত্ত এই দু'টি শাণিত প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বাঘ বড় বড় দুর্দ্ধর্ষ জানোয়ার শিকার করে এবং তাদের হাড় ও মাংসে বিরাট জঠরের জ্বালা নিবৃত্তি করে। বাঘের বিচিত্র দেহ দেখতে ভয়াবহ এবং এর গর্জ্জনও ভয়ানক। এর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ, গতি সম্পূর্ণ শব্দহীন এবং শ্রবণশক্তি অসাধারণ।

যার চেহারা, চোখের দৃষ্টি এবং জিঘাংসা এতই ভয়াল তার আবাসস্থল কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ! স্নিগ্ধ বনভূমি এর বিশ্রামাগার।

পাহাড়ের গায়ে শ্যামল অরণ্যরাজি—মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ দিয়েছে তাকে রূপ ও বৈচিত্র্য। আপাতদৃষ্টিতে এই সৌন্দর্য্যে এতটুকু শঙ্কার অবকাশ নাই। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গান চলেছে—অরণ্যের আঁচল ছুঁয়ে ছুটছে ক্ষীণ নির্ঝর-ধারা। প্রকৃতির এই সুরম্য কাব্যকুঞ্জে যিনি দিবানিদ্রায় সমাহিত, বিশ্বসৃষ্টিতে তাঁর মত হিংস্র ও জিঘাংসু জীব আর দ্বিতীয় নেই।

অপরাহ্নে অরণ্যে ধূসর ছায়া নেমেছে। পাখীর কূজন আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। কদাচিৎ শোনা যায় বৃক্ষারোহী ময়ূরের কেওঁ কেওঁ রব। এবার সুপ্তোত্থিত বাঘ চলেছে ঝরণার দিকে। জলপান করার পর সুরু হবে তার শিকার সন্ধান—শূয়োর, হরিণ বা শম্বর। পদক্ষেপ নিঃশব্দ কিন্তু চোখ ও কাণ জাগ্রত। শিকারের দূরত্ব অনুসারে কখনো চলেছে নীচু হ'য়ে বুকে হেঁটে—কখনো দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ কচ্ছে দৃপ্ত ভঙ্গীতে।

হঠাৎ শম্বরযূথ বা বরাহের পালে বজ্রপতন হ'ল। বাঘ ঝাঁপ দিয়ে তাদের একটাকে ধরেছে। বাকীগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে নদী নালা উপেক্ষা ক'রে উন্মত্ত বেগে ছুটেছে। শুধু আক্রান্ত জানোয়ারটা মাটীতে পা ছুঁড়ছে। তার ঘাড়ের দু' পাশে বাঘের দুটো ধারালো দাঁত বল্টুর মত কষে যাচ্ছে। ক্রমে বাঘের চোয়ালে ধৃত তার শ্বাস রোধ হল—অসাড় দেহ এলিয়ে পড়ল এক পাশে!

এর পরে আরম্ভ হল বাঘের বিরাট ভোজন পর্ব্ব। একবারেই দেড়মণ হয়ত বা দু'মণ! বড় বড় মাংসের ড্যালা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে—কড় মড় শব্দ তুলে চিবিয়ে খায় মোটা মোটা হাড়গুলো।

ভোজনান্তে ঝরণায় জল খেয়ে আবার আশ্রয় নিয়েছে তেমনি নিভৃত ছায়া-স্নিগ্ধ রম্যকুঞ্জে। অর্দ্ধভুক্ত জানোয়ারটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে লতাপাতায়, পাছে কোন অনধিকারী তার শিকারে ভাগ বসায়। পরদিন ফিরে এসে এই বাকী মাংস খেতে হবে যে! বাঘের দুপুরের দিবানিদ্রা শিকারীর উত্তম অবসর। এই অবসরে শিকারীর জন্য মাচা তৈরী হবে গাছের ডালে। ছোট ছোট ডাল কেটে মাচায় আড়াল তৈরী হচ্ছে—বাঘ যখন অপরাহ্নের দিকে অর্দ্ধভুক্ত জানোয়ারটা খেতে আসবে তখন যাতে মাচার শিকারীকে সে দেখতে না পায়।

মাচা-নির্ম্মাণকারী কুলীরা যথা সময়ে কোলাহল ক'রে জঙ্গল

থেকে বেরিয়ে যাবে। কোলাহল তুলে—কারণ দূরে অর্দ্ধজাগ্রত বাঘ বুঝতে পারবে লোকগুলো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু এইটুকু বুঝল না যে সকলেই বেরিয়ে যায়নি—বন্দুকধারী শিকারী লুকিয়ে আছে—বৃক্ষশাখে। যারা নিঃশব্দে মাচা তৈরী কচ্ছিল, মাচা তৈরী হতেই তাদের কোলাহল তুলে বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে যে ছলনা আছে বাঘ তা' বুঝতে পারে না।

গতরাত্রের অর্দ্ধভক্ষিত জানোয়ারটা এবারে নিঃশেষে খেতে হবে। নূতন ক'রে শিকার-সন্ধানের তাগিদ নেই। দুপুরের খানিকটা পরেই বাঘ মাথা তুলেছে। কোন আততায়ী লুকিয়ে নেইত! বাঘের সমস্ত ইন্দ্রিয় সচেতন। প্রত্যেকটী ঝোপঝাড়ে তীক্ষ্ণ নজর—মৃদু নিঃশব্দ গতি।

এবার শিকারী উইলমট অঙ্কিত মাচার চিত্রটী দেখুন। মাচায় লুক্কায়িত শিকারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে। নিজের কাণে বাজ্‌ছে ঐ হৃৎস্পন্দনের শব্দ। ওটাকে রুখ্‌তেই হ'বে। দেহে বা হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্যই চলবে না।

বাঘ এগিয়ে আস্‌ছে। কিলের ষাটগজ দূরে পেছনের দুটো পায়ে ভর ক'রে বসেছে। চারিদিকে চলছে আততায়ী বা প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান—চোখের দৃষ্টি মর্ম্মভেদী। কাণে এতটুকু শব্দ এড়ায় না।

শিকারীর বুকে শব্দ হচ্ছে ধ্বক্ ধ্বক্। এক মুহূর্ত্ত বাঘের দৃষ্টি অন্য দিকে যেতেই শিকারী বন্দুক তুলে নিয়েছে। বাঘ মাচার দিকে তাকিয়েছে সন্দিগ্ধ চোখে। হয়ত সামান্য চাঞ্চল্য তার চোখে পড়েছে। শিকারী নিশ্চল। চোখে পলক পড়ছে না। বাঘের ভুল হ'ল। মারাত্মক ভুল! ঐ নিথর-দেহ শিকারী ঐ বৃক্ষেরই অংশ বিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়—এই সর্ব্বনাশা ভুল আর সংশোধন হ'ল না।

শিকারীর বুকে আর শব্দ নেই, হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক। হস্ত ও

লক্ষ্য দৃঢ় ও অচঞ্চল। বাঘ হাড়-গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে। শিকারীর রাইফেল ট্রিগারের আকর্ষণে গর্জ্জন করেছে গুড়ুম্—গুড়ুম্। বাঘেরও গর্জ্জন শোনা গেল। হয়ত একবার আকাশে লাফিয়ে উঠেছে, তার পর লুণ্ঠিত দেহ এলিয়ে পড়েছে—নড়ছে শুধু লাঙ্গুলটা। আবার রাইফেলের আওয়াজ গুড়ুম গুম্।

এইবারে আর একটি চিত্র দেখুন। এ চিত্রে শিকারী বাঘকে মারেনি। বাঘ শিকারীকে মেরেছে। এই হতভাগ্য শিকারী বাংলার তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ কে, এন, চৌধুরী। এই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল উড়িষ্যার কালাহাণ্ডী অরণ্যে। নরঘাতক বাঘের নৃশংস নরহত্যায় এ অঞ্চলে আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা ছিলনা। এই দুরন্ত বাঘ মারার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হ'ল তখন কালাহাণ্ডীর রুলার আহ্বান জানালেন পরিচিত প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারীকে। প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক শিকারী মিঃ চৌধুরী এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। এই বয়সেও মিঃ চৌধুরীর দেহ-গঠন ছিল অক্ষুণ্ণ, সাহসও ছিল অপরিমিত।

যথাসময়ে বাঘের আশ্রয়স্থান অনুমান ক'রে নিয়ে জঙ্গলে বিট করার ব্যবস্থা হ'ল। কয়েকটী মাচা তৈরী হ'ল এবং শিকারীরা মাচায় আসন গ্রহণ করলেন। মিঃ চৌধুরীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মাচায় তিনি ছিলেন একা। জঙ্গল পেটানো আরম্ভ হ'ল। বিটের প্রথম পর্ব্বে শোনা যায় উচ্চ কোলাহল। উচ্চ কোলাহলের উদ্দেশ্য গাঢ় নিদ্রায় সমাহিত বাঘের ঘুম ভাঙ্গানো। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই বাঘ পেছনের কোলাহলে বিরক্ত হ'য়ে আস্তে আস্তে সামনের শিকারীদের অভিমুখে এগিয়ে চলে। এবারে জাগ্রত বাঘের জন্য উচ্চ কোলাহলের প্রয়োজন নেই তাই হাকোয়ার আওয়াজ তখন মৃদু। এই ক্রমক্ষীয়মান শব্দের অন্য প্রয়োজনও আছে। উচ্চ চীৎকারে জাগ্রত বাঘের অতি দ্রুত বনান্তরে অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

এই বিটের শেষের দিকে রাইফেলের নির্ঘোষ শোনা গেল। শিকারীরা বুঝে নিলেন—মিঃ চৌধুরী ফায়ার করেছেন। রাইফেলের লক্ষ্য যে বাঘ তাতেও কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই বাঘ-শিকারের অলঙ্ঘ্য প্রথা অনুসারে দ্বিতীয় বার রাইফেলে ফায়ার হ'ল না। বিটের শেষে আশা ও উত্তেজনায় চঞ্চল অন্যান্য শিকারী এবং হাকাওয়ালারা মিঃ চৌধুরীর মাচার দিকে অগ্রসর হ'লেন। মাচার কাছে এসে তাঁরা যে দৃশ্য দেখলেন তা মর্ম্মান্তিক! বাঘ কোথাও নেই—মাচার খানিকটা দূরে রক্তাক্ত দেহে প'ড়ে আছেন মিঃ চৌধুরী নিজে! রাইফেলটা প'ড়ে আছে মাচার নীচেই। মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা ও আলো নিভে গেল—এ কথা বলাই বাহুল্য।

মিঃ চৌধুরী ছিলেন অভিজ্ঞ শিকারী। তাঁর রচিত শিকার-গ্রন্থসমূহ ছিল তৎকালীন অন্যান্য শিকারীদের অবশ্য পঠনীয়। তাঁর নিজের সাহস ও শৌর্য্য ছিল অসামান্য কিন্তু হিংস্র জানোয়ার-শিকারে তাঁর সাবধান-বাণী নূতন শিকারীদের শিক্ষা দিয়েছে সংযম ও শৃঙ্খলা। অথচ তিনি নিজেই বৃদ্ধ বয়সে আহত নরঘাতক বাঘের অনুসরণ ক'রে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন এই অনুমানের কোন সঙ্গত হেতু নেই। এই মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে তাঁর বাঘের কবলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি।

আমি নিজে মিঃ চৌধুরীর পক্ষে কোন হঠকারিতার যুক্তি বিশ্বাস করিনে। আমার মনে হয় বাঘ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছিল মাচার অতি সন্নিকটে এবং এই নরমাংস-লোভী বাঘ গুলীবিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শিকারীকে দেখে ফেলেছিল এবং গুলীর সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপ দিয়ে মাচায় উপবিষ্ট চৌধুরীকে আক্রমণ ক'রেছিল।

এই বাঘের মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিল তৃতীয় দিনে খানিকটা

দূরে। বাংলার শ্রেষ্ঠতম শিকারী নিজের প্রাণের বিনিময়ে দিয়েছিলেন এই অঞ্চলে নিরুপদ্রুত শান্তি।

মিঃ চৌধুরীর দীর্ঘ ঋজুদেহ, সমুজ্জ্বল ললাট আমার মনে প'ড়ছে। এই দুর্ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য ঘটেছিল পাটনাতে। তাঁর শিষ্ট অমায়িক আচরণে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম।

শিকারীরা জানেন, অরণ্যের এই দুর্জ্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিংস্র ত বটেই—প্রভূত শক্তিশালী, অসাধারণ ক্ষিপ্র ও তৎপর। জঙ্গল বাঘের আবাস, তার দৃষ্টি অনন্যসাধারণ। অরণ্যের বিচিত্র বর্ণে একাকার বাঘ শিকারীর চোখে পড়ছে না, কিন্তু মানুষের প্রত্যেক পদক্ষেপ, দেহভঙ্গী বাঘ তীক্ষ্ণ নজরে পরীক্ষা করছে। অরণ্যের বৃক্ষরাজি, গুহা-গহ্বর, নালা মানুষের কাছে যা দুর্গম ও দুর্ভেদ্য, বাঘের কাছে তা সহজ। চৌরঙ্গীর জনাকীর্ণ রাস্তায় বারো সিলিণ্ডার লিঙ্কন জেফির মোটর যেমন নিঃশব্দে গড়িয়ে চলে, অরণ্যের সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাঘের গতি তেমনি ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ ও সাবলীল।

বাঘ গাছে চড়তে জানে। ছোট গাছ তার ভারী দেহ বহনের উপযুক্ত নয়, কিন্তু বড় গাছের মোটা ডালে তীক্ষ্ণ নখ ফুটিয়ে দিয়ে সে অবলীলাক্রমে বিশ ফুট উঁচুতে উঠেছে, তার প্রমাণ আছে। শিকারী বার্টন বলেন, শিকার উপলক্ষ্যে জঙ্গল পিটিয়ে বাঘ বের করার সময়ে উনিশ ফুট উঁচু গাছের ডালে মানুষের আওয়াজ শুনে বাঘ ঐ শিকারীটিকে পেড়ে ফেলেছিল। হয়ত এই বাঘ পূর্ব্বে একবার বন্দুকের গুলীতে আহত হয়েছিল—খুব সম্ভবতঃ তখন সে মানুষ দেখতে পেয়ে মানুষকে আততায়ী ব'লে চিনে নিয়েছিল।

বাঘ বড় বড় নদী অনায়াসে সাঁতার কেটে পার হ'য়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ নদীতীর যখন জলের লেভেলের চেয়ে বেশী উঁচু থাকে না, তখনই বাঘ নদী-

সাঁতারে প্রবৃত্ত হয়। ভাঁটার সময়ের নদীর উঁচু খাড়া পাড় আরোহণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাই ভাঁটার সময়ে নদী অতিক্রম করায় প্রবৃত্ত না হওয়া বাঘের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক।

একটা বাঘের ওজন ৬ মণ থেকে ৯ মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। একটা বড় মৃত বাঘকে ২-৩ ক্রোশ রাস্তা বহন ক'রে নিয়ে আসতে ১০-১২ জন জোয়ান পুরুষ হিমসিম খেয়ে যায়। একটা দু'মণ ওজনের বস্তা মানুষের ঘাড়ে হঠাৎ প'ড়ে গেলে, তার কি দুর্দ্দশা হয় আমরা তার কতকটা অনুমান করতে পারি, কিন্তু একটা ৭।৮ মণ ওজনের ভারী জানোয়ার মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে তার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিলে তার কি অবস্থা হয় তার বর্ণনা অনাবশ্যক।

বাঘ হিংস্র জানোয়ার—বাঘ ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। কিন্তু মানুষ দেখতে পেলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এ ধারণাও ভ্রান্ত। যে বাঘ মানুষকে খাদ্যবস্তু বলে জানতে পারে নি, সে আড়াল থেকে মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করবে, কিন্তু খামোকা আক্রমণ করবে না। মানুষকে বাঘ যেদিন ভক্ষ্য বস্তু ব'লে চেনে, সেদিন থেকে বাঘ নরখাদকে পরিণত হয়। এই নরখাদক বাঘের মত মানুষের বৈরী আর নেই।

কিন্তু নরখাদক বাঘ ছাড়া সাধারণ বাঘ কি মানুষ খায় না? নিশ্চয়ই খায়। মানুষ তার খাদ্য। যে কারণে সাধারণ বাঘ ভীষণ মানুষখেকো হয়ে ওঠে তা সাধারণতঃ এই ঃ—

১। কোন শিকারীর গুলীতে আহত বাঘ মানুষ দেখতে পেলে আক্রমণ করে। এই মানুষের মাংস খেয়ে বাঘ নরখাদক বাঘে পরিণত হয়।

২। মানুষ মেরে খাওয়া কত সহজসাধ্য যেদিন বাঘ এই তথ্য আবিষ্কার করে, সেদিন থেকে মানুষের মাংসে তার লিপ্সা বেড়ে ওঠে। একটা ছাগল, গরু বা ভেড়াকে ধরলে, তারা আত্মরক্ষায়

বাঘকে শিং দিয়ে গুঁতোবার চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে বাঘের কোন লড়াইয়ের প্রয়োজন হয় না।

৩। দাঁতে পাইওরিয়া-রোগগ্রস্ত বাঘ বনের জানোয়ার ধ'রে খেতে বা তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে অনিচ্ছুক হ'য়ে মানুষ ধ'রে খেতে আরম্ভ করে।

৪। মানুষখেকো বাঘিনীর শাবক তাদের জননীর সঙ্গে মানুষ ধ'রে খেতে শিখে নরখাদক হ'য়ে ওঠে।

৫। মানুষের নিকট-সান্নিধ্যে বিরক্তি বা সন্দেহবশে হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে। তখন মানুষ কত সহজ-শিকার এবং সুখাদ্য, বাঘ তা বুঝতে পারে। বাঘ নরখাদক-বাঘে পরিণত হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে, কিন্তু উপরে লিখিত কারণগুলিই প্রধান।

শিকারী ডানবার ব্রাণ্ডিয়ার বলেন, বাঘ ও বাঘিনীর একসঙ্গে বিচরণ বা মিলন-সময়ে মানুষ দেখতে পেলে বাঘ বিশেষ হিংস্র হয়ে ওঠে। উক্ত শিকারীর অনুচর এইরূপ বাঘের আচরণে কিরূপ বিপন্ন হয়েছিল, তার বর্ণনা উক্ত ধারণার সমর্থক।

শিকারীর অনুচর বনপথে ভ্রমণসময়ে দু'শ গজ সম্মুখে একজোড়া বাঘ দেখতে পায়। দৈবাৎ বাঘ সামান্য সন্দেহে মানুষ পেছনে দেখতে পেয়ে তাড়া করে। ভৃত্য উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্যে মাথার পাগড়ীটা বাঘের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিকটে যথাসম্ভব দ্রুত একটা গাছে আরোহণ করে। বাঘ সন্দেহবশে পাগড়ীটাকে খানিকক্ষণ নাড়া-চাড়া ক'রে ঐ অপূর্ব্ব জিনিষটার মতলব বুঝতে কিছু সময়ক্ষেপ করে। এই সুযোগে ভৃত্য গাছের মগডালে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গাছ খুব বড় ছিল না, তাই বাঘ গাছে চ'ড়ে আক্রমণের সুযোগ না পেয়ে দাঁত ও নখরের সাহায্যে গাছকে জর্জ্জরিত করছিল এবং গর্জ্জন ক'রে ভৃত্যকে তার শাসন জানাচ্ছিল। সমস্ত রাত বিপন্ন ভৃত্য বৃক্ষশাখায় কম্পিত-

দেহে যাপন করে। কারণ বাঘ মাঝে মাঝে চ'লে গিয়ে আবার ফিরে এসে গাছ আগলে ব'সে থাকে। ভোরে অনেকক্ষণ বাঘের অনুপস্থিতি লক্ষ্য ক'রে ভৃত্য অবরোহণের উপক্রম করতেই আবার বাঘ আড়াল থেকে ফিরে এসে অনুরূপ আচরণ করে। বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হ'তে কাঠুরেদের গরুর গাড়ীর চাকার কচ্ কচ্ শব্দ শুনে বাঘ হয়ত স্থানান্তরে চ'লে যায়। ভৃত্য তখন কাঠুরেদের সাহায্যে নেমে আসে।

বরিশাল জিলার একটা জঙ্গল-সন্নিহিত গ্রামে এইরূপে একটা লোক সমস্ত রাত খেজুরগাছের কণ্টকাকীর্ণ বাগড়ার ভেতর কাটিয়েছিল। রাত্রে বাঘের গর্জ্জনে কেউ বাইরে আসতে সাহসী হয় নি। দিনের বেলা এই হতভাগ্যের কণ্টকক্ষত অর্দ্ধমৃত দেহ বহু কষ্টে নামিয়ে এনেছিল।

টাইগার, লেপার্ড ও প্যান্থার

টাইগার ও স্পট-টাইগার বা লেপার্ডের শিকার-ধরার পদ্ধতি প্রায় একপ্রকারের। আমরা যে বাঘকে সাধারণতঃ চিতাবাঘ বলে থাকি—বস্তুতঃ সেগুলি চিতাবাঘ নয়। "চিতাবাঘের সরু ঠ্যাং"—এই সরু ঠ্যাং-ওয়ালা দীর্ঘদেহ চিতাবাঘ ভারতবর্ষে বিরল। ইংরেজী লেপার্ড বা প্যান্থার বা স্পট-টাইগারের দেশী নাম 'গুল্‌বাঘ'। কোন্ বাঘ লেপার্ড, প্যান্থার বা কে—এই বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞ শিকারী-মহলে বহু আলোচনা হয়েছে—কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নি। কিন্তু একথা অধিকাংশের মতে স্বীকৃত যে, অরণ্যের রকমভেদে—বাসস্থানের পার্থক্যে—যেমন ঝোপঝাড়ের জঙ্গল কিম্বা ঘন অরণ্য-সঙ্কুল পাহাড় এবং সূর্য্যালোকের তারতম্যে এদের আকার, গায়ের চাকা দাগ ও মুখের গঠনে বৈষম্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই

নামে বিভিন্ন বাঘের কল্পনা ভিত্তিহীন। ব্যাঘ্রহস্তে নিহত বিখ্যাত শিকারী কে, এন, চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন, টাইগার ও লেপার্ডের অবয়ব ও দেহের ষ্ট্রাইপ্‌স্‌ ও চাকা-দাগও উল্লিখিত কারণে বিভিন্ন। আসলে এই দুই জানোয়ারের মূল প্রকৃতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। চৌধুরীসাহেবের এই যুক্তি নিতান্ত অমূলক মনে হয় না। দেশ ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে মানুষের মধ্যেও কেউবা চেপ্টা নাক ও হ্রস্বদেহ—কেউবা দীর্ঘদেহ কাবুলী—কেউবা কাফ্রী। মূলতঃ সকলেই এক। কোনো কোনো শিকারী বলেন—যে বাঘের দেহের অর্দ্ধ-বৃত্তগুলি সম্পূর্ণ কালো সেগুলি লেপার্ড, আর যে বাঘের দেহের বৃত্তের পরিধি-রেখাই কালো, বৃত্তের মধ্যাংশ ব্রাউন, সেগুলি প্যান্থার। এই উক্তির সমর্থন অন্যত্র আছে কিনা আমি সে সংবাদ অবগত নই।

লেপার্ড টাইগারের চেয়ে আকারে ছোট, কিন্তু হিংস্রতায় তার জোড়া নেই। লেপার্ড লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় নিলে চাষীদের দুঃখ, ভয় ও বিপদের আর সীমা থাকে না। এরা অতি সামান্য আড়ালে বেমালুম লুকিয়ে থাকতে পারে—আর সময় বুঝে গোশালা থেকে গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, কুকুর মুখে ক'রে নিয়ে পালায়। এই সকল জীব লেপার্ডের উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু লেপার্ড বিনা কারণেও হত্যা করে—গরুর পালে ঢুকে, রাখালকে ভয় দেখিয়ে হয়ত পাঁচ-ছ'টা গরু-বাছুর মেরে ফেলবে, বা জখম ক'রে মাত্র একটাকে মুখে ক'রে পালিয়ে যাবে। টাইগার সাধারণতঃ এরূপ অকারণে হত্যা করে না। লোকালয়ের সান্নিধ্যে বাস ক'রে লেপার্ড মানুষের হালচাল, অভ্যাস সম্পর্কে সর্ব্বদা ওয়াকিবহাল, তাই মানুষকে সে গ্রাহ্য করে না। সাহস তার অতুলনীয়, কিন্তু শিকারের জানোয়ার অনুসরণ বা স্টক্‌ ক'রে ধরে ব'লে শিকার-পদ্ধতি তার দ্বন্দ্বযুদ্ধের মত নয়…আক্রমণটা চোরাগোপ্তা…পেছন থেকে

ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। বড় বাঘের সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

লেপার্ড মানুষখেকো বাঘে পরিণত হ'লে সে টাইগারের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও হিংস্র, এবং বুদ্ধি-কৌশলে টাইগার তার সমকক্ষ নয়।

লেপার্ডের অভক্ষ্য বোধ হয় কোন জানোয়ার নেই। গরু, বাছুর, ছাগল, মোষ, ভেড়া, কুকুর, সজারু, গোসাপ, খরগোস, শুয়োর, মাছ প্রভৃতি সুবিধা সুযোগ ও ক্ষুধা অনুযায়ী কোন জানোয়ারেই তার অরুচি নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই বিবিধ জানোয়ারকে শিকার ক'রে খেতে হয় ব'লেই লেপার্ডের বুদ্ধি ও কৌশল টাইগারের চেয়ে প্রখরতর। বাঘ এবং স্পট্-টাইগারের মধ্যে কোন্ জানোয়ার বেশী হিংস্র ও বিপজ্জনক—এক কথায় এর জবাব—স্পট্-টাইগার বা লেপার্ড। কিন্তু টাইগারের দেহের আয়তন বিশাল, লেপার্ডের চেয়ে সে অধিকতর শক্তিশালী; তার গর্জ্জনও ভয়ঙ্কর। তাই টাইগার-শিকারে যা প্রয়োজন—তা হচ্ছে অধিকতর সাহস ও নার্ভ।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, কোন বাঘ মানুষ দেখলেই আক্রমণ করবে এ প্রচলিত ধারণা যেমন সত্য নয়, তেমনি নরখাদক বাঘ না হ'লে মানুষকে আক্রমণ করে না এই বিশ্বাসও ভ্রান্ত। যে বাঘ লোকালয় থেকে বহু দূরে গভীর জঙ্গলে বা পাহাড়ে বাস করে তারা অরণ্যচারী বরাহ, মৃগ প্রভৃতি শিকার ধ'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু যে বাঘ পল্লীসন্নিহিত অরণ্য-অঞ্চলের অধিবাসী, তারা মাঠে-চরা গরু, মোষ বা গোশালা থেকে ঐ সকল জানোয়ার ধ'রে উদরপূর্ত্তি করে। বিশেষ অভিজ্ঞ শিকারীরা বলেন, পল্লী-অঞ্চলের এইসকল বাঘ দুর্গম অরণ্যচারী বাঘের চেয়ে বৃহদাকার। এরা সহজলভ্য গো-মহিষের মাংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন ক'রে ধনী-গৃহের শ্রমকুণ্ঠ দুলালদের মত নধর ও হৃষ্টপুষ্ট দেহগঠন লাভ ক'রে

থাকে। লোকালয়-সন্নিহিত এইসকল বাঘ রাখালের সতর্ক পাহারায় গো-মহিষাদি পশু শিকার ক'রে খেতে অক্ষম হ'লে মানুষ ধ'রে খেতে আরম্ভ করে।

যে অঞ্চলে নরখাদক বাঘ আছে, সে দিকের অরণ্যে, পথঘাটে চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে। ক্রমে গ্রাম পরিত্যক্ত ও জনহীন হয়। এই বাঘ তখন গ্রামান্তরে হানা দেয়। তখন আবার সেদিকে আতঙ্ক আর ত্রাসের সীমা থাকে না। রোদন, আর্ত্তনাদ, ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র ফেলে গৃহস্থদের পালিয়ে যাওয়া দৈনন্দিন ঘটনা। ব্যারাম-পীড়া নয়, মহামারী নয়, একটি জীবন্ত রাক্ষস—তার বিরাট এবং রোমাঞ্চকর দেহ ও সুতীক্ষ্ণ দন্ত নিয়ে মানুষকে তাড়া করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস! মানুষের ঘাড় মটকায়, শিকারীকে ছিঁড়ে খায়, কিন্তু বাঘের জিঘাংসা আর হত্যার বিরাম নেই।

ম্যান-ইটারের দৌরাত্ম্যে এক সময়ে হাজারীবাগ অঞ্চলে ডাকহরকরা দুর্ঘট হয়ে গিয়েছিল। হরকরার হাতের বল্লমের সংলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি শুনে বাঘ তাকে মুখে ক'রে অদৃশ্য হ'ত। নূতন হরকরা এলে আবার একই প্রকারে তার জীবনান্ত হ'ত।

সুন্দরবনের বাঘগুলি অধিকাংশই ম্যান-ইটার, উত্তরাধিকারসূত্রে শাবকেরা মানুষ-শিকার শিখে নিয়েছে। রোটাসগড়ের মানুষখেকো বাঘের কাহিনী সুবিদিত। মানুষখেকো বাঘের দু'একটা কাহিনী উপস্থিত করলে এই বাঘের বিভীষিকার স্বরূপ উপলব্ধি হবে।

সার ই ইয়ার্ডলি লিখেছেন—দুটি রাখাল কিশোর বনের কিনারায় কুঁড়েঘরে বাস করত। তাদের কাজ ছিল শুধু দিনের বেলা বনে গরু-মহিষ চরানো। রাত্রে তারা নিজের হাতে রান্না ক'রে আহার করত। ঘটনার দিন রাত্রে তারা অন্যান্য দিনের মতই রাত্রের আহার প্রস্তুত কচ্ছে। নর-খাদক বাঘ যে তাদের পিছু

নিয়েছে, তার কোন সন্ধানই তারা জানতনা। হঠাৎ বাঘ নিঃশব্দে কুটিরে প্রবেশ ক'রে অতর্কিতে এক ভাইকে মুখে ক'রে বেরিয়ে গেল। জঙ্গলে বাস করে, বাঘ দেখলেই অজ্ঞান হওয়ার অভ্যাস তাদের নেই, তাই দ্বিতীয় ভ্রাতা উচ্চ চীৎকারে বাঘকে তাড়া ক'রে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। রাখালের চীৎকার ও তাড়নায় বাঘ মুখের গ্রাস ফেলে পালিয়ে গেল। অপর রাখাল এই আহত ভাইকে বুকে ক'রে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রতীক্ষা কচ্ছিল কখন রাতের অবসান হবে, কখন ফুটবে দিনের আলো। দরজাটা বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দিয়ে কুটিরের অন্য জীর্ণ অংশ আড়াল ক'রে বাঘের প্রবেশপথ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ—দিনের আলোর প্রতীক্ষাও আর করতে হ'ল না। রাত গভীর হ'তেই বাঘ কেমন ক'রে ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় রাখালকে মুখে ক'রে পালিয়ে গেল। বাঘের কবলে ছিন্নভিন্ন-দেহ ঐ প্রথম রাখালের চোখের সামনেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। আতঙ্ক ও দংশনের জ্বালায় পরদিন সেও মারা গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে আতঙ্কিত পল্লীবাসীদের কাছে এই নিদারুণ ঘটনা সে বর্ণনা করছিল।

শিকারী বার্টন-লিখিত আর একটি ঘটনাও মর্ম্মন্তুদ। ঘটনাস্থল ভূটান ডুয়ার্স। গ্রামপ্রান্তের মাঠে চাষীরা কাজ করছে। বাঘের ভীষণ গর্জ্জন শুনে চাষীরা চেয়ে দেখল, বাঘ একটি বালককে দাঁতে ঝুলিয়ে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। চাষীরা আতঙ্কে পালিয়ে গেল, কেউ ছুটে গেল আপন পুত্র-কন্যার সন্ধানে। নিকটে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের তাঁবুতে খবর পৌঁছুতেই তিনি হস্তীপৃষ্ঠে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। সেখানে ভিড় জমেছে, আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলের মুখেই আতঙ্ক ও উত্তেজনা পরিস্ফুট। হঠাৎ ভিড় ঠেলে এক রমণী ছুটে আসছে—তার জীর্ণ বেশ ও রুক্ষ কেশ ধূলি-মলিন। তার মুখে চীৎকার—'দোহাই সরকার, বিচার করুন। রাক্ষস আমার

ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে। আমার ছেলে—আমার একমাত্র ছেলে—আমার গোপাল।'

গ্রাম্যজনতা ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের মর্য্যাদা রক্ষা করতে উন্মাদিনী নারীকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছিল। সাহেব তাদের ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করলেন। হাতী থেকে নীচে নেমে বৃদ্ধার মাথায় আঙ্গুল চালিয়ে অভয় দিলেন। নারী আর সান্ত্বনা মানছে না, শুধু চেঁচাচ্ছে—'সরকার, এই সয়তান গত বছর আমার স্বামীকে গ্রাস করেছে, এবছর আমার গোপালকেও কেড়ে নিলে, রাক্ষস আমাকেও খেয়ে ফেলুক।'

সাহেব শিকারের আয়োজনে অন্যমনস্ক হ'তেই নারী ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই জলাশয়-সন্নিহিত জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। সাহেবের চেষ্টায় সেবারে তাকে সবলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল, কিন্তু খানিক পরেই আবার সে জঙ্গলের উদ্দেশে ছুটেছে। ছেলের নাম ধ'রে চীৎকার করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বাঘের একটা গর্জ্জন শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তপরেই দেখা গেল বাঘ তীরবেগে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অন্য জঙ্গল লক্ষ্য করে ছুটেছে। জঙ্গল থেকে পুত্রহারা নারী বেরিয়ে এল— কোলে তার রক্তাক্ত মৃতপুত্র।

হাতী ও লোকজন দিয়ে জঙ্গল ঘিরিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হাওদায় ব'সে এই বাঘ মেরেছিলেন। সকলে কোলাহল ক'রে যখন বাঘ নিয়ে এল, স্বামীপুত্রহারা অভাগিনী তখন মৃতপুত্রের মুখে কথা ফুটোবার চেষ্টা করছে।

কিছুদিন আগের ঘটনা। ঘটনাস্থল উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চল। একদিকে বোধরাজ্য, অন্যদিকে আটমল্লিক। মধ্যে খরস্রোতা মহানদী।

বোধরাজ হিজ হাইনেস্ আটমল্লিকরাজকে বাঘ শিকারের অনুরোধ জানিয়েছেন। নরখাদক বাঘের দৌরাত্ম্যে এ অঞ্চল উৎসন্নপ্রায়। হাটে মাঠে সর্ব্বত্র বিভীষিকা। অনেকেই এই পল্লী অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে, যারা পালায় নি তারা সর্ব্বদা ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। জনবিরল হাটবাজারের বেচাকেনা দুপুরেই শেষ হ'য়ে যায়। বেলাশেষে আর লোকচলাচল নেই, হঠাৎ স্তব্ধ অপরাহ্ন চিরে দিয়ে জাগে রমণীর আর্ত্তনাদ। ভাঙ্গা কলসী মাটীতে লুটোয়—বাঘ মুখে ক'রে নিয়ে যায় জলান্বেষিণীকে।

হিজ্ হাইনেসের তাঁবু প'ড়েছে মহানদীর তীরে। অপরাহ্নে ঝড় এল। অধিকাংশ তাঁবুই উড়ে গেল। হঠাৎ তাঁবু সংলগ্ন একটা গাছ ভেঙ্গে গেল। লোকজন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল দৈবাৎ। ঝড়ের ভয়, অন্ধকারে নরখাদক বাঘের আতঙ্কে সকলেই ম্রিয়মাণ। এই মহা বিপর্য্যয়ে হিজ্ হাইনেস্ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। আর্ত্ত অনুচরদের কাজে নিজের হাতে সাহায্য দিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন, দিচ্ছেন সাহস ও কর্ম্মে উৎসাহ। কয়েক ঘণ্টা পরে ঝড়ের বেগ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ব্রিজ খেলছেন।

পরদিন প্রত্যূষে দেখা গেল গ্রামের চেহারা সম্পুর্ণ বদলে গেছে। বড় বড় গাছগুলি ধরাশায়ী হয়েছে। ছোট গাছের ডালপালা ভেঙ্গে গেছে। কাঁচা ঘরের চাল উড়ে গেছে। সমস্ত পল্লী অঞ্চল ছিন্নভিন্ন, লুণ্ঠিত। হঠাৎ বোধরাজের কাছ থেকে খবর এল, গ্রামের পণ্ডিত মশাইকে কাল অপরাহ্ন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

হিজ্ হাইনেস্ ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর কুমার বাহাদুর হাতী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন পণ্ডিত মশাইয়ের দেহের সন্ধানে। সন্ধ্যায় ব্যর্থকাম হ'য়ে ফিরে এলেন—পণ্ডিত মশাইয়ের ছাতাটী পাওয়া গেছে, দেহের কোন সন্ধান হ'লনা। তার পরদিন হাতীর মাহুতের এল জ্বর। কুমার বাহাদুরের অবস্থা তথৈবচ। কিন্তু যে ব্রত নিয়ে তিনি

অগ্রজের সহায়তায় এসেছেন সে কাজ শেষ না ক'রে তিনি রাজধানীতে ফিরে যাবেন না।

অপর আনাড়ী মাহুত নিয়ে রাজা চললেন জঙ্গলে, সঙ্গে দোসর কুমার বাহাদুর। তাঁর জ্বরের উত্তাপ তখন আরও চড়েছে।

আনাড়ী মাহুতের আদেশ হাতী মানছেনা; খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অথবা বেগে চলে যায় অন্য পথে। কুমার বাহাদুর রাইফেল হাতে নেমে গেলেন জঙ্গলে একটা বিশেষ শব্দ লক্ষ্য ক'রে। জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়েছে রক্তচক্ষু গুণ্ডা হাতী। কুমার নিমেষে গুলী করলেন। হাতীটা প'ড়ে গেল একটা পাহাড়-স্তূপের মত।

পরদিন খবর এল, মানুষ মারার নয়, গরু মারার। রাজা জানতেন—ম্যান-ইটার বাঘ, বৃদ্ধ বা দাঁত সম্পর্কে নিতান্ত অপটু না হ'লে, গরু মোষও ধ'রে খায়। সন্ধান ক'রে কিল পাওয়া গেল, মাচাও তৈরী হ'ল। অপরাহ্ণের দিকে রাজা মাচায় ব'সেছেন। এবারে তাঁর স্থৈর্য্যের চরম পরীক্ষা। আবার এল ঝড় আর বৃষ্টি। মাচা বুঝি উড়ে যায়। গোলাগুলি বৃষ্টির জল থেকে বাঁচান দায়। আশেপাশের চাল ভেঙ্গে প'ড়ছে। যদি মাচার ডাল ভেঙ্গে পড়ে! নরখাদক বাঘ যে ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে আছে! কিন্তু বাঘ-শিকারীর সর্ব্বাপেক্ষা যা প্রয়োজন—চাঞ্চল্যহীনতা ও ধৈর্য্য—হিজ্ হাইনেস্ প্রচুর মাত্রায় তার অধিকারী।

বিদ্যুতালোকে অকস্মাৎ বাঘ দেখা গেল। কিলের কাছে ব'সে মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার তার ইচ্ছা নেই। গরুটা কামড়ে ধ'রে নিয়ে যাবে জঙ্গলে তারই চেষ্টা চলছে পুনঃ পুনঃ। বিদ্যুৎঝলকে মুহূর্ত্তে খানিক দেখা যায়—আবার নিবিড় অন্ধকার। প্রবল বাত্যায় গাছ দুলছে—শাখা-প্রশাখা উড়ছে, মাচাগুলি ভেঙ্গে যায়। বিদ্যুতালোকেই নিশানা নিতে হবে। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল—গুম্—আবার গুম্। বাঘ পড়েছে। এই সেই ম্যান-ইটার।

হঠাৎ আওয়াজ হ'ল গুম্, আবার গুম্! নিহত গরুর পাশে পড়েছে বাঘের নিস্পন্দ দেহ।

বাঘ তার কৃত কর্মের বোঝা নামিয়েছে ডাঃ চৌধুরী ওরফে ডাক্তার ঘোষালের পায়ের নীচে।

—পৃঃ ১৬

শিকারের দুই সঙ্গী

আমার শিকার পর্য্যটনে প্রধানতঃ যে দুই ব্যক্তির সাহচর্য্য বিশেষ ভাবে লাভ করেছিলাম তার একজন পুরুষ, অপর নারী। এই আখ্যায়িকায় দু'জনই আত্মগোপন করেছেন ছদ্মনামের আড়ালে। এই কাহিনীতে তাঁরা ডাঃ চৌধুরী ও সাবিত্রী নামে অভিহিত।

ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় জীবনের মধ্য বয়সে। শিকারের আয়োজনে তিনি এনে দিলেন শৃঙ্খলা, সুর ও ছন্দ। এনে দিলেন স্থির লক্ষ্য ও সংকল্প।

সাবিত্রী আমার জীবনের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী-ঘরণী-গৃহিণী। শিকারে তাঁর উৎসাহ নেই। কিন্তু গহন অরণ্য পর্য্যন্ত তিনি সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিলেন নিজের নিঃসঙ্গ পরিবেশ ও অন্তরের ব্যাকুলতায়। দুটো দিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে স্মরণ হচ্ছে। শৈশবের অবুঝ সংস্কার বশে শিকার জীবনেও যখন বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতাম পথে প্রবাসে আয়োজনহীন অরণ্যে—তিনি আমার অভিপ্রায় লক্ষ্য করে আমার সঙ্গ নিতেন বিনা বাক্যব্যয়ে। মনে পড়ে একবার গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন ঔরঙ্গাবাদের একটা অরণ্য অঞ্চলে আমাদের মোটর রাখা হয়েছে। আপরাহ্নিক চা'র তাগিদ যে ছিল না তা নয়, কিন্তু বাঘের সন্ধান ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাহাড়ী চাষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনে নিলাম এই পাহাড়ে বাঘ ও ভালুকের দৌরাত্ম্য দুইই আছে। আর আমাকে রোখে কে? চা' তৈরীর অর্ডার দিয়ে গোপনে বন্দুকটা হাতে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমেছে জঙ্গলে। জানোয়ার-চলাচলের একটা সরু রাস্তা ধ'রে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছি বাঘের সন্ধানে।

পেছনে হঠাৎ শুষ্ক পাতায় সতর্ক পদক্ষেপের একটুখানি শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি যার পদক্ষেপের ক্ষীণ শব্দ আমাকে সন্ত্রস্ত করেছে—সে বাঘ নয়—সে আমার সঙ্গিনী। আমি বিরক্ত হ'লাম—বাঘ শিকার ছেলেখেলা নয়! অথবা আমার এই প্রচেষ্টা কি তাঁর পরিহাসের সামগ্রী!

ফিস্ ফিস্ ক'রে মুখে বল্‌লাম, তোমার জঙ্গলে আসা অন্যায় হয়েছে।

জবাব হল, তোমারও হ'য়েছে।

আমি বল্‌লাম, আমি শিকারী—আমার হাতে বন্দুক আছে।

গৃহিণী জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে শিকারী আছে।

চ'টে গিয়ে বলি, বিপদে পড়লেই বুঝতে পারবে।

জবাব হয়, সেটা উভয়তঃ।

আর একটা দিন। কালীপাহাড়ীর সান্নিধ্যে এমনি অপরাহ্নের ছায়ায় জঙ্গলে প্রবেশ করেছি। গ্রাম্য শিকারীদের মুখে শুনেছিলাম মহুয়া বনে বিচরণরত হরিণের পিছু নিয়েছিল বাঘ। অপরাহ্নে বাঘ বেরোবার সময় হয়েছে। বাঘ না দেখা গেলে হরিণ ও বন-মুরগী অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমার উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ব'সে জানোয়ারের প্রতীক্ষা করা। আমার পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল গৃহিণী যে তা শুনেছিলেন আমার তা জানা ছিল না। একটা অতি সঙ্কীর্ণ জানোয়ারের যাতায়াতের পথরেখা অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। মাথার উপরেও জঙ্গলের আড়াল সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে। পথ চলার রাস্তা মাত্র খানিকটা। অধিকাংশ স্থলেই উবু হ'য়ে চল্‌তে হচ্ছে। পথরেখা কোথাও দ্বিধা ও ত্রিধা বিভক্ত হ'য়ে গভীর অরণ্যে চলে গেছে। পথ-প্রদর্শক ছাড়া এই পথে চলা বিশেষ বিপজ্জনক। আমরা অনেকটা দূর এগিয়েছি। সেদিনও পেছনে সামান্য একটু শব্দে

চকিত হ'য়ে দেখি সাবিত্রী। তাঁকে নিরস্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই আমি ও আমার বন্ধু অনিবার্য্য বোধেই তাঁকে শিকারের সহগামিনী রূপে গ্রহণ করেছিলাম। এর পরে জঙ্গল পরিক্রমায়, বিটিংএর সময়ে, মাচায় বা মাচাহীন বৃক্ষশাখায় অথবা সন্ধ্যায় ঝোপ-ঝাড়ে জানোয়ারের প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। গুলীর থলে, জলের কেরিয়ার, ফলমূল প্রভৃতি যথাসময়ে পরিবেশন করতেন স্বহস্তে এবং একটুখানি বন্দুক ছোঁড়ার কৌশল শিখেছিলেন অবুঝ-স্বামীর সাহায্যের উদ্দেশ্যেই।

শিকারের প্রথম পাঠ—পালামৌ-রামগড়

সেদিন পরিচিত জুতার শব্দে উল্লসিত হয়ে তাকিয়ে দেখি, চৌধুরী। আসন গ্রহণ ক'রবার আগেই তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—"একটা মাচা কি ছ'টো মাচা ?" চৌধুরী খেয়ালী ভাষায় কথা কইতে অভ্যস্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাচা ? কোথায় ?

চৌধুরী—আগে বলুন মাচা একটা কি ছুটো ?

স্পষ্টই বোঝা গেল কোথাও বাঘ শিকারের আয়োজন হচ্ছে।

আমি বললাম,—মাচা ছ'টোই চাই—এক মাচায় ছুই শিকারী চলবে না। একটা বাঘ এলে শিকার হবে না ঝগড়া হবে।

চৌধুরী—বহুৎ আচ্ছা—মার্চ্চে তৈরী থাকবেন।

চৌধুরী ছ' মাস আগে, এক বছর আগে কাজের এনগেজমেণ্ট করেন এবং কাঁটায়-কাঁটায় তা প্রতিপালন করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—শিকার কোথায় হবে আগে তাই বলুন। তারপর ক্যালেণ্ডারে দাগ দেওয়া যাবে।

চৌধুরী—তা' শোনার দরকার নেই, বাঘ দেখে তাক্ লেগে যাবে।

আমি—তাই হোক। কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন।

কিন্তু চৌধুরীর তখনই যাওয়া হ'ল না। আমার গৃহিণী সেই রাস্তায় চা ও খাবার নিয়ে ঢুকছেন। চৌধুরী জিভে আর তালুতে শব্দ ক'রে খাদ্যদ্রব্যে লোভ জানালেন।

চা হাতে নিয়ে বল্লেন—"বড়গিন্নি আজ বিকেল চারটেয়

এখানে চা-পার্টি। বাইরের লোক মাত্র তু'জন। কাট্‌লেট চাই—আর কিছু মিষ্টি। ডেপুটী সাহেব—হোঁৎকা মোটা। মিষ্টি ছাড়া ওর চ'লবে না।"

নীচে রাস্তায় কর্কশ হর্ণ শোনা গেল। এ সেই পরিচিত শব্দ। চৌধুরীর ড্রাইভাররূপী সেক্রেটারী ওরফে জিবস্‌ ওয়ার্ণিং দিচ্ছে, আর দেরী করা চলবে না। ততক্ষণে চৌধুরীর জুতার ভারী আওয়াজ সিঁড়ি অবতরণ করছে।

* * * *

চা-পার্টিতে মিঃ সেন আর একজন সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ডেপুটী সাহেবের বিরাট ভুঁড়ি, ট্রাউজারের কঠিন শাসন মানছে না। সামনে মিষ্টি আর কাট্‌লেট। শিকারের উত্তেজনাপূর্ণ গল্পে আহার্য্যের পরিমাণ বেড়েই চ'লেছে। প্রধান বক্তা মিঃ সেন। ইনি একটী ওয়ার্ডস্‌ এস্টেটের ম্যানেজার। নাতি শীর্ণ, নাতি দীর্ঘ দেহ। বচনবিন্যাসে বিশেষ কুশলী। বাঘ শিকারে দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতা তুইই আছে বলে মনে হচ্ছে। কমিশনার এমন কি লাট সাহেবের শিকারের ব্যবস্থা মিঃ সেনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মতই অবশ্য পালনীয়।

একটা শিকার-বৃত্তান্তের উপসংহারে বল্‌লেন, "ইংরেজ মহিলার লাল স্কার্ফখানা অনবধানে মাচার নীচে ঝুলে পড়েছিল। বাঘ তাই দেখতে পেয়ে ক্রোধে বারবার চার্জ করছিল সেই স্কার্ফকে। মেম সাহেব ত ভয়ে অজ্ঞান। অন্য শিকারী গুলী ক'রে সেই বাঘ না মার্‌লে মেম সাহেবের অদৃষ্টে কি ছিল বলা যায় না।

আমাদের প্রশ্নাবলীর উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা রুদ্ধশ্বাসে জেলার ডেপুটী কমিশনারের রোমাঞ্চকর বিবরণ শুন্‌ছি। মিষ্টির থালার উপরে আমার কোন লোভ নেই।

জেলার শাসনকর্ত্তা মাচায় বসেছেন শিকারে। যারা জঙ্গল

পিটিয়ে বাঘ তাড়িয়ে নিয়ে আসবে এই নির্দ্দিষ্ট মাচার সামনে তাদের সংখ্যা প্রচুর। তাদের কোলাহলও ততোধিক। সাহেবের ডান ও বাঁ দিকে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার লাইনে কয়েকটী স্টপ্ মাচায় অন্যান্য শিকারীরা বসেছেন। এঁরা বাঘের উপরে গুলী চালাবেন না। এঁদের মাচার কাছে বাঘ দেখা গেলে হাতে তালি দিয়ে কিম্বা গাছ ঠুকে বাঘকে পরিচালিত করবেন সেই মাচার দিকে যেখানে বসেছেন শাসনকর্ত্তা।

ছোট একটা টিলার উপর থেকে বাঘ নেমে আস্ছে নির্দ্দিষ্ট মাচার দিকেই। বাঘ নিকটে এসে পৌঁছুতেই সাহেব ফায়ার করেছেন। বাঘ জখম হয়েছে! আর একবার রাইফেলের আওয়াজ হ'ল। তারপর সব নীরব।

বিট শেষ হয়ে গেলে সাহেব জানালেন বাঘের গায়ে গুলী লেগেছে। এখনও বেঁচে থাকলে তিনি আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারীরা বল্লেন, একপাল মোষ এনে বাঘ সন্ধান করা প্রয়োজন, অন্যথায় সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

সাহেব প্রচুর প্রতিবাদ জানিয়ে অবশেষে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। মোষ সামনে রেখে আহত বাঘের সন্ধান বিশেষ প্রশস্ত। বাঘ দেখতে পেলে মোষের আচরণে তা জানা যায়। পেছনের শিকারী তখন সুযোগ বুঝে নিয়ে গুলী করেন। মোষ খুঁজে আন্তে একদল লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা কুলী চীৎকার করে জানালে বাঘ দেখা যাচ্ছে ঝোপের ভিতরে। মিঃ সেন বাঘ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলেন। জানোয়ারটা পড়ে আছে মৃতবৎ। সাহেবের এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ সত্ত্বেও মিঃ সেন তাঁকে একবার রাইফেলের গুলী চালাতে অনুরোধ জানালেন। অন্য শিকারীরা সব পিছিয়ে গেলেন। শুধু সাহেব খানিকটা এগিয়ে ফায়ার করলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেখানে একটা

বজ্র পতন হ'ল। মিঃ সেন সভয়ে দেখলেন, গুলীর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ লাফিয়ে সাহেবকে আক্রমণ করেছে। বাঘের একখানা পা সাহেবের বুকে আর মুহুর্মুহু চলছে সাহেবের গায়ে বাঘের দংশন! স্টপ্ মাচায় ছিলেন মিঃ সেন। হাতে তাঁর শটগান, পকেটে পাখী-মারা কার্ট্রিজ। বাঘ লক্ষ্য ক'রে ফায়ার করলে সে মরবে না। কিন্তু ছর্‌রার আঘাত লাগবে সাহেবের গায়ে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব অসম্ভব। সেন সাহেব একটা নালার পাশে দাঁড়িয়ে বাঘ মাথা তুলতেই চোখ লক্ষ্য করে ফায়ার করেছেন। আশ্চর্য্য—বাঘ সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে ছেড়ে লাফিয়েছে মিঃ সেনকে লক্ষ্য করে! কিন্তু সেন সাহেবের ভাগ্য ভাল। বাঘ নালার ভিতরে প'ড়েই মারা গেল। সেন সাহেবের জখম যৎসামান্য। নালার ভিতর থেকে রক্তাক্ত-দেহ সাহেবকে তোলা হ'ল। কয়েক মাসের হাঁসপাতালে চিকিৎসায় সাহেবের প্রাণটা বাঁচল, কিন্তু শিকার আর চল্‌ল না।

কাহিনী শেষ ক'রে মিঃ সেন জানালেন, এই জঙ্গলে আমাদের শিকারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও বললেন ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এই রামগড় অরণ্যে নূতন শিকারীর সমস্ত বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। "ওকে"—আমরা যথাসময়ে রওনা হব।,

নির্দ্দিষ্ট তারিখে গোলাগুলী বন্দুক ও খাদ্য দ্রব্যসহ দুখানা মটর পালামৌ অভিমুখে রওনা হল। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন আমার গৃহিণী, মিসেস্ চৌধুরী আর মিস্ ব্যানার্জী। ক্যানাল প্রান্তবর্ত্তী রাস্তা ধ'রে আমাদের গাড়ী ছুটেছে। রাস্তার দু' পাশে শিশুগাছের কচিপাতা বসন্তের হাওয়ায় দুল্‌ছে। নিকটে ও দূরে হাজার হাজার তাল গাছের শ্রেণী পদাতিকের মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বৃত্তাকারে তারা রচনা করেছে ছায়াময় কুঞ্জ। প্রায়

পঁয়ত্রিশ ক্রোশ রাস্তা অবহেলে উত্তীর্ণ হলাম। প্রথমে পাটনা জিলা, পরে গয়া, আওরঙ্গাবাদ পেরিয়ে গাড়ী ছুটেছে দক্ষিণে। একটা বড় খাদ পেরিয়ে গাড়ী যখন ওপরের মেন রোডে উঠেছে তখন চতুর্দ্দিকের দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তাল ও শিশুগাছের মুলুক আর নেই। দু'পাশের গাছগুলি লালে লাল! ক্রোশের পর ক্রোশ চলেছে—পলাশের সমারোহ। পত্রহীন গাছগুলিতে শুধু লাল ফুল—অনন্ত—অসংখ্য! বসন্তে পালামৌ জেলার এই বিশেষত্ব।

শিকার-সন্ধানে

রামগড়ের সে ক্যাম্প-লাইফ আমাদের চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। রামগড় পালামৌ জেলার এক অরণ্যময় অঞ্চল। এখানে রেল লাইন নেই, বাস্‌ নেই, অন্য কোন প্রকার যানবাহনে যাতায়াতের রাস্তাও দুর্গম। এর কারণ শিকার ছাড়া এখানকার স্থানীয় বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। এই অরণ্য-উপকণ্ঠের অধিবাসিগণ যে জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, তা এখন ওয়ার্ডস্‌ এস্টেটের অধীন। কবে এখানে একটি কাছারি-বাড়ী নির্ম্মিত হ'য়েছিল আজ এ কাছারি জীর্ণ, এর কক্ষগুলি অন্ধকার। চারিদিকে প্রাচীরের চূণ-বালিও খ'সে প'ড়েছে। জানোয়ার অধ্যুষিত অরণ্যের প্রান্তভাগে এই জীর্ণ বাড়ী আজ আমাদের চোখে অপরূপ। এর কক্ষগুলি রহস্যের আগার। এই বাড়ীতেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। দশক্রোশ দূর ডালটনগঞ্জ থেকে অসংখ্য কুলীর মাথায় এসেছে আমাদের জন্য খাটিয়া, টেবিল, চেয়ার, আলনা, আরও কত কি! জঙ্গল কেটে পাথর ভেঙ্গে একটি রাস্তাও তৈরী হ'য়েছে। এই রাস্তায় আমাদের মোটর আসবে। দুখানা মোটরে আমরা কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী, আর বাকী দুখানা মোটরে বাক্স, প্যাটরা, বিছানাপত্র, চাকর-বাকর ও খাদ্যদ্রব্য রওনা হ'ল।

এই দুর্গম পাহাড়-পথে অপরিসর রাস্তায় সেবারের মোটরযাত্রা আমরা কখনও ভুল্‌ব না। তখনও শিকারের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু আমাদের আগ্রহ অসাধারণ। গাড়ী চলেছে পাঁচ মাইল স্পীডে। কোথাও শম্বর কোথাও চিত্র-হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখতে পেয়ে আমাদের উত্তেজনার সীমা নেই। বন্ধু ডাক্তার চৌধুরী আদেশ করলেন, ব্যাঘ্র-শিকার

আমাদের লক্ষ্য, রাস্তায় হরিণের উপর গুলী চালিয়ে জানোয়ারদের চকিত করা হবে না। প্রচুর উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা এই সংযত বন্ধুর নির্দ্দেশ মেনে নিলাম।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। অরণ্যে তখনও ঝরাপাতার খেলা চলেছে। কোথাও বা বিচিত্র বর্ণের কচিপাতার সমারোহ। চারিদিকে অজস্র নাম-না-জানা বনফুল আর তার মৃদু গন্ধ। আব-হাওয়া মনোরম। শীতের প্রকোপ নেই। রৌদ্রও প্রখর নয়। অথবা বৃক্ষবহুল এই অরণ্য-প্রদেশে সূর্য্যের তাপ তেমন অনুভূত হয় না।

ক্যাম্পে যখন আমাদের গাড়ী পৌঁছেছে তখন বেলা দশটা। আহার্য্যের প্রচুর আয়োজন দেখে আমাদের শিকারের উৎসাহ বেড়ে গেছে। চাল, ডাল, ঘি, তরকারী, মাংস, দুধ—সব জিনিষই প্রচুর। দক্ষ পাচক ভৃত্যেরও অভাব ছিল না। বান্ধবীদের স্নেহ, যত্ন আরও মধুর।

সদর কাছারির বাহিরের আঙ্গিনায় দুটি হাতী আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। আর জঙ্গল পিটিয়ে জানোয়ার মাচার সম্মুখে এনে দেওয়ার জন্য মজুত হ'য়েছে প্রায় দেড়শতাধিক অর্দ্ধনগ্ন মানুষ। এই মানুষদের অধিকাংশই অনাহারে শীর্ণ। পেট পিলেয় ভরা। রং প্রায় সকলেরই ঘোরতর কালো। মিঃ সেন—যিনি আমাদের জন্য এই শিকার-আয়োজন করেছিলেন তাঁর কাছে এই অপোগণ্ড মানুষগুলির জীবনের যে মূল্য স্থির করা হয়েছে তা শুনে অবাক হলাম। বীট করতে বেরিয়ে যে বাঘের আক্রমণে জখম হবে তাকে দশ টাকা, আর যে প্রাণ হারাবে তার পরিবারকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। বীট করার সমস্ত দিনের মজুরীও যৎসামান্য। কিন্তু বীটারদের উৎসাহের সীমা নেই। শম্বর, শূয়োর বা নীল গাই মারা গেলে এরা একদিন পেট

পুরে খেতে পাবে। জঙ্গলে বাস ক'রেও অন্যথা এদের মাংস ভোজন হয় না।

আমরা নূতন শিকারী। মাচায় শিকারের অভিজ্ঞতা তখনও আমাদের নেই বললেই চলে; বাঘ ছুটে বেরিয়ে এলে আমরা ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারি, সেন সাহেবের এ জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

বাঘ-শিকার সম্বন্ধে আমাদের অনেক উপদেশ দিলেন। দূরে বাঘ দেখতে পেলে হঠাৎ গুলী চালিও না। তাকে কাছে আস্‌তে দিও। দূরের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। অথবা বাঘ জখম হ'লেও মরবে না। আহত বাঘ বীটারদের পক্ষে বিপজ্জনক। মাচার শিকারীরাও নিরাপদ নয়। বাঘ কাছে এলে যদি সে আমাদের দেখতে পায়—নড়াচড়া করব না। পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে থাক্‌ব পলকও না পড়ে। এতটুকু নড়াচড়া বা বন্দুক তুল্‌তে যাওয়ায় সমূহ বিপদ। এমন নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে, যাতে বাঘ মনে করে মাচায় প্রথমে দেখে যা অদ্ভুত মনে হয়েছে ওটা চোখের ভ্রান্তি, আসলে কিছু নয়। বাঘ নাক-বরাবর সোজা চ'লে এলে আমাদের দেখতে না পেলেও গুলী করতে হবে না; গুলী খেয়েই বাঘ সম্মুখের দিকে লাফ দেয়। সেই উল্লম্ফনে আমাদের জীবনান্ত হ'তে পারে।

বাঘ অন্য দিকে মুখ ক'রে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় গুলী চ'ল্‌বে, কিন্তু মনে রাখতে হবে—দু-একটি গুলী বাঘের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাকে আপাতদৃষ্টিতে মৃত ব'লে মনে হয়েছে, এমনি নিশ্চল আহত বাঘ মুহূর্ত্তে লাফিয়ে উঠে কত জঙ্গলে কত লোকের প্রাণহানি করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

মাচায় ব'সে সিগারেট চল্‌বে না; মশার কামড় পোকার উপদ্রব উপেক্ষা করতে হবে। পোষাকে কোন গন্ধদ্রব্য থাক্‌বে

না, মাথায়ও নয়। খাকী ছাড়া সাদা লাল হ'লদে কোন রং চ'লবে না। রুমালও খাকী হওয়া চাই, গুলীর থ'লেটাও; হাঁচি কাশি দমন করতে হবে। এক কথায়, কোন শব্দই চল্‌বে না। আমাদের শিকার শিক্ষার প্রথম পাঠ এই। মনে মনে ভাবলাম—এ ভালই হ'ল। এত সংযম শিখলে সন্ন্যাসের শিক্ষাটাও পোক্ত হবে। 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' যদি করতেই হয়, তার গোড়াপত্তন এইখানেই ক'রে নেওয়া যাবে। সে বয়সে বনে এলে সন্ন্যাসও হবে, শিকারও হবে। শিকারে গেরুয়া চল্‌বে না এই যা তফাৎ। এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় সমস্যার সমাধানও বুঝি পাওয়া গেল। বনে মুনি ঋষিদের বাঘে খেয়েছে এমন কথা ত শুনিনি। মাংসে বাঘের তখন অরুচি ছিল কি? আজ ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে। বাঘ দেখলে মুনিরা ধ্যানস্থ হতেন। ধ্যানস্থ হ'লে বাঘের ভ্রান্তি জন্মে, চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছে সেটা আসলে কিছু নয় ভেবে 'বিষয়ান্তর' সন্ধান করত।

অনেক কিছুই শিখে নিয়ে শিকারীর পোষাক পরা গেল। ব্রিচেস, খাকী মোজা আর মিলিটারী শার্ট। হাতে বন্দুক, গলায় পৈতের আকারে চামড়ার বেল্‌টে টোটা।

মহিলাও সঙ্গে যাবেন। সাবিত্রী সেকালে যমের হাত থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমাদের কলিকালের সতীরা বাঘের কবল থেকে আমাদের ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না! আমার সাবিত্রী আমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। তাঁকে যেতেই হবে। অন্য মহিলারাও প্রস্তুত হ'লেন। হাতীর আড়ম্বরটা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে কম নয়। আমাদের সেন সাহেব মহিলাদের অভিপ্রায় জেনে আতঙ্কিত হ'লেন। শিকারের সম্ভাবিত বিপদ বুঝিয়ে দিতে তাঁর প্রাণান্ত হ'ল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কয়েকটা উপদেশ দিলেন।

পরিশেষে বললেন—তাঁর উপদেশ স্মরণ রাখ্‌লে মহিলারা মাচায় বস্‌তে পারেন, কিন্তু বাঘ জখম হ'লে বিপদ হ'তে পারে। গুলীবিদ্ধ বাঘের লম্ফ ও গর্জ্জন এতই ভয়াবহ যে মহিলারা অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারেন। তখন কে কাকে দেখে! আর একটা কথা বল্‌লেন—ভালুক বেরোলে মাচায় ওঠার মইখানা যেন সরিয়ে নেওয়া হয়। টেনে মাচায় তুলে রেখে দেওয়া যায়, কিম্বা পায়ে ঠেলে মাটীতে গড়িয়ে দিলেও চলে।

আমাদের প্রথম নম্বর মাচা হ'ল হস্তীপৃষ্ঠ। হাতীকে 'বৈঠ্' ব'লে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর হাতীর পাহাড় প্রমাণ পেটের সঙ্গে একটি মই লাগিয়ে দিল। প্রথমে সাবিত্রীরা বহু আয়াসে হাতীর পিঠের গদীতে আসন নিয়ে গদীবাঁধা মোটা দড়ি ধ'রে ন্যুব্জ হ'য়ে বস্‌লেন। তার পরে উঠ্‌লাম আমরা শিকারীত্রয়। হাতীর পিঠে হেলে দুলে জঙ্গলের রাস্তা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছি—আমাদের আনন্দের সীমা নেই। চারিদিকে ঘন অরণ্য। কোন বনে গাছে পাতা নেই। পত্রহীন গাছগুলি পদাতিকের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অরণ্য পত্রশ্যামল। পাখীর কূজনে মুখরিত। কত বিচিত্র তাদের বুলি—বিচিত্র কলরব। কোথাও লতার গায়ে দুল্‌ছে স্তবকে স্তবকে ফুল। কোন ফুল শ্বেত শুভ্র, কোন ফুল বা নীল। কোথাও পলাশ বন। পাতাগুলি ঝ'রে গেছে, কিংশুকের পর্য্যাপ্ত লালফুলে চলছে হোলির উৎসব। সহসা মনে হ'ল—কাল হোলি। পলাশ বনে তারই রং লেগেছে।

হাতী চ'লেছে হেলে দুলে। পথে কাঁটা গাছ দেখ্‌লে মাহুত বল্‌ছে—মাল ঠোক্কর। আর হাতী শুঁড় দিয়ে তাই উপ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে। হাতীর পা সুকোমল গদীর মত। কাঁটা পায়ে ফুট্‌লে তার কষ্টের অবধি থাকে না। তাই কাঁটা দেখলে মাহুত হাতীকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে। গাছের শাখাপ্রশাখা আমাদের চোখে মুখে

আঘাত করবে, মাহুত হাতীকে বলছে—ধর! হাতী শুঁড়ে ক'রে টেনে তাই ভেঙে দিচ্ছে। কখনও আমাদের শিকারের উত্তেজনা বেড়ে উঠছে—অগ্রবর্ত্তী হাতীর উপর থেকে দলপতির হাতের ইসারায়। 'চুপ্, চুপ্, একটা জানোয়ার দেখা যাচ্ছে।' বন্দুকে গুলী পুরে নিতেই শুন্‌তে পাই—'পালিয়ে গেছে!' প্রায়ই হরিণ দেখা যেত। কিন্তু ইসারা পেলেই ভাবতাম বুঝি বাঘ। হয়ত এম্‌নি রাস্তাতেই বাঘ দেখা যাবে। এ জঙ্গলে বাঘ না দেখাই ত আশ্চর্য্য। মহিলারা প্রথমে হাতীর পিঠে চড়তে যতটা অপটু মনে হয়েছিল—এখন আর তা মনে হচ্ছে না। জঙ্গলের শোভা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। জানোয়ার দেখ্‌তে তাঁরা উৎসুক। সমস্ত শিকার-যাত্রাটা তাঁদের কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। তাঁদের সাহচর্য্যে আমরাও সরস। মিসেস চৌধুরী পুত্র সুব্রতকে নিয়ে ব'সে আছেন রাজ্ঞীর মত, মাঝে মাঝে অপাঙ্গে চেয়ে দেখ্‌ছেন ডাক্তার চৌধুরীকে। মিস্ ব্যানার্জীর শিকারে সাধ নেই। ফাগুনের অরণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। হাসিতে ফুটে উঠেছে তাঁর দন্তরুচি।

মাচায় বসেছি। সঙ্গে সাবিত্রী আর একটি গ্রাম্য যুবক। সে জানোয়ার দেখিয়ে দেবে; আবশ্যক হ'লে হুঁসিয়ার ক'রে দেবে। তার হাতে একখানা টাঙ্গী। এই অস্ত্র এ অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো সকলের দিন-রাত্রের সহচর। একটা জানোয়ারের ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। যে জানোয়ার বেরিয়ে এল তার চেহারা অদ্ভুত। না-ঘোড়া না-গাধা, শম্বরও নয়। গুলী করলাম—রক্তের দাগ রেখে সে তীর বেগে পালিয়ে গেল। পরে শুনেছি—এটা একটা নীল গাই। এর পর কয়েকটা বীটে দূরে দূরে হরিণ দেখা গেছে, আর গোটাকয়েক ময়ূর। একটাও মারা পড়েনি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকটা হরিণ চরতে দেখে নীচে ব'সে গেলাম—ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে। এখানে মাচা ছিল না—তার প্রয়োজনও নেই।

এবারে একটা হরিণ মারা পড়্‌ল সেন সাহেবের রাইফেলে। বাকী হরিণগুলো পালিয়ে গেল। তাদের দৌড়ের গতি দেখে বিস্মিত হলাম। বুঝ্‌লাম, নিতান্ত অসতর্ক না হ'লে বাঘের পক্ষে হরিণ শিকার সহজসাধ্য নহে।

আজকের শিকারে মাচা আর বীটের প্রথা বুঝে নিয়েছি। মাচাগুলি পর পর এমন ভাবে তৈরী হয় যে এক প্রান্তের মাচা থেকে অন্য প্রান্তের মাচা একটা অর্দ্ধবৃত্তের দুই প্রান্তবিন্দু। দুই মাচার মধ্যে ব্যবধান অনেক। গাছপালা পাহাড় আড়াল ক'রে আছে বলে এই ব্যবধান আরও বেশী মনে হয়। মাচায় ব'সে সোজা ডাইনে বা বাঁয়ে গুলী করা চল্‌বে না, পরবর্ত্তী মাচার শিকারীদের পক্ষে তা বিপজ্জনক। বীটের সর্দ্দার মাচায় শিকারীকে তুলে দেবে। আবার বীট শেষ হলে বীটাররা এসে নামিয়ে নেবে। বীটার না এলে মাচা থেকে নামা নিষেধ। জানোয়ার আহত হ'লে—বিশেষতঃ বাঘ, ভালুক, শূয়োর প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার—এ সতর্কতা অপরিহার্য্য। মাচায় শিকারীদের তুলে দিয়ে সর্দ্দার-বীটার দূরে জঙ্গলের বীটারদের খবর দিলেই বীট আরম্ভ হবে। মাচা থেকে শুন্‌তে পাই—কত রকম বুলি, চীৎকার, হো, হো, হৈ, হৈ। কখনও বা ঢোলের আওয়াজ। টাঙ্গীর বাঁট দিয়ে গাছ পেটানোর শব্দ। পেছনে এই কোলাহল শুনে জানোয়ার ছুটে আসে কোলাহলহীন মাচার দিকে। তখন শিকারী সুযোগ বুঝে গুলী চালায়।

শিকার শেষে অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যেতেই আহ্বান হয় ফিরে যাওয়ার। আবার হাতী, ধীর মন্থর দোদুল গতি। ঝোপের কাছে কৌতূহলী খরগোস্ দীর্ঘ কাণ খাড়া ক'রে চেয়ে আছে। পলায়মান শেয়াল ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিচ্ছে অনাহূত লোকসমারোহ। চকিত হরিণ দাঁড়িয়ে অরণ্যের প্রান্তে।' শহরের

সে নিত্যকার অভ্যস্ত দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ এক নূতন দেশ, নূতন অভিজ্ঞতা। ক্যাম্পে চা'র টেবিলে শিকার-প্রসঙ্গ, দিনের পর্য্যটনের পুনরাবৃত্তি, কত সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা। আর এ সমস্ত আলোচনা সরস হ'ত ডাক্তার চৌধুরীর হাস্যরসে। ইনি আমাদের বন্ধু মহলের 'উড হাউস'। এঁর এক্সটেম্পোর রসরচনা, চোখা ভাষার নিপুণ পরিহাস উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌ত আমাদের এ সান্ধ্যসভা। তার পর আসে বিবিধ খাদ্য, মিস্ ব্যানার্জীর সাবলীল পরিবেশন, মিসেস চৌধুরীর নিখুঁত যত্ন। ভোজ্যগুলিও কি উপাদেয়! আহার-অন্তে সারি সারি শুভ্র শয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রা।

দ্বিতীয় দিনে ভোরের অন্ধকারে এলেন আর এক শিকারী-বন্ধু। বাংলাদেশের একটি কলেজের অধ্যাপক। শিকারে এঁর অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। দুই-চারিটা হরিণ ইনি ইতিপূর্ব্বে শিকার করেছেন, আমরা তাও করিনি। এই অধ্যাপক-বন্ধুর আগমনে আমাদের শিকারে নূতন প্রেরণা এসেছে। আমার সঙ্গে এঁর আগে পরিচয় ছিল না, কিন্তু সেদিন স্বল্প আলাপেই চিনে নিলাম, ইনি নূতন নন—পুরাতন। এঁর ভিতরে কৃত্রিমতার লেশটুকুও নেই।

আজকের শিকারে দুটো শূয়োর জখম হ'য়েছে। আর মারা পড়েছে একটা হরিণ, একটা কোটরা (barking deer) আর একটা নীল গাই। বাঘের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রাত্রে বহির্ব্বাটীতে কলরব শুনে বেরিয়ে দেখি, অসংখ্য নরনারী জমা হ'য়েছে—নীল গাইয়ের মাংসের আশায়। ভাগ নিয়ে কলহও আরম্ভ হয়েছে। এই দুই টুকরো মাংস তাদের কাছে অমূল্য। আজ তাদের রুটিরও প্রয়োজন নেই।

পরদিন ভোরেই আবার শিকারের তাগিদ এসেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি সদর কাছারীর অঙ্গনে লোকারণ্য। সকলের হাতেই

ছোট-বড় টাঙ্গী। আবার জঙ্গল থেকে ডাক এসেছে, জঙ্গলের এ মানুষগুলো ব'য়ে এনেছে সেই খবর। আর দেরী নয়। যাত্রার আয়োজন হাতী দুটোকেও সাড়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে গর্জ্জন ক'রে তাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে। বাইরের আমন্ত্রণে চা'র টেবিলের গল্পগুজব তুচ্ছ হ'ল। পোষাক প'রে জলের কেরিয়ার, ফলের থ'লে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ সেন সাহেব যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিলেন—আজ সত্যিকার বাঘের জঙ্গলে যেতে হবে।

তাঁর উপদেশের সারাংশ পুনরাবৃত্তি করলেন। একটি মহিলা পরেছিলেন লাল সাড়ী। 'ওটা চল্‌বে না।' তৎক্ষণাৎ তিনি সেটা বদ্‌লে ফেললেন। লাল কাপড় দেখ্‌লে বাঘ ক্ষেপে যায়।

ফাল্গুনের প্রভাত। নবারুণরশ্মি বনের তরুলতাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। নব কিশলয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তারই স্বর্ণরাগ। পাখীর গানে আজ আনন্দের সুর। আজ হোলি। তাই বনলক্ষ্মী আজ উৎসবময়ী। সর্ব্বাভরণভূষিতা, প্রাণহিল্লোলে স্পন্দিতা। বিশ্ব-সৃষ্টির এই মধুর উদ্বোধনক্ষণে আমাদের প্রাণেও পুলকের বাণ ডেকেছে। শিকারের উন্মাদনা ভুলে গিয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি প্রকৃতির এই অপরূপ সাজ—অপূর্ব্ব চেতনা।

কত ক্রোশ পার হয়েছি হিসেব নেই। এক সময় মনে হ'ল হাতী একটা নদীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। নদীর দুই উচ্চ তীরে গহন বন, অদূরে পাহাড়। বর্ষায় এই নদী তরঙ্গাভিঘাতে পাড় ভাঙ্গে, বড় বড় গাছপালা উপড়ে নিয়ে দূরদিগন্তে ছুটে যায়। আজ এ নদীতে শুধুই শুষ্ক বালুকারাশি, জলের রেখাটুকুও নেই।

সেন সাহেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমাদের বাঁয়ের জঙ্গলে। এখানে বাঘের জন্য মোষ বাঁধা হয়েছে। বাঘ মোষ মারলে এখানে মাচা তৈরী ক'রে বাঘের প্রতীক্ষায় বস্‌তে হবে।

একটি লোক লক্ষ্য ক'রে দেখে খবর দিল, মোষ মারেনি কিন্তু বাঘের পায়ের দাগ আশে পাশে দেখা যাচ্ছে। হয়ত কি একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাই বাঘ মহিষকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে গেছে। এইবারে আমরা বাস্তব-জগতে ফিরে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল হাতী দুটো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ভয় পেলে যেমন হয়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত গর্জ্জন করছে। সেন সাহেব হেতু অনুসন্ধান করতে হাতীকে বসিয়ে মইয়ের সাহায্যে নেমে গেলেন। পায়ের নীচে নদীতে শুষ্ক বালুরাশি। বালু পরীক্ষা ক'রে তিনিও একটু চঞ্চল হ'লেন। ইসারায় আমাদের হাতী থেকে নীচে আস্‌তে বল্‌লেন। মুখে কথা নেই—একটা আঙুলে নিজের ঠোঁট স্পর্শ ক'রে আমাদেরও কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে দিলেন। আমরা তাঁর নির্দ্দেশ মত এগিয়ে দেখতে পেলাম সেই বালুতে সদ্য বাঘের পায়ের ছাপ। বালুর নদীতে যে রাস্তা ধ'রে আমরা এসেছি সেই দিক থেকে নদীর নিম্ন দিকে বরাবর ছাপ চ'লে গেছে। সেন সাহেব জানালেন, এই পায়ের দাগ এই ভোরের দিকেই পড়েছে। বনে-চরা গোরু মোষের বা রাখালের পায়ের দাগ একে এখনও মুছে দেয় নি।

দুই হাতীতে প্রায় দশ জন লোক। আজ মহিলা তিন জন; মিসেস চৌধুরী আজ আসেন নি। সেন সাহেব বললেন, বাঘ কাছেই আছে। জলের কাছে কোন জঙ্গলে শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। আজকের প্রথম শিকার এই জঙ্গলে। মুহূর্ত্তে সকলের হাস্য পরিহাস বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। অধ্যাপক-বন্ধু এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'দেখুন, আমি অনেক জঙ্গলে শিকার করেছি, কিন্তু আজকের মত এমন ভয় কখনও হয়নি।' আমিও কোন দিন বাঘের শিকারে

আসিনি। অরণ্য পর্য্যটনের এই সবেমাত্র হাতে খড়ি। আমার ভয় হয়নি একথা হলফ্ ক'রে বল্‌তে পারি নে। মুখে হাসি টেনে এনে শ্রীকান্তের শ্মশানের কথাগুলি অভিনয়ের সুরে বললাম—আর সেদিন যদি আজই এসে থাকে, তবে হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি—

সেন সাহেবের আবির্ভাবে অভিনয়ে যবনিকা পড়ল। শুন্‌লাম তাঁর গৃহিণীকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ছেন, তোমাকে বোঝাবার দরকার আছে কি? শিকার-যাত্রা তোমার ত নূতন নয়। ভয় কর্‌লে চলবে কেন? মাচায় নিঃশব্দে ব'সে থাকবে, না হয় চোখ বন্ধ ক'রে দিও। বেশ বুঝতে পারলাম, সমস্ত আলোচনার ভিতরে একটা বাস্তবতার সুর এসেছে। মাচায় উঠে গেলাম। আমার সঙ্গে গৃহিণী আছেন, তাই একটি মাহুতকে আমার মাচায় দেওয়া হয়েছে। সঙ্কটে তার অভিজ্ঞতা অনেক কাজে আস্‌বে। মইখানাকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল—সতর্কতার কোন ক্রটি না হয়। কল্পনায় বাঘের বিরাট মুণ্ড গ'ড়ে নিয়ে নিজের সাহস পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছি। কোন্ দিক্ দিয়ে এলে কি ভাবে গুলী চালাতে হবে তাও ঠিক ক'রে নিলাম। মাচার সামনে এক হাত পরিমিত উঁচু পাতার ঘেরা থেকে দু-একটা পাতা ছিঁড়ে ফেল্‌লাম। আবার দুই-একটা পাতা নতুন ক'রে গুঁজে দিলাম। সঙ্গিনীকে দুই-একটি উপদেশ দিয়েছি কিন্তু মনে হ'ল, এখানে উপদেশ অনর্থক। তাঁর কর্ত্তব্য বোধ হয় তাঁর কাছে স্পষ্ট।

বীট আরম্ভ হ'ল। ঢোল বাজ্‌ছে। হৈ-চৈর অন্ত নেই। সন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। বারবার চশমার কাঁচ সাফ্ ক'রে নিচ্ছি। মাচায় ব'সে জঙ্গলের প্রত্যেক রন্ধ্র নিরীক্ষণ ক'রে না দেখ্‌লে বাঘের মাথা বেরোলেও তাকে বাঘ ব'লে চেনা যাবে না। এদের গতি এত নিঃশব্দ যে জঙ্গলের ফাঁকে এর মাথাকে পাহাড় ব'লে ভুল করব। হঠাৎ অন্য মাচা থেকে

কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। আমার তখন উত্তেজনার সীমা নেই। এবারে হয় ত বাঘ এদিকে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু ছুটে যেটা এল সে একটা ময়ূর। ময়ূর দেখেও নিরাশ হইনি, কারণ বাঘ আর ময়ূরের সখ্যের কথা অনেক শুনেছি। এই দুই প্রাণীর পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ। ময়ূরের পরেই বেরোয় বাঘ—বীটারকে ঠিক পেছনে রেখে। কিন্তু বাঘ বেরোল না। বীটাররা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। সেন সাহেব ময়ূরের উপরেই রাইফেল চালিয়েছিলেন, আর ডাক্তার চৌধুরী বন্দুকের দুই গুলীতে একটা বিরাট-দেহ শম্বরকে নদীর বালুশয্যায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। এত ফাঁকা জায়গায় শোয়া তার অভ্যাস নেই, তাই উঠে অন্যত্র চ'লে গেছে।

এর পরে আর দুই-একটা বীট খুব কাছাকাছি জঙ্গলেই হ'ল। বাঘ কাছেই আছে সেই আশায়। কোন বড় জানোয়ার দেখা গেল না। একটা বেজে গেছে। আমাদের এবারে যেতে হবে দূরে বস্তীতে। সেখানে আমাদের দ্বিপ্রহরের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যাম্পের তিন ক্রোশ দূর থেকে কুলীর মাথায় আস্‌ছে—লুচি, তরকারী আর হরিণের মাংসের কাটলেট্‌। গাছের ছায়ায় আমাদের গল্পগুজব চল্‌ছে। মেয়েরা বসেছেন একপাশে। সেন সাহেবের রূপসী গৃহিণী, স্মিতনেত্রা মিস্‌ ব্যানার্জ্জী আর আমার ক্ষুদ্রদেহা পত্নী। ডাক্তার চৌধুরী আজ হাস্যরস পরিহার ক'রে রাইফেল নিয়ে পড়েছেন। তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে রাইফেলের সোজা কথাটাকে দিলেন বেঁকিয়ে। আশৈশব যিনি রাইফেল চালিয়েছেন তিনি মিথ্যাটাকেই সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন।

আহার শেষ ক'রে যখন প্রস্তুত হয়েছি তখন তিনটে বেজে গেছে। হাতী এল, এগিয়ে চল্‌লাম। এবারে নিশ্চয় বাঘের জঙ্গল। গত কয়েকবারে ভুল হয়েছে জলের কাছে বীট হয়নি।

বাঘ যে জলের কাছেই আশ্রয় নিয়েছে সেটা আগে খেয়াল হয়নি। খবর এসেছে এক ক্রোশ দূরে জল আছে। আর সে জঙ্গলে গাছের পাতা এখনও ঝরে যায়নি। গাছগুলি ঘনপল্লবিত। বাঘ এই জঙ্গলেই যে আশ্রয় নিয়েছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। 'কোশ ভর' পাহাড়ের বন্ধুর রাস্তা। সেখানে পৌঁছুতে সময় লাগবে অনেক।

জঙ্গলের খুব কাছে এসে যখন পৌঁচেছি, তখন দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। আমাদের দলেও বেশ একটা চাঞ্চল্য লক্ষিত হ'ল। সকলেই চকিত। আমি প্রথমে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু এটা বুঝেছিলাম কিছু একটা অনর্থ ঘটেছে। নাম, নাম, হাতী থেকে নেমে পড়, বীট আরম্ভ হয়েছে। হাতী থেকে নেমে পড়েছি, কিন্তু কোন্ দিকে মাচা কিছুই জানি নে। জঙ্গলের রাস্তা ধ'রে ছুট্‌ব, ডাইনে না বাঁয়ে, পূর্ব্বে না পশ্চিমে, কোন্ দিকে! হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। শিকারীরা কে কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে জানি নে, সকলেই ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছুটেছে। দূরে বীটারদের গাছ-পেটার শব্দ। সম্মুখে আশেপাশে ধাবমান শিকারীদের ছুটে যাওয়ার ব্যস্ততা, কিন্তু রাস্তানির্ণয়ের কোন উপায় নেই। আমার আগে অন্য হাতীতে গৃহিণী ছিলেন, তাঁকেও দেখা গেল না। যেদিকে চোখ যায়, মরিয়া হ'য়ে ছুটেছি! অবিলম্বে মাচায় উঠ্‌তে হবে। এতক্ষণ জানোয়ার ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছে তাতে সন্দেহ নেই। এই জঙ্গলেই বাঘ আশ্রয় নিয়েছে, সে কথা পূর্ব্বেই শুনেছি। সেই সত্য আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে ক্ষিপ্তের মত। জঙ্গলের ভিতরে টিলার মত ছোট ছোট পাহাড়। আরোহণ কষ্টসাধ্য। পা পিছলে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আগে মাচায় উঠ্‌তে হবে। ছুটে যেতে একটা মাচা চোখে পড়ল। সেটায় অধ্যাপক বন্ধু বসেছেন, সঙ্গে মিস্ ব্যানার্জী। নীচে স্খলিত অঞ্চলে আমার গৃহিণী। মাচার উপর থেকে বন্ধু ডাক্‌ছেন চেঁচিয়ে সেই মাচায় উঠে যেতে—কিন্তু

গৃহিণীর সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি দিশেহারা হ'য়ে খুঁজ্ছেন আমাকে। আমাকে দেখ্তে পেয়ে দৌড়ে এলেন। তাঁকে পিছনে রেখে আমি ছুট্ছি মাচার উদ্দেশে। এক সময়ে পিছনে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গিনী অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের নীচে, আমি ওপরে। তিনি ওঠবার চেষ্টা করছেন। সহসা পেরে উঠছেন না। হঠাৎ শোনা গেল, রাইফেলের নির্ঘোষ! ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। জানোয়ার বেরিয়ে আস্ছে।

রাইফেলের ব্যারেল কোন্ দিকে, জানোয়ারের গতি কোন্ মুখে তাও জানিনে। জঙ্গলের আড়ালে কোন মাচাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নীচে নেমে যাচ্ছি সঙ্গিনীর সাহায্যে, তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার বন্দুক কোথায় ?' তাই ত, বন্দুক সঙ্গে নেই ত! এতক্ষণ সেটা খেয়ালই হয়নি। অদূরে দেখ্তে পেলাম পূর্ব্বাহ্ণের দু-তিনটা বীটের সঙ্গী ও সেই মাহুতটা ছুটে আস্ছে, আর দূরে পালিয়ে যাচ্ছে একটা বীটার। এ লোকটা স্টপের কাজ করে। শেষ প্রান্তের মাচার পাশ কাটিয়ে জানোয়ার বীটের বাইরে চ'লে না যায়, এরা চীৎকার ক'রে তাই জানোয়ারদের গতিরোধ করে। তার হাতে দেখা যাচ্ছে আমার বন্দুক আর গুলীর থ'লে। বন্দুক নেওয়া হ'ল, কিন্তু মাচা কই! মাহুত চতুর্দ্দিকে দৌড়ে বিশেষ নিরীক্ষণ ক'রেও মাচা বা একটুখানি আড়ালও আবিষ্কার করতে পারলে না। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে মনে হচ্ছে, একটা ছোট-খাট যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে জানোয়ারের পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

দূর থেকে একটা গভীর খাদ উপর থেকে নীচে এসে আমাদের পায়ের কাছ থেকে বেঁকিয়ে দূরান্তরে চ'লে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে এইখানেই ব'সে পড়লাম। এই খাদই সচরাচর বাঘের

চলাচলের রাস্তা। আমার সঙ্গিনী এক খণ্ড পাথরের উপরে বসেছেন, হাতে গুলীর থ'লে। আমি আছি দাঁড়িয়ে, হাতে বন্দুক। দারুণ উত্তেজনায় চঞ্চল। মাহুত আমার পেছনে। বৃক্ষ অসংখ্য, কিন্তু আরোহণ করার মত একটা গাছও নাই। নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝে নিয়ে আমি প্রস্তুত হ'চ্ছি একটা লড়াইয়ের জন্য। হাতে পায়ে লড়াই! জানোয়ার কাছে এলে হয় ত বন্দুক কোন কাজেই আস্‌বে না। হয় ত বাঘ উপস্থিত হওয়ার আগে গাছের আড়ালের জন্য তাকে দেখ্‌তেই পাব না, আর দুই-একটা গুলীতে তাকে নিঃশেষে মারাও অসম্ভব। তার পরের অবস্থাটা কল্পনার অগোচর। তবু আমি ভাব্‌ছি—যদি তাই হয়, বাঘের টুঁটি চেপে ধ'রে প্রাণপণে টিপে দিলে তাকে কাবু করা যাবে কি? চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলে কি হয়? বন্দুক দিয়ে জোরে বাঘের মাথায় আঘাত করলে? হয় ত কিছু হ'তেও বা পারে, কিন্তু তার ফুরসুৎ পাব? সাহসে কুলোবে কি?

মাহুত বললে, 'বড় জানোয়ার বেরোলে গুলী ক'রবেন না।'

'বড় জানোয়ার কি বলছ?'

'এই বাঘ, ভালুক, শূকর। গুলী করলে বিপদ হবে।'

মাহুতটা বলে কি! গুলী না করলেই তারা আমায় ছেড়ে দেবে নাকি? কোন মাচার শিকারীর গুলী খাওয়া বাঘ যদি এদিকে আসে? আমি মাহুতের আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত নই। শিকারে এসে বড় জানোয়ার দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব! সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম সে নির্ব্বিকার। আমার জন্য বিভিন্ন রকমের বুলেট সাজিয়ে একটা পাথরের উপরে রেখে দিচ্ছেন। ব্যস্ততায় গুলী বেছে নিতে ভুল না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভয় হচ্ছে না ত? আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না।

অনাবশ্যক টোটাগুলো থ'লের ভিতর রেখে দিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার কখনও ভয় হয় নাকি?'

আমি এর প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, শিকারে ব'সে মশার কামড় আর পোকার উপদ্রব স'য়ে যেতে হয়; শব্দ করে তাড়ালে উৎকর্ণ জানোয়ার পালিয়ে যাবে। কিম্বা হঠাৎ চকিত হ'লে আক্রমণও করতে পারে।

কয়েকটা গুলী বেছে আমার পকেটে রেখে দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে একবার বললেন, 'বড্ড পোকায় বিরক্ত করছে।'

আমি হাসব কি কাঁদব জানি নে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যে বাঘের আক্রমণ আশঙ্কা করছে, পোকার উপদ্রব গ্রাহ্য করার তার অবকাশ কোথায়! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—সে মুখে ভয়ের লেশমাত্রও নাই।

আমাদের অবস্থা কল্পনা করুন। আমি নূতন শিকারী। নদীতে হাঁস আর বনের পাখী, শিকারের অভিজ্ঞতা তখনও আমার এতটুকু। সেন সাহেব বাঘের বিভীষিকা যা বর্ণনা করেছেন, এই পালামৌর জঙ্গলে কিছুদিন পূর্ব্বে যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে। তাই আজ বাঘের আসন্ন সম্ভাবনায় আমি মরিয়া হ'য়ে উঠেছি। অন্তরের নিভৃত কোণে এসেছে একটা উদাস আত্মসমর্পণ! জীবন-মৃত্যু দুইই এক হয়ে গেছে। সম্মুখে দেখ্‌ছি—একটা বিরাট ভয়াল দেহ, সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত। বদন ব্যাদান ক'রে ছুটে আস্‌ছে দুর্জ্জয় রোষে—চোখ দুটো জ্বল্‌ছে হিংসার আগুনে। আমার ঘাড়ে তার বিশাল দংষ্ট্রার স্পর্শেরও প্রয়োজন নেই। তার বিরাট থাবার একটি আঘাতে পলকে জীবন-মরণের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারে। কত দক্ষ শিকারী এমনি ভাবেই ত প্রাণ হারিয়েছে। আমার যদি আজ সত্যিই সেদিন এসে থাকে তবে আবার বল্‌ছি, 'হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি, হে আমার সর্ব্বদুঃখভয়ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর, তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও। আমি তোমার

এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি।'

যখন হুঁস হ'ল, তখন বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেছে। সায়াহ্নের ছায়া নেমে এসেছে অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে। সম্মুখের খাদে সে ছায়া আরও গভীর। অদূরের বীটারদের দেখা গেল "হাকোয়া" শেষ হ'য়ে গেছে। কোথায় বাঘ, কোথায় ভালুক। বাঘের আবির্ভাব, আক্রমণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ—সব মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেছে। যবনিকা উত্তোলিত—দেখা যাচ্ছে, আশার আলো, জীবনের অমৃত।

অনেকটা পথ চ'লে যখন একটা মাচার কাছে উপস্থিত হয়েছি, দেখ্‌লাম সে মাচা থেকে সেন সাহেব আর তাঁর স্ত্রী তখনও অবতরণ করেন নি। আমাদের নীচে দেখে বিস্মিত হ'লেন। শিকারের এ নিয়ম নয়। বীটার এসে নামিয়ে না নিলে মাচা থেকে নামা উচিত হয় নি। সেন সাহেব ভৎসনার সুরে আমাদের প্রশ্ন করতেই জবাব দিলাম, 'মাচা আমাদের ছিল না, নীচেই ছিলাম।' কণ্ঠে ছিল বোধ হয় একটু অভিমানের সুর। তিনি আমার জবাবে ভীত হ'য়ে দাবী করলেন, 'মাচা পাননি, সে কি, তবে আমাদের মাচায় ছুটে আসেন নি কেন?

আমি উত্তর দিলাম, 'এমন ক'রে অপরের শিকার নষ্ট করা শিকারীর পক্ষে গর্হিত। তা হ'লে এই গোটা আয়োজনটা পণ্ড

এমন সময়ে শিকারীর দল এসে জুটেছে। চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। মনে হ'ল, একটা বিষম কিছু ঘটেছে। একবার ভাবছিলাম, হয় ত আমাদের দুঃস্থ অবস্থা কল্পনা ক'রে তিনি গম্ভীর হয়েছেন। আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি শিকারীর উপযুক্ত কাজই করেছেন, তর্কের আবশ্যক নেই।' একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আম যা

বলছি, তার তুলনায় আপনাদের কাহিনী তুচ্ছ।' সমস্ত ঘটনা শুনে শিউরে উঠ্‌লাম। চৌধুরী সাহেবের মাচায় ছিল তাঁর কিশোর বয়স্ক পুত্র, জনক জননীর একমাত্র সন্তান। আর সেন সাহেবের এক নিকট আত্মীয়। বয়সে তিনিও তরুণ। যখন জানোয়ার ছুটে বেরোচ্ছে—শম্বর, শূকর, হরিণ—তখন এই দুইটি তরুণ তাই লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছিল। হঠাৎ তাঁর পুত্র 'বাপরে' ব'লে মাথা সরিয়ে নিলে। অন্য ছেলেটি 'উঃ' ব'লে চেঁচিয়ে বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল···দারুণ আতঙ্কে সাহেব দেখ্‌লেন, রাইফেলের গুলী বৃষ্টি হ'চ্ছে তাদের মাচারই আশে পাশে! মুহূর্ত্তে তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে ছেলেদের শুইয়ে দিয়ে নিজে শুলেন তাদের উপরে। নিজের দেহের আড়াল ক'রে গুলীবৃষ্টি থেকে তাদের বাঁচাতে। এই ভয়াবহ ব্যাপারের দীর্ঘ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করলাম, 'বুকে হাত দিয়ে যে ব'সে পড়ল তার কি হ'ল?' চৌধুরী সাহেব বললেন, ভাগ্যিস তার জখম যৎসামান্য। ছেলেটিকে আহ্বান ক'রে দেখিয়ে দিলেন, গায়ের কোট, কামিজ এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে। বুকের চামড়া খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমার রুদ্ধ শ্বাস এবারে মুক্তি পেল, কিন্তু তখনও বাক্‌শক্তি ছিল না। আজকের য়্যাডভেন্‌চার আর থ্রিল্‌ একটু রসাল ক'রে বর্ণনার ইচ্ছা ছিল—সে ইচ্ছা লোপ পেয়েছে। নিমেষে আমাদের সমস্ত আয়োজন কি ট্রাজেডীতে সমাপ্ত হ'ত ভেবে আমি স্তম্ভিত।

প্রশ্ন ক'রে সব ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

প্রথম নম্বর: এই জঙ্গলের বীটারদের সর্দ্দার নূতন। ভুলে একটা মাচা কম তৈরী হয়েছিল, সে খবর আমাদের দেয় নি। দ্বিতীয় নম্বরঃ আমাদের মাচায় বসিয়ে দেওয়া দূরের কথা, আমাদের জঙ্গলে আসার আগেই বীট আরম্ভ হয়েছিল। তৃতীয়

নম্বর ঃ যে দিক থেকে বীট করা উচিত ছিল, সে দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের সম্মুখ দিক থেকে বীট না ক'রে ডান দিকের এক প্রান্ত থেকে বীট করা হয়েছে। এ ভাবে বীট হ'লে এক মাচার গুলী অন্য মাচার শিকারীকে বিদ্ধ করবে। এই ভুলের পরিণাম শোচনীয় হ'তে পারত ; কিন্তু বাঘের আবাসস্থান ঘিরে বীট হয়নি ব'লে বাঘের অন্য দিকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। হয় ত এই ভুলের জন্যই বাঘের সাক্ষাৎ হয় নি ; কিন্তু বাঘ বেরোলে যাঁরা মাচার অভাবে নীচে স্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

আজকের এই দারুণ ঘটনা আমাদের সকল আলোচনার সুর বদলে দিয়েছে। হাতীতে আর চড়া হ'ল না, অন্ধকার অরণ্য পথে নিঃশব্দে কয়েকটি প্রাণী ক্যাম্পের উদ্দেশে এগিয়ে চললাম। মনে মনে সংকল্প করলাম, এমন ঘটনা মিসেস চৌধুরীকে বলা হবে না।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। সেদিনকার বীট নিয়ে অনেক বিতর্কও শুনেছি। সকলেই একবাক্যে বলেছে— এমন কাণ্ডও ঘটে ! এই বীটের ভুলে কি-ই না হ'তে পারত। কেউ বলেনি—ভাগ্যিস্ বীটে ভুল হয়েছিল ! যদি কেউ এমন কথা বলত আমি হয় ত জবাব দিতাম—বীটে ভুল না হলে শিকারীর তালিকায় আমার নামটা উঁচুতে লেখা হ'ত।

শিকার প্রয়াসে ধানগাঁই

রামগড়ে অরণ্য জীবনের আস্বাদ লাভ করেছি। শিকারের প্রথম পর্ব্বেই থ্রিল কাকে বলে তা উপলব্ধি করেছি। মনটা অনুক্ষণ আঁকু পাঁকু কচ্ছে আবার কবে বাঘের জঙ্গলে আমাদের ছাউনী প'ড়বে। সেখানে আফিস নেই, সামাজিক কর্ত্তব্যের তাগিদ নেই —আছে শুধু জানোয়ারের খবর; বাতাসে শুধু অরণ্যের গন্ধ। তাই শিকারের যৎসামান্য প্রসঙ্গ পেলেই দলে ভিড়ে যাই।

শিকারের গল্প এই সময়ে জমে উঠত বন্ধুবর সরকারের গৃহে। সরকারের হাস্য সুন্দর, বাক্য সুন্দর, গল্প বলার ভঙ্গীও সরস। এই জিলার ধানগাঁই অঞ্চলে বাঘের প্রাদুর্ভাবের কথা তাঁর মুখে শুনেছি অনেকবার। আরও শুনতাম ম্যানইটার বাঘের সর্ব্বনাশা অত্যাচার কাহিনী। এই শ্রীযুত নগেন সরকার মহাশয় বিশেষ সাধুর শিষ্য। মৎস্য মাংস খান না, কিন্তু বিগ গেম শিকারে গুরুর সম্মতি নেওয়া হ'য়েছে। ডাঃ হেমেন্দ্র খাঁও নগেন বাবুর পরমাত্মীয় শৈলেশ বাবুর সঙ্গে নগেন বাবু বাঘ শিকারে অনেক পর্য্যটন করেছেন। তাঁর শিকারের সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ অবগত নই, কিন্তু তাঁর শিকারী জনোচিত সৌজন্য ও উদারতা আমাকে মুগ্ধ করত।

ধানগাঁইতে আমার ভ্রমণ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার। মনে আছে দ্বিপ্রহরের শেষভাগে ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মল ও পরিমল এবং সাবিত্রীসহ একদিন ধানগাঁই অভিমুখে আমার মটর রওয়ানা হ'ল। শিকার যাত্রার একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। এই আনন্দের সঙ্গে শিকারের সাফল্যের কোন সম্পর্ক নেই। ছোটখাট আবশ্যকীয় জিনিষগুলো গুছিয়ে নিতে ও পথচলার আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে যাই। রাস্তায় অতি সাধারণ দৃশ্যগুলিও চিত্তপটে আঁকা থাকে। ধানগাঁইর ধূলায়

ধূসর কাঁচা রাস্তায় গাড়ী ছুটেছে। পল্লীপ্রান্তে ছেলের দল কোলাহল তুলেছে। কাঁচা ঘরের পীতরঙের খড়ের চালের উপরে ঝুলে আছে গাঢ় সবুজ লতায় লাউ কুমড়ো। এই লতাপাতা এবং সমস্ত পল্লী প্রকৃতির দেহে সজীবতা দান করেছে অস্তরবির রাঙা রশ্মি। এই সকল দৃশ্য নিতান্তই বিশেষত্বহীন এবং সাধারণ হলেও এর পশ্চাতের আর একটা রূপ একে রহস্য দান ক'রেছিল। সেরূপ এর রাত্রের রূপ। এখানে পাহাড় অরণ্য আর পল্লী পরস্পরে গলাগলি ক'রে বাস করে। রাত্রে এই বস্তীর গলিপথে ঘুরে বেড়ায় লেপার্ড ও টাইগার। ধানগাঁইতে আমার বাঘ শিকার হয়নি। এই অঞ্চলের কয়েক ক্রোশ পূর্ব্বে শিকার করেছিলাম শুধু একটা হরিণ, কিন্তু আমার আয়োজন যতই অকিঞ্চিৎকর হোক আকাঙ্ক্ষার কোন অসদ্ভাব ছিল না। স্থানীয় শিকারীর সন্ধান হ'ল না। শিকারের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান অথবা পথ প্রদর্শক ছিল না। ধানগাঁইর আঁচল ঘেঁষে যে বালুময় নদী সঙ্কীর্ণ জলধারা বুকে নিয়ে ছুটে চ'লেছে— সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারই প্রান্তে একটা অশীতিপর বৃদ্ধ গাছের ডালে বসে গেলাম। নীচে বাঁধা ছিল একটা ছাগল ছানা। যদি দৈবাৎ কোন বুভুক্ষু লেপার্ড ছাগলের লোভে বেরিয়ে আসে। আশা ছিল ছাগল মুখে করার আগেই আমি গুলী চালিয়ে তাকে শুইয়ে দেব। কিন্তু লেপার্ডের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তুটো শেয়াল পরামর্শ করে পিছু নিলে ছাগল ছানাটার। ওদের হাত থেকে ছানাটাকে বাঁচাতে আমি বিব্রত হ'লাম। হয়ত অদৃষ্টপূর্ব্ব এই বিভ্রাট এবং আমার নড়াচড়ার ফলে যে নীরবতা ভঙ্গ হ'য়েছিল লেপার্ডের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট এলার্ম।

মাচা থেকে নেমে এলাম খানিকটা রাতে। বাঘের সন্ধানে মটরে জঙ্গলে ঘুরব এই সংকল্প নিয়ে আমার অনেক স্মৃতিবিজড়িত 'কাহুডাক' অরণ্যের দিকে মটর চালিয়ে দিলাম। সঙ্গে স্পটার ছিল

ইমাম আলী। বাঘ শিকারী ইমাম আলীর দক্ষতা আমার জানা নেই কিন্তু হরিণের গতায়াতের রাস্তা তার সুপরিচিত। মটর নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনেই অল্প জঙ্গল ও অড়হরের ক্ষেত। ইমাম আলীর নির্দ্দেশে আমি জঙ্গলের দিকে তাকাতেই একটা আলো ঝলসানো জানোয়ারের চোখ—নজরে এল। ইমাম আলীর ইচ্ছানুযায়ী ফায়ার করেছি, জানোয়ারটা প'ড়ে গেল। সঙ্গীরা যখন জানোয়ারটাকে টেনে বার করল, দেখলাম সেটা একটা প্রকাণ্ড চিতল হরিণ।

জঙ্গল থেকে যখন ফিরে এসেছি তখন প্রায় ভোর হ'য়েছে। চোখে শ্রান্তির অবধি ছিল না। কিন্তু আবার শিকার যাত্রার আয়োজনে বেরিয়েছি—বন্ধু সরকার আমার সাথী ও সাহায্যকারী। রাস্তায় যে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাত হ'ল আমার পরবর্ত্তী বহু শিকারস্মৃতি তাঁর সঙ্গে জড়িত। শিকারে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা আমাদের আকৃষ্ট ক'রত। সে কমল পুরের নবী আক্তার।

আক্তারের হ্রস্বদেহ, বলিষ্ঠ গঠন, প্রশস্ত ও উজ্জ্বল ললাট। দেহের বর্ণ খানিকটা তামাটে। পরিধানে শেরোয়ানী—তাঁর পকেটে ষ্টেথস্‌কোপের মত কি একটা ঝুলছে দেখতে পেলাম। আমার বন্ধু সরকার সেদিকে এগিয়ে যেতেই সে এই যন্ত্রটা পকেট থেকে তুলে তাঁর হাতে দিল। আমি দেখলাম একটা রবারের পাইপের একদিকে একটা হর্ণের মত নিকেলের চোঙ্। সরকার সেই চোঙ্‌টা মুখের কাছে ধ'রে চেঁচিয়ে কথা বল্‌ছে, আর নবী আক্তার পাইপের অপর দিকটা কাণে গুঁজে দিয়েছে। সরকার বললেন—"ইনি আমার বন্ধু বড় শিকারী"।

নবী আক্তার—আ-আচ্ছা-শিকারে এসেছেন ?

সরকার—তা বইকি ? কালরাত ত' জঙ্গলে কাটিয়েছেন।

নবী আক্তার—কিছু পেলেন ?

সরকার—একটা হরিণ।

নবী আক্তার—আবার কি ? বাঘ কি সহজে জোটে—সেত একদিনের কাজ নয়—সাহেবের তারিফ্ ?

সরকার—ভারী অফিসার—

নবী আক্তার—বটে—একতারায় নিয়ে চলুন।

আমার দিকে তাকিয়ে আদাব সহ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—একতারায় একবার যেতেই হবে—তিনি বাঘ বের করে দেবেন। ভালুক শূয়োর সম্বরের ত কথাই নেই। আমি খুসী হ'য়ে আদাব জানালাম। আক্তার সাহেব পকেট থেকে একটা পেন্‌সিল বার ক'রে দিয়ে বললেন "নিন—আমার ঠিকানাটা লিখে রাখুন—হারাবেন না যেন।"

"কাহুডাকের" জঙ্গল থেকে ফিরে এসে অনেকদিন শিকারের কোন সুযোগ ঘ'টে ওঠেনি কিন্তু মনের ভিতরে তাগিদের অন্ত ছিল না। ডাক্তার চৌধুরীর ফুরসুৎ নেই—আর নিখুঁত আয়োজন না হ'লে তিনি কোন কাজেই ব্রতী হন না এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক শিকার যাত্রার পূর্ব্বে তাঁর টার্গেট প্রাকটিস্ হওয়া চাই—কোন প্রয়োজনেই আমারও এই অবশ্য কর্ত্তব্য উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তাঁর নিখুঁত আয়োজনের চেষ্টায় আমি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌লেও মনে মনে আমি তাঁর প্রশংসা করতাম। চৌধুরীর আলাপ আলোচনা, উত্তর প্রত্যুত্তর সহজবোধ্য নয়। তাঁর পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তির কে যে লক্ষ্য বুঝ্‌তে না পেরে অনেকেই অপ্রতিভ হয়ে যান। তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ যুক্তি তর্ক ও আলোচনা তাঁর উদ্দেশ্যকে এমনি আড়াল ক'রে দেয় যে অসতর্ক শ্রোতা বিপথে চালিত হ'য়ে বিপন্ন হ'য়ে ওঠেন। আমার প্রতি বোধ হয় তাঁর একটা অহেতুক অনুরাগ ছিল তাই নেহাৎ বুদ্ধির কণ্ডূয়ন

নিবৃত্তির তাগিদ না থাকলে আমাদের হৃদ্যতাকে তিনি বাঁচিয়ে চলতেন।

সকালের দিকটায় চৌধুরীর চা'র টেবিলে শিকার আলোচনা শেষ ক'রে—বন্দুকের দোকানে ঢুকেছি। সেখানে একটা লোককে ঘিরে দু' তিনজন লোক শিকার সম্পর্কে কি প্রশ্ন করছেন। লোকটাকে দেখেই আমার মনে হ'ল তিনি আমার অপরিচিত নন। সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনিও আমাকে সম্ভাষণ জানালেন—সঙ্গেই বাঁহাত পকেটে পূরে বার করলেন চোঙ লাগানো একটা রবারের পাইপ। তখন আর কোন সংশয় ছিলনা—এ সেই বহেরা শিকারী!

"—আমাকে চিনতে পাচ্ছেন?—কমলপুরের নবী আক্তার? শিকারে এলেন না ত?"

"আরে আক্তার সাহেব যে, আদাব! শিকারের খবর কি?"

"শিকার খুব হবে চলুন না—কালী পাহাড়ীতে এবার খুব বাঘের আমদানী—"

"বটে—কবে যাব বলুন—আমরা প্রস্তুত।"

"আমরা—আপনার—সঙ্গী কে—?"

"চৌধুরী—ডাক্তার চৌধুরীকে জানেন না? নাম শুনিছি এইকি, চাঁদনী রাতগুলো কেটে গেলেই দু'জনে চ'লে আসবেন—আগে একটা তার দেবেন।"

"চাঁদনীতে শিকার হয় না?"

"হবেনা কেন—হয়, কিন্তু সে আপনাদের পোষাবে না—দূর থেকেই বাঘ আপনাদের দেখে ফেলবে যে! পারবেন—কালী-পাহাড়ীর ঝরণার কাছে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতে? অন্ধকার পক্ষেই আসবেন।"

"তাই হবে।"

"নিন্ ঠিকানাটা লিখে রাখুন—হারাবেন না যেন। টেলিগ্রাফ অফিসটাও নোট করুন!"

আক্তার সাহেবের কাছে বিদায় নিলাম কিন্তু "কালীপাহাড়ী" নামটা আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল। নামটার ভিতরেই কেমন একটা রহস্য আছে! ওটা কি বাঘের কেল্লা! এই কালীপাহাড়ী আমার পরবর্ত্তী জীবনে দেখার সুযোগ হ'য়েছে। চোখে দেখে এর রহস্য আরও নিবিড়তর মনে হ'য়েছে আর একে আশ্রয় করে গ'ড়ে উঠেছে কত সম্ভব এবং অসম্ভব কল্পনা!

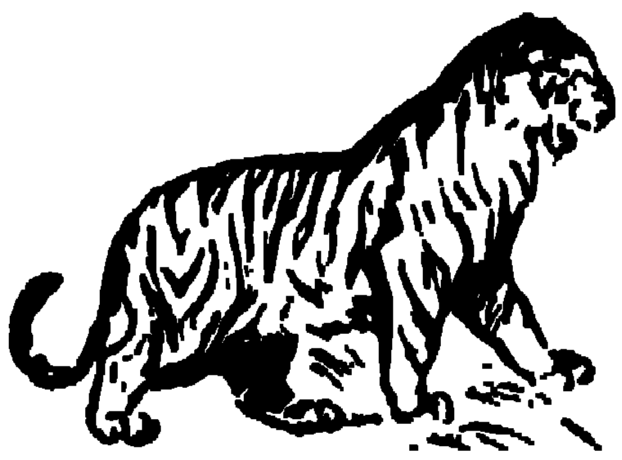

কালীপাহাড়ী

কালীপাহাড়ীর কোন ভৌগোলিক প্রসিদ্ধি নেই। মানচিত্রে কালীপাহাড়ী উপেক্ষিত। কিন্তু ঐ পাহাড় আমার চোখে অপূর্ব্ব। মনে হয় অরণ্যের সমস্ত রহস্য পুঞ্জীভূত হ'য়ে আশ্রয় নিয়েছে ঐ কালীপাহাড়ীর গুহায়।

গয়া জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে যে পাহাড়শ্রেণী গিরিধির শৈলমালায় মিশেছে তারই এক নিভৃত কন্দরে কালীপাহাড়ী আত্ম-গোপন ক'রে রয়েছে। ধূসর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে কালো রংএর বিভীষিকা প'ড়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রস্তরায়িত রহস্য। এর চেহারাও অনন্যসাধারণ, যতটুকু চোখে পড়ে সে নিকষ কালো পাথরের অসংখ্য গম্বুজ, তার নীচের দিকটা দুর্ভেদ্য অরণ্যে সমাচ্ছন্ন —এই পাহাড়ের অবস্থান—এর সর্ব্বাঙ্গে অরণ্যের সমারোহ দেখে মনে হয় লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপন করার ভিতরে এর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। চাষী ও শিকারীরা বলে এর ভিতরে অসংখ্য গুহা, গভীর রজনীতে এই পাহাড়ের দু'তিন ক্রোশ দূরে কুটীরে উপবিষ্ট কৃষক শার্দ্দূল-গর্জ্জনে রোমাঞ্চিত হ'য়ে সভয়ে তাকায় ঐ কালীপাহাড়ীর দিকটায়। বনের কাঠুরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ঐ পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে, দুর্গম পাহাড়ে পথ হারিয়ে রাত হয়েছে—তার চরণ ত্রস্ত—নেত্র চকিত—আতঙ্কে সে কালীপাহাড়ীর সান্নিধ্য এড়িয়ে যাচ্ছে। কিসের গম্ভীর আওয়াজ কানে এসেছে —ক্ষণিক থম্‌কে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ সুরু হ'ল অরণ্য দেবতার। এই কালীপাহাড়ী অহরহঃ আমায় আকর্ষণ করছে—অদৃশ্য অঙ্গুলী তুলে ইসারায় ডাকছে তার নিভৃত গুহার পানে।

যেখানে ব্যাঘ্রী পাহারা দিচ্ছে রক্তচোখে—ব্যাঘ্রের হিংসা থেকে তার শাবককে বাঁচাতে। গুহার বাইরে শার্দ্দূল বিচরণ করছে তার শব্দলেশহীন চরণক্ষেপে—পথভ্রান্ত শম্বরের সন্ধানে।

বৈশাখের মধ্যাহ্নে—ম্লান শীতের অপরাহ্নে—দূর থেকে কালী-পাহাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে এর অপূর্ব্ব মায়ায় অভিভূত হ'য়েছি—আর এর আতঙ্কভরা বিভীষিকায়। তাই ছুটে আসি বারবার এরই আশে পাশে।

লতাপাতায় ঘেরা তৈরী ক'রে সায়াহ্নের স্বল্প আলোকে স্থিরলক্ষ্য হ'য়ে কালীপাহাড়ীর হিংস্র অধিবাসীর সন্ধানে দৃষ্টি শ্রান্ত ক'রেছি। শম্বরের আর্ত্ত আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হ'য়ে বুঝেছি অরণ্যরাজ তার দৈনিক শিকারের অভিযানে বেরিয়েছে—আর্ত্ত শম্বর চীৎকার ক'রে অসতর্ক শম্বরযূথকে সেই বিপদের জন্য সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। ক্বচিৎ কুতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নিঃশব্দ চরণে জলের সন্ধানে উপস্থিত হয়েছে—কোট্‌রা হরিণ, বন্য কুক্কুট ও ময়ূর। তাদের সতর্ক পদক্ষেপ, চঞ্চল দৃষ্টি, শুষ্ক পত্রে মর্ম্মরিত—তাদেরই পদধ্বনিতে দ্রুত অকস্মাৎ পলায়ন, ঐ কালীপাহাড়ীর শার্দ্দূল আর চিত্র ব্যাঘ্রের আতঙ্ক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—ওদের জিঘাংসা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস।

দূরে পাহাড়-প্রাচীরের অপর পার্শ্বে সমতল উপত্যকাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে কতকালের এক জীর্ণ কুটীর—কবাট জানালা শূন্য। ঐ বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে রাখালের বাঁশী বাজে—রাত্রে এর সান্নিধ্য রহস্যে পূর্ণ। এরই পাদমূলে ব'য়ে যাচ্ছে উপলঝঙ্কৃত চরণে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। কোন সুউচ্চ পাহাড়ের অদৃশ্য আড়াল থেকে নির্ম্মল জলধারা ব'য়ে এনেছে—শ্রান্ত গো, মহিষ ও রাখাল এখানে তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই নির্ঝরিণীর উৎস-মুখের কিছু দূরে লুকিয়ে আছে আর একটি শীর্ণ জলধারা—এ ধারা পথ হারিয়ে সঞ্চিত হ'চ্ছে প্রস্তর-কূপে। এখানে জলপান ক'রছে অরণ্যের পশু, পাখী—

কখনও বা গায়ে ডোরাকাটা অপূর্ব্ব বাঘ, গায়ে চাকা চাকা দাগওয়ালা লেপার্ড। অতি নিভৃতে এই জলপানের সুযোগ দেখলে মনে হয় এটা পথভোলা বন্য নির্ঝরিণীর অহেতুক আত্মবিলোপ নয়, এটা একটা বিশেষ আয়োজন। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে পশু পক্ষীকে নির্ব্বিঘ্নে জলপান করার অবসর দেবার জন্য অরণ্য-জননীর এ এক ছলনা ভরা পরিবেশন।

ফাগুনের প্রারম্ভে অরণ্য-প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে গন্ধমধুর। বনফুলের মৃদু মিষ্ট সুবাসে বসন্তের মাঝামাঝি ফোটে অজস্র মহুয়া ফুল। এই বিশাল অরণ্য তখন মহুয়া গন্ধে মাতাল। নিকটে ও দূরে সবুজ পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে শিমুল পলাশের লাল শোভা···মহুয়াতলে অজস্র শুভ্র ফুলের রাশি। এর আকর্ষণে ছুটে আসে চিত্র হরিণ, কদাকার, বিশাল, বজ্রের মত বলিষ্ঠদেহ ভল্লুক···ঝোপের আড়াল থেকে কোট্‌রা হরিণের ডাক শোনা যায়—বন্যকুক্কুটের রব আর ময়ূরের কেকাধ্বনি।

অরণ্যজননী তার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিচ্ছেন বিভিন্নধর্ম্মী কত পশু পক্ষী—কত বিভিন্ন তাদের আকার—বিচিত্র তাদের রং—কী বিস্ময়কর তাদের চলার ভঙ্গী। কারুর কণ্ঠে কূজন—কারুর কণ্ঠে বা হৃৎকম্পকারী গর্জ্জন। বুকের স্তন্যধারা স্রোতস্বিনী হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে—রসধারা জুগিয়ে প্রাণ সঞ্চার ক'রছে নিরেট পাথরের বুকে এই অরণ্যকে। চারিদিকে সবুজ পাতার কোলে ফলে আছে অসংখ্য বন করঞ্চা—বৈঁচি—আরও ছোট ছোট নাম-না-জানা কত অজস্র মিষ্টি ফল—পাখীর আহার, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত কাঠুরেদের খাদ্য।

অরণ্যের এই সবুজ, এই অকুণ্ঠ সৌন্দর্য্য, পুষ্পপল্লবের প্রাচুর্য্য ও বিচিত্র বর্ণ—ধূসর পাহাড় আর নীল আকাশে নিভৃত সম্ভাষণের এই লীলাক্ষেত্রে প্রকৃতির খেয়ালে উদ্ভূত এই গম্বুজায়িত পাহাড়, আমার

চোখে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়। হিংস্র জানোয়ারের আবাস ব'লে এই পাহাড় অরণ্যচারীদের কাছে মূর্ত্তিমান বিভীষিকা।

আমাদের পরবর্ত্তী বহুশিকার প্রয়াস চলেছিল এই "কালী-পাহাড়ীকে" কেন্দ্র করে। শিকারের সঙ্গী কখনও চৌধুরী কখনও বা অন্য বন্ধুবান্ধব। আমাদের ক্যাম্প ছিল 'একতারার' ডাকবাংলো। বাংলোটী পাহাড়ের পদপ্রান্তে। সহর থেকে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে অরণ্য পরিবেষ্টিত এই বাংলোতে পদার্পণ ক'রেই আমরা শিকারের আবহাওয়ায় মশগুল হ'য়ে যেতাম। সকাল ও অপরাহ্ণে পায়ে চ'লে অরণ্যভ্রমণ আর রাতের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হ'তেই মটরে অরণ্য পরিক্রমণ। ক্যাম্পে চ'লত শিকারের আয়োজন। শিকারের গল্প, কখনও বা রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যঙ্গকৌতুক, আর ডাঃ চৌধুরীর জ্যোতিষ্ক চর্চ্চা। এই শিকার পর্য্যটনে আমরা আরও কয়েকটী গ্রাম্য শিকারীর সান্নিধ্যে এসেছি। তিনটী দুঃসাহসী লোক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুণোয়া, মোদিয়া, আর ফাগুয়া। নাম কয়েকটীর উচ্চারণ যেমন সহজ, তাদের জীবনযাত্রাও তেমনি। জঙ্গল পর্য্যটন এদের প্রাত্যহিক ব্যাপার। কোথায় বাঘের পাঞ্জা দেখা গেছে—কোথায় বাঘ শূয়োর ধ'রে খেয়েছে, কার মোষটা আজ দু'দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও বাঘিনী বাচ্চাসহ জলপান করেছে এই খবরগুলো তাদের মুখে শুনতাম। ক্যাম্পে আমাদের গল্প গুজবও মাঝে মাঝে সরস হ'য়ে উঠ্‌ত হঠাৎ জানোয়ারের ডাকে। একটা রাতের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সারাদিন ধরে বাইরে টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি। ডাকবাংলোয় ডাইনিং টেবিলে আমাদের শিকারের গল্প চ'লছে। হঠাৎ শিকারী বন্ধু ডাক্তার হবিব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। বাংলোর ঠিক বাইরেই বাঘের আওয়াজ শোনা গেছে। রাইফেলে গুলী পুরে আমরা বেরিয়ে গেলাম।

টর্চের সাহায্যে চল্‌ল অনুসন্ধান। কিছুই নজরে এল না। মটর নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। অনেক দূর অবধি খুঁজেও কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিন ভোরে দেখা গেল বাংলোর নিকটে গাছের নীচে শায়িত ভেড়ার পাল থেকে ভেড়া অদৃশ্য হয়েছে। আমরা বাংলোয় ফিরে এসে আবার যখন গল্প গুজবে মনোনিবেশ করেছি তখন লেপার্ড ফিরে এসে একটা ভেড়াকে মুখে করে নিয়ে গেছে।

আর এক রাত্রের ঘটনা। আমি মোদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়েছি। দু'টী ভৃত্য বাংলোর বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। জঙ্গল থেকে ফিরে এসে মটরের ভিতরেই বসে আছি। ফাগুয়া সন্তর্পণে এসে ব'লছে—"সাহেব জলদি নেমে আসুন—একটা জানোয়ার বারান্দার বাইরেই তাক করে বসে আছে"। আমার মেজাজ ভাল ছিলনা—জঙ্গলে শিকার জোটেনি—বাংলোতে বাঘ গলা বাড়িয়ে বসে আছে? ফাগুয়ার ব্যস্ততায় বিরক্ত হ'য়ে একটা সটগানে এল, জি পুরে নিয়ে বেরিয়ে আসতেই জানোয়ারটা চোখে পড়ল, কিন্তু জানোয়ারটা তখন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে, টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম একটা বড় লেপার্ড। ফায়ার করলাম, জানোয়ারটা প'ড়ে গেল। টর্চের আলোটা নিভে গেছে—আমি বন্দুক হাতে এগোলাম—কিন্তু বাঘটা আবার উঠে অদৃশ্য হয়েছে। ফাগুয়াকে আহ্বান করে আমি ছুটে গেলাম আবার গুলী ছুঁড়ব।

অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে প'ড়লাম দশ বারো ফুট নীচে, একটা নালার ভিতরে। যে রাস্তায় ছুটেছিলাম সেটা একটা উঁচু বাঁধ। উপরের দিকটা অপ্রশস্ত।

একতারা ক্যাম্পের গল্পগুজবে কালীপাহাড়ীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাধোপুর, মহাদেও স্থান, বিষণপুর একতারা এই কালীপাহাড়ীর সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চল।

মহাদেও স্থান

বাঘ নয়—ভালুক

দিনের আলোয় মহাদেও স্থান দেখার সুযোগ আমার তখনও হয়নি। এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাত্রির অন্ধকারে। কে রেখেছিল আর কেন এর নাম হয়েছিল মহাদেও স্থান সে আলোচনা সময়ান্তরে হবে! আজ বর্ণনা করব সেই রূপ—যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তামসী নিশার গাঢ় আঁধারে।

সুদূর বস্তীর নিরক্ষর কাঠুরেরা তখন মহুয়া মদে অচেতন। আর অচেতন না হ'লেও, এ বস্তীর কোন কোলাহল সে জঙ্গলে প্রবেশ করে না। আকের ক্ষেতের উচ্চ মাচায় ঘুমিয়ে প'ড়েছে চাষী—সেও ক্রোশ দুই দূরে। সেখানে ভালুক আকের ক্ষেতে ঢুকলে হয়ত তার তন্দ্রা ভেঙ্গে যাবে, হাতের কৌশলে বাজবে টিনের ক্যানস্তারা। বস্তীতে লেপার্ডের দৌরাত্ম্য হ'লে সেখানেও কাড়া নাকাড়া বাজ্‌বে। তখন অর্দ্ধনগ্ন শিশুদের কোলাহল সুরু হবে তালপাতার জীর্ণ কুটীরে—মায়ের কোল ঘেঁষে। মহুয়া-বিভল ঘুম ভেঙ্গে যাবে বস্তীর ঘরে ঘরে। কিন্তু এ বস্তীর কোন চাঞ্চল্যই সুদূর অরণ্যে পৌঁছোয় না।

অরণ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চকিত হয়ে উঠে—হরিণের চীৎকারে, কোটরার ঘোষণায়। কোটরা গভীর অরণ্যের চৌকিদার। জঙ্গলে এর গতায়াত শব্দহীন; কিন্তু "কাটোহা" বা হিংস্র জানোয়ার বেরিয়ে এলে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত কোটরার গম্ভীর রবে এলার্ম বাজে; ত্রাসে ছুটোছুটি করে হরিণের দল—আরও কত বন্য পশু। শম্বর, বরাহ হুঁসিয়ার হয় বাঘের ভয়ে।

শব্দলেশহীন এমনি নিশুতি রাতে আমরা বেরিয়েছি শিকারে। সন্ধানী আলোতে খুঁজছি অরণ্যের বিস্ময়। এই স্তব্ধ রাতে সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে,—শুধু ঘুমের ঘোর কেটে গেছে এই রহস্য পুরীর। এর কীট পতঙ্গ থেকে সচল হ'য়ে উঠেছে জঙ্গলের প্রত্যেক প্রাণী; ছোট বড় সব জানোয়ার। লেপার্ড তাক্ করে বসে আছে হরিণের যাতায়াতের রাস্তায়; বাঘ পিছু নিয়েছে বন্য বরাহের, হরিণের গতি অড়হর ক্ষেতের দিকে। ভালুক খুঁজছে পিঁপড়ের গর্ত্ত, উইএর ঢিবি, মৌচাকের মৌ—আকের ক্ষেত পেলে ত কথাই নেই। শুধু গাছের ডালে ঘুমিয়েছে হাজার হাজার পাখী, কিন্তু নীচের অরণ্যচারীরা সচল সক্রিয়।

নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের খোলা মটর। হুড নেই, সামনের উইণ্ডগ্লাসও খুলে ফেলা হয়েছে। মটরের আরোহীরা অন্ধকারে বসে আছি স্তব্ধ হ'য়ে। শুধু নবী আক্তারের হস্তধৃত স্পট্ লাইট হ'তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দূরপ্রসারী আলোর শিখা। এই বিদ্যুতালোকে দেখা যাবে জানোয়ারের চোখ—আগুনের ভাঁটার মত জ্বলন্ত হ'য়ে। অভিজ্ঞ শিকারী চোখের আয়তন, দুই চক্ষুর ব্যবধান, চোখের রং আর জমি হতে এর উচ্চতা দেখে বুঝে নেবে-এ জানোয়ার বাঘ না লেপার্ড, ভালুক, শম্বর, না বন্য বরাহ, শেয়াল না হায়না।

বাঘের মত হুঁসিয়ার ও উৎকর্ণ জানোয়ার আর নেই। এর পদক্ষেপ নিঃশব্দ। বনের শুষ্ক পাতাও এর কথা শোনে। মনে হয় তারাও এর শাসনে স্তব্ধ। এতটুকু শব্দ করলেও এর ক্ষমা নেই। গাছের শাখা প্রশাখা একে পথ ছেড়ে দিচ্ছে সভয়ে। খবর্দ্দার, এতটুকু ত্রুটীও এর বরদাস্ত হবে না! তবু এর শাসন অমান্য করে ডাকে কোট্রা। আর গাছের ডালে বানরের দল বাঘের সাড়া পেলে কিচ্‌মিচ্ করে—শাখা থেকে শাখান্তরে লাফিয়ে

লাফিয়ে বাঘের অনুসরণ করে। বাঘ তাদের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, ভয়াল মুখে দেখা দেয় ভ্রূকুটী! বানরকে সহসা বাগে পায় না। কিন্তু কোটরার সাজা কভু বা সম্ভব হয়। প্রাণদণ্ড তার ধৃষ্টতার সাজা। কোটরার প্রাণের মূল্যে প্রাণ বাঁচে অন্যান্য প্রাণীর।

স্পট্ লাইটে বাঘ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতটুকু শব্দ তার কাণ এড়ায় না। লতাগুল্মের ঈষৎ আন্দোলন, পলায়মান জানোয়ারের নিঃশব্দ গতি এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। একবার মুখোমুখী হলে ত কথাই নেই। এর বজ্রগর্ভ হুঙ্কারে বিবশ হয়ে যায় বনের জন্তু,—এর সন্ত্রাসবর্ষী দৃষ্টিতে তাদের গতি হয় রুদ্ধ।

যদি স্পট্ লাইটে সহসা বাঘ সামনে পড়ে যায়,—এর ভঙ্গীতে উপলব্ধি হয় এর বিপুল শৌর্য্য,—সে নির্ভয়ে প্রসারিত দেহে দাঁড়িয়ে দেখে আততায়ীর স্পর্দ্ধা। যদি সাহস না হারাও, এবারে রাইফেল তুলে গুলী চালাও। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কি হ'তে পারে ভেবে নিও। সে গর্জ্জনে চেতনা হারিও না। নিমেষে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। এর দৈহিক বল আর জীবনীশক্তি অসামান্য। মর্ম্মস্থল বিদ্ধ না হ'লে দুটী চারটী গুলী বাঘের পক্ষে কিছুমাত্র মারাত্মক নয়। বাঘ শিকারের এই থ্রিল শিকারীকে আকৃষ্ট করে।

এরই আকর্ষণে ছুটে এসেছি পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে মটরে। পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর, বিহার সরিফ আর নওয়াদা পার হয়ে যে মটরের রাস্তা চলে গেছে রজৌলী আর কোডার্মার দিকে, সেই রাস্তা থেকে বাঁয়ে একতারা আর মহাদেও স্থানের পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ে। নওয়াদা থেকে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে এগিয়ে গেলে যে রাস্তা পূর্ব্বদিকে আকবরপুরের দিকে চ'লে গেছে—সেখান থেকে একতারা ডাকবাংলো মাত্র আর দশ মাইল। আরও তিন মাইল অরণ্যের ভিতরে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেলে ককুলতের ঝরণার কাছে পৌছান যায়।

আমরা অপরাহ্ণ ৩টায় গাড়ী ছেড়ে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে একতারা ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছুলাম। এই বাংলোর রক্ষক এক বৃদ্ধ মুসলমান চৌকিদার। তার সঙ্গে বাস করে তার এক পৌত্র, তার স্ত্রী, আর একটা রুগ্ন কুকুর। সন্ধ্যা না হতেই চৌকিদার ঘরের কপাট বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ডাকবাংলোয় কোন শিকারী এসে আশ্রয় না নিলে এ নির্জ্জন অরণ্যপ্রান্তে এ বাংলোটী নৈশ অরণ্যের মতই স্তব্ধ। রাত্রে এর প্রাঙ্গণে কখনো কখনো আনাগোনা করে লেপার্ড বা মহুয়া লোভী ভালুক। এখান থেকে দূর হতে শোনা যায় হরিণের ডাক, শম্বরের গম্ভীর আওয়াজ। কদাচিৎ বাঘের গর্জ্জন। ডাক বাংলোর প্রাঙ্গণে আমার সঙ্গে লেপার্ডের সাক্ষাৎকার হয়েছে—সেখানে এ ব্যাপার কিছু মাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয়।

বাংলোয় আমাদের খানসামা রাত্রের খাবার তৈরী করল—বাইরের অঙ্গনে আরাম কেদারায় শুয়ে গল্প-গুজবে আমাদের মধ্যরাত্রি কেটে গেছে। দূরবর্ত্তী বস্তী 'সুগ্রী'র শেষ দীপশিখা যখন আঁধারে আত্মাহুতি দিয়েছে, মধ্যযামের নিশুতি নেমে এল চরাচর গ্রাস ক'রে, তখন নৈশচারী আমরা দুই বন্ধু বেরিয়ে প'ড়েছি গহন বনে। মটরের সারথি ছবিনাথ। পিছনের সিটে স্পটলাইট হাতে দাঁড়িয়েছে নবী আক্তার। অন্ধকারে তার মানুষের আকৃতি দেখা যায় না। রক্তমাংসে গড়া দেহ—না শুধুই একটা নিরর্থক অবয়ব—স্পষ্ট মালুম হয় না। মানুষের পরিচয় বোঝা যায় যখন শিকারের উপযুক্ত জানোয়ার চোখে পড়ে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে চাপা নিঃশ্বাসের মত মৃদু আওয়াজ—'লেফ্‌ট', 'রাইট', 'ষ্টপ', 'ফায়ার'! কখনো শুনতে পাই 'হুঁসিয়ার! বড়া জানোয়ার হায়, রাইফেল তৈয়ার রাখিয়ে'। শিকারীর নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে, রাইফেলের মুষ্টি দৃঢ়তর হয়। সহসা দেখতে পাই, অরণ্যের আড়ালে

জ্বলন্ত শিখা—বড় জন্তুর চোখ। তারপর সুরু হয় মটরের গতিনিয়ন্ত্রণ—এদিক সেদিক ডাইনে বাঁয়ে 'ষ্টপ, ফায়ার!' এক গুলীর পরে ওর উত্তেজনা বেড়ে চলে—ক্রমাগত উত্তেজিত চীৎকার 'ফায়ার', 'ফায়ার', 'ফায়ার'! আমরা বলি 'গির্‌গিয়া', কিন্তু নবী আক্তার সে কথায় খুসী নয়—'আউর এক ফায়ার।'

আগেই বলেছি এমনি স্তব্ধ রাতে মহাদেও স্থানের নৈশ রূপের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

জঙ্গলের চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কোন জঙ্গল? ডাক্তার চাপাকণ্ঠে বললেন—এ মহাদেও স্থান। এখানে বড় জানোয়ার পাবেন, বাঘও আছে। 'আজ জরুর শের নজর আওয়েগা।' মনে পড়ল আমার নিতান্ত জিদ সত্ত্বেও নবী আক্তার জঙ্গল বীটিং-এর অনুমতি দেয় নি। মোদিয়া জানিয়ে দিয়েছিল তিন দিন পূর্ব্বেকার ঘায়েল ছুটো বাঘ তাদের শাবক নিয়ে এরি কোন জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে—জলের ধারে এদের পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। গুলীখাওয়া বাঘ কত হিংস্র সে খবর আমরা ভাল ক'রেই জানি। নবী আক্তারের মুখে মহাদেও স্থানের কথা শুনে আমরা উল্লসিত। আশে পাশে সভয়ে ও সোৎসাহে তাকিয়ে দেখেছি—মনে হ'ল নিথর গাছগুলি অধরোষ্ঠে তর্জ্জনী চেপে সশঙ্কে লক্ষ্য ক'রছে বাঘের নিঃশব্দ চলাচল। অন্ধকার যেন আরও গাঢ়তর হ'ল, অরণ্য আরও স্তব্ধ! হর্ষে শঙ্কায় প্রতীক্ষা কচ্ছি রাজ-সাক্ষাৎকার। রাজ-সাক্ষাৎকারই বটে, অরণ্যে এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর কার?

মনে পড়্‌ছে এই অঞ্চলের অধিবাসী হবিব সাহেবের কথা। ইনি নিজে ডাক্তার। গ্রামে এঁর চিকিৎসক বলে সুখ্যাতি প্রচুর। কোন পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বা কোন শিকারী, ডাক্তার হবিবকে সাথে না নিয়ে গেলে শিকার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল মনে

করে না। আশৈশব হবিব সাহেব অরণ্য উপকণ্ঠে বাস করেছে। কিন্তু সেদিন কাবুলীর মত এই ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, ৬ ফুট দীর্ঘ হবিব সাহেব, আমার বন্ধু ডাক্তারকে বার বার মিনতি করে বলছিল—"ডাক্তার সাহেব, সে রোমহর্ষণ মূর্ত্তি দেখার পরে আমার হৃদ্‌রোগ হয়েছে—রাত্রে আমার ঘুম নেই, চোখ বুজলে দেখতে পাই—হা-হা করে ছুটে আসছে সেই বাঘ—মু ফাঁড়ে হুঁয়ে জবান নিক্‌লে হুঁয়ে—হা হা করতে করতে ভাগে চলতে—।" হবিব সাহেব বারবার কাতর হ'য়ে বলছিল, "সত্যি ডাক্তার সাহেব আমার হার্টটা পরীক্ষা করে ওষুধ দিন—আমার প্যাল্‌পিটেশন দেখ্‌লেই আপনার দয়া হবে।" এই কাবুলীর মাসতুতো ভাই—যে ভয়ের সঙ্গে সেদিনকার ক্রুদ্ধ বাঘের বর্ণনা করছিল—আমরা বিস্ময়ে অবাক হ'য়েছি। বেশ মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন—সেই বাঘ এই জঙ্গলেই হানা দিচ্ছে। ওদিকটায় শিকারে নাই বা গেলেন।

আমার চিন্তাস্রোত বাধা প'ড়ল নবী আক্তারের উত্তেজনায়। সেই দৃঢ়-সম্বদ্ধ দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল—'টাইগার, টাইগার!' আমাদের দুটী রাইফেল উদগ্র হ'ল আর সঙ্গীদের কয়েক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ। পত্রপল্লববহুল ঝোপের ভিতরে তৎক্ষণাৎ চম্‌কে গেল কোন্ জানোয়ারের স্পট লাইট জ্বলা উগ্র আঁখি। ঐ অতটুকু মাত্র। তারপর সব নিথর।

এ দুর্গম জঙ্গলে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ যত প্রকারে সম্ভব করা গেল কিন্তু সে বিচিত্রবেশী অরণ্যরাজের সন্দর্শন আমাদের ভাগ্যে ছিল না। অতিথির প্রতি শিষ্টাচার তার কুষ্ঠিতে নেই—সে হয়ত অন্তরাল থেকে অর্দ্ধস্তিমিত নয়নে বুঝতে চেয়েছিল—স্পট লাইটের রহস্য আর আমাদের গাড়ীর লৌহদেহের স্বরূপ!

রাজ সম্বর্দ্ধনার অধিকার পেলাম না। আমাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিসর বনপথে যথেচ্ছভাবে

জানোয়ারের পশ্চাদ্ধাবন অসম্ভব। আক্ষেপ নিষ্ফল। মোটর আবার এগিয়ে চল্‌ল ঝোপঝাড়ের বিচ্ছেদ পথে—গুল্ম, বল্লরীর প্রতিবন্ধক ঠেলে।

এ জঙ্গলের বিশেষত্ব এই—পাথরের মত শক্ত মাটী, গাড়ী গড়িয়ে চলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জিলার মত নরম মাটী হলে গাড়ীর চাকা বসে যেত—এগোত না। আর এখানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের মত আগাছার দুরতিক্রম্য জঙ্গলও নেই। বিহারের প্রস্তরাকীর্ণ জমি ফুঁড়ে যে গাছ জন্মে তারা পাথরের মতই মজবুত, মহাপ্রাণ। ক্ষীণপ্রাণ আগাছার কোন স্থান নেই। ঝোপ-ঝাড়গুলির সবই বনকুল, কাঁটা-বৈঁচী আর বনকরঞ্চা। পাহাড়ে বাঁশের ঝোপও প্রচুর—কঞ্চিবহুল হ্রস্ব, নিরেট বাঁশ। তার একটাও সোজা নয়—প্রত্যেকটী অষ্টাবক্র মুনি। ঝাড় থেকে একটী বাঁশ কেটে নেওয়া প্রাণান্তকর ব্যাপার। দৈর্ঘ্যে কেহই ৬।৭ ফুটের অধিক নয়। এই ঝোপঝাড়গুলিতে দৃষ্টি চলাচল অসম্ভব। প্রত্যেকটি গাছ পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ। পরস্পর নিবিড় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে আছে—ভালুক ও বরাহদন্তেরও অভেদ্য! রাত্রের অন্ধকারে মনে হয়—দেহহীন অসংখ্য কবন্ধ। সারি সারি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে অরণ্যচারীর গতায়াত।

জমি ক্রমোচ্চ হয়ে মিশে গেছে পাহাড়ের গায়ে। ঝড়ের হাওয়ায় শুষ্ক পাতা উড়ে যায় বনসীমার নীচের জমিতে। অথবা জঙ্গলের অসংখ্য খাত গহ্বর পাতার রাশিতে ঢেকে গিয়ে এই বন্ধুর পার্ব্বত্যভূমির দেহ হয়ে ওঠে সমতল। মনে হয় জঙ্গলের জমাদার ঝাড়ু হাতে ঝাঁট দিয়ে রেখেছে—অরণ্যের দিবারাত্রির এ অপূর্ব্ব আসর। আমাদের গাড়ী চলে এই ঝোপঝাড়ের ব্যবধান পথে।

যেখানে বিরাট মহীরুহেরা রচনা করেছে বিশাল বন, নীচে এদেরই শিশুতরুশ্রেণী, তার ভিতরেও গাড়ী চলে যায় গাছের ফাঁকে

ফাঁকে। কোথাও রাস্তা সঙ্কীর্ণ হ'লে মটরের সঙ্গী জঙ্গলের পথ প্রদর্শক 'মোদিয়া', 'ফাগুয়া', 'পুনোয়া' নেমে গিয়ে রাস্তা করে দেয় ছোট গাছগুলি কেটে। শিকারের সুবিধার জন্য জমিদারের বা শিকারীর খরচে দিবাভাগেও রাস্তা করে রাখে।

দুর্ঘটনা ঘটেনা এমন নয়। জানোয়ার লক্ষ্য করে চলার বেগে অসতর্ক গাড়ী পড়ে যায় পাতায় ঢাকা নালা, খানা বা গহ্বরে। আরোহীরা ছিট্‌কে পড়ে এর-ওর গায়ে। বন্দুকে বন্দুকে বা বন্দুকে আর শিকারীর মাথায় লাগে ঠোকাঠুকি। কখনও গাড়ী বসে যায় পাহাড়ের শুষ্ক নদীর বালুতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেও গাড়ী এক ইঞ্চিও না এগিয়ে ধ্বসে যায় চোরা বালুর গহ্বরে। আমাদের গাড়ীতে থাকে শাবল, কোদালী, কাটারী আর টাঙ্গী। কোথাও মাটী কেটে রাস্তা করে দিতে হয়, কোথাও বা গর্ত্ত বুজিয়ে দেওয়া, আল কেটে দিয়ে সমতল করা আবার চোরা বালু কোদালী দিয়ে তুলে নিয়ে চাকার নীচে গুঁজে দিতে হয় গাছের শাখা প্রশাখা। শিথিল বালুর উপরে শক্ত ডালপালা, গাড়ীর চাকা তাই আঁকড়ে ধরে। শিকারী আর সঙ্গীরা পেছন থেকে ঠেলে দেয়—শুধু ফুল থ্রট্‌লে-ই গাড়ী এগোয় না। আমাদের গাড়ী কতবার এমন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকে জানোয়ার স'রে যায় দূর জঙ্গলে, গাড়ীর বিভ্রাটের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে শিকারের ব্যর্থতা।

আবার শঙ্কিত অরণ্যপথে এগিয়ে চ'লেছি। অরণ্যের নৈশরূপ আমাদের যাদু করেছে। পাহাড়ের তুহিন শীতল হাওয়ায় এই পৌষ রজনীর শেষ যামে কাঁপছি থর থর করে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কভু বা জানোয়ার, কভু বা জানোয়ারের আলেয়া আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে বন হ'তে বনান্তরে। অন্ধকারে অরণ্যের বৃক্ষরাজি একাকার হয়ে গেছে। গাছ ব'লে চেনা যাচ্ছে—যখন স্পট লাইটের আলোর মায়া বিচিত্র ক'রে ফুটিয়ে তোলে এদের শাখা-প্রশাখা—

রঙীন পল্লব-দল। আশে পাশে দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের রাশি। হঠাৎ সে অন্ধকার রূপান্তরিত হয় প্রোজ্জ্বল শাখাপ্রশাখায়।

স্পট লাইট সঞ্চালিত হচ্ছে ইতস্ততঃ ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে, কখনও বা বৃক্ষশাখে ভালুকের সন্ধানে। আরও উর্দ্ধে তাকাও, নৈশ আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যাচ্ছন্ন বিরাট দেহ—'পাহাড় বসে আছে মহামুনি।' সহসা আনমনা হয়ে যাই—কাণে শুনতে পাই সেই নিশ্চল ধ্যানীর নিঃশব্দ বাণী—কি খুঁজছ পথিক এ গহন বনে? মুহূর্ত্তমাত্র। চোখের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়েছে আঁধারের জটিল রহস্যে। আবার চোখ যায় আলোর গতি লক্ষ্য ক'রে—যেথায় গহনে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বট। শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ উপর থেকে নেমেছে অসংখ্য নামাল। শুনতে পাই দুই একটা ঘুম ভাঙ্গা পাখীর আর্ত্তরব।

নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে দীর্ঘকাণ খরগোস। ক্ষুদ্রদেহ খেকশিয়ালী, বন্যবরাহ, শজারু, অদ্ভুত কর্কশ দেহ বজ্রকীট—দীর্ঘ তাদের লাঙ্গুল, পৃষ্ঠদেশ উন্নত। উঁদ বেড়াল, পতঙ্গভুক জানোয়ার। কোথাও বা বন বিড়াল। হঠাৎ দেখতে পাই মাথায় দীর্ঘ শিং-এর মুকুট পরে দাঁড়িয়েছে মৃগরাজ শম্বর। মটরের ছুটোছুটী আরম্ভ হয়, রাইফেলের নির্ঘোষ। মোদিয়া হৃষ্ট হয়ে ওঠে মাংসের লোভে।

তিনটা জানোয়ার রাত্রের শেষার্দ্ধে দেখা গেল। কদাকার বলিষ্ঠ দেহ ভালুক। মহুয়ায় মত্ত হয়ে মেতেছে ক্রীড়ায়। স্পট লাইটের আলোতে প্রথমে চোখে পড়েছে তিন জোড়া রক্ত চোখ। নবী আক্তার সাহসী শিকারী, কিন্তু জানোয়ার দেখলে তাঁর উত্তেজনার সীমা থাকে না। 'লেফ্‌ট রাইট', 'ব্যাক', 'ষ্টপ' এমনি আদেশ শুনেছি অনর্গল। তাঁর এ আদেশে অভিজ্ঞ ড্রাইভার না হ'লে প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলে। শিকারীর গুলীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

আমরা রুদ্ধ শ্বাসে প্রতীক্ষা করছি—কখন হুকুম শুনব "ফায়ার"। নবী আক্তারের হুকুম না হ'লে আমাদের ফায়ার করবারও অধিকার নেই।

মোড় ঘুরে যেতেই দেখা গেল ভালুক তিনটাই বেশ বৃহদাকার। একটা খুবই বড়। বোধ হয় দলপতি—এদের মুরুব্বী। আলো আর মটরের ঘোরা-ফেরায় এরা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমরা তীক্ষ্ণ চোখে এদের গতি বিধি লক্ষ্য করছি; কিন্তু স্পট লাইটের তীব্র আলোকে ভালুক আততায়ীর স্বরূপ বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ অর্ডার হ'লো "ফায়ার"। মুহূর্ত্তে দুই বন্ধুর রাইফেল থেকে বেরিয়ে এল একহাত দীর্ঘ অগ্নিশিখা। আমার হাতে 'মষার ৪২৩' আর বন্ধুর হাতে 'উইনচেষ্টার ৪০৫'। রাইফেলের আওয়াজে পাহাড় জঙ্গল কেঁপে উঠেছে—প্রথম দুই গুলীতেই বড় ভালুকটা ধরাশায়ী হ'ল। 'ফায়ার' 'ফায়ার'—নবী আক্তারের আদেশ। আবার গুলী চললো—তাকিয়ে দেখছি, দ্বিতীয় ভালুক গুলীবিদ্ধ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার অবসর হল না। হঠাৎ দেখা গেল ধরাশায়ী বড় ভালুকটা দুই পায়ে দাঁড়িয়ে তেড়ে চার্জ্জ করে আসছে আমাদের লক্ষ্য ক'রে। 'ফায়ার', 'ফায়ার' রাইফেলের নির্ঘোষ আর ভালুকের গর্জ্জনে সে মহুয়া বনে জেগেছে পশুপতির তাণ্ডব। কিন্তু এমন সোজা বুকপাতা টার্গেট দিয়ে গর্জ্জন নিষ্ফল। ভালুকটা তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হ'ল। মোদিয়া চেঁচিয়ে বলছে "গির্‌গিয়া" কিন্তু নবী আক্তারের হুকুম হোলো "ফায়ার এগেন"। কিন্তু আর নয়। ওদিকে গুলীবিদ্ধ ভালুক পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ডাক্তার সাহেবের আদেশ অমান্য ক'রে গাড়ী ছুটিয়ে দিলাম সেই ধাবমান ভালুকের পশ্চাতে। নবী আক্তার বধির; আমাদের আদেশ সে শুনতে পায় নি, সে চীৎকার করছে "ব্যাক-ব্যাক"—ষ্টপ"। ভালুক দেখা গেল—আবার নবী আক্তারের চীৎকার "গো অন—গো অন" আমাদের

উত্তেজনা অনর্থক বাড়িয়ে তুলছে। আবার রাইফেলের গর্জ্জন—এটাও ভূপাতিত হয়েছে। নবী আক্তার কিন্তু খুসী নয়—আদেশ হ'ল "আউর এক ফায়ার।" কিন্তু এ আদেশ পালন করতে আমরা প্রস্তুত নই। ড্রাইভার আমাদের হুকুমে গাড়ী চালিয়েছে দূরে বিলীয়মান তৃতীয় ভালুকের পশ্চাতে। আমরা তার ক্রুদ্ধকণ্ঠের চীৎকার শুনছি "ব্যাক" "ব্যাক" "ষ্টপ"। হঠাৎ গাড়ীর গতি রুদ্ধ হ'ল। মটরের টিউব ফেটেছে! আমরা অসহিষ্ণু "গো-অন, গো-অন" কিন্তু গাড়ী অচল। নিরুপায়, নেমে গেলাম রাইফেল হাতে নিয়ে। তখনো দূরে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ, বোধ হয় ভালুক। এবারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের গতি। কিন্তু পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে একে পাওয়া যাবে না। এমন সময় মোদিয়া চুপি চুপি বললে শুনুন—বাঘ ডাকছে, "শের গরজতা হ্যায়।"

আশ্চর্য্য কি? আজ সমস্ত অরণ্য ক্ষেপে গেলেও বিস্মিত হব না। কিন্তু একটা ভালুক যে হাত ছাড়া হল! যা শিকার হয়েছে সে সাফল্যে কত খুসী হয়েছি খেয়াল নেই—যা হাত ছাড়া হল তার জন্য আক্ষেপ। এ পৃথিবীর নিয়মই এই!

টিউব মেরামত হল। এক সঙ্গে সকলে টানাটানি করছি—গাড়ীতে বেঁধে নিতে ভালুক। এর হাত-পাগুলো ইস্পাতের মত কঠোর। পাষাণ স্তূপের মত ভারী। সে দেহ তুলে নিতে আমরা ঘেমে উঠেছি। এবার দ্বিতীয় ভালুককে তুলে নিতে হবে। কোথায় রাখা যায়? দেখা যাক—একটার উপরে আর একটাকে বাঁধা যায় কিনা। কিন্তু সে ভালুক কোথায়! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। এরও গায়ে অন্ততঃ দুবারে ৪টা গুলী বিদ্ধ হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া দূরে থাক এর দাঁড়াবার শক্তিও নেই। কিন্তু ভালুক পাওয়া গেল না! নবী আক্তার চটে গিয়ে বলছেন—বারংবার বলেছি, "ফায়ার এগেন।" তোমরা আদেশ উপেক্ষা করেছ।

আশা করি এবারে শিক্ষা হবে যে হিংস্র জানোয়ারের-উপরে ফায়ার হলে আমার এরূপ আদেশ অলঙ্ঘ্য। আমরা লজ্জিত হয়ে তাকে আদাব জানালাম।

এতক্ষণে ভোর হয়েছে। মহুয়ার শাখা আর বন করঞ্চার ঝোপ থেকে শোনা যায় বন বিহগের প্রভাতী গান। পূব দিক ফর্সা হয়ে উঠেছে—শুকতারাটীর নীচে। কিন্তু এ দৃশ্যে ডুবে যাওয়ার সময় নেই। পাটনা পৌঁছুতে হবে আফিস আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে। এবারে নিশার আঁধারের কবন্ধকুল নয়—উষার অস্ফুট আলোয় ক্রম প্রকাশমান ঝোপ-ঝাড় পশ্চাতে রেখে গাড়ী বেরিয়ে যাচ্ছে বন সীমান্তের উদ্দেশে। অক্ষত ভালুকের জন্য খেদ নেই—আহত ভালুকের ক্ষোভ বুকে নিয়ে পর্য্যটন শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম মটরের গায়ে।

ভালুক শিকার

বাম দিকে দাঁড়িয়েছে সোফার ছবিনাথ —পৃঃ ৬৬

বাঘ নয়, ভালুক

ভালুক অসাধারণ বলশালী জানোয়ার। সাধারণতঃ এদের গর্জ্জন শোনা যায় না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে এদের রুষ্ট গর্জ্জন ত্রাসের সঞ্চার করে। পর্ব্বতের ঢালুদেহ—খাড়াপাহাড়ে এরা অনায়াসেও এত দ্রুত চলাচল করে যে তা যথার্থই বিস্ময়জনক! মানুষ এদের খাদ্য নয়, কিন্তু ভালুক তাদের বিচরণ পথে কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করে না। তাই বনের কাঠুরে, মেষপালক বাঘের চেয়েও ভালুককে বেশী ভয় করে। একবার মুখোমুখী হ'লেই বিপদ। এদের তীক্ষ্ণ নখ ও দাঁতের আক্রমণে অসতর্ক পথিকের জীবনান্ত হয়। আক্রমণ সময়ে ভালুকের মুখবিবর থেকে বেরোয় থুৎকার। এই থুৎকার গর্জ্জন ও দাঁত নখের আক্রমণ বনের কাঠুরে বা শিকারী মারা না গেলেও তার নাক কান মুখ ও চোখ এরূপ ক্ষতবিক্ষত হয় যে, বীভৎস চেহারা মানব সমাজে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। আমি ভালুকের আক্রমণে বিকলাঙ্গ দুটি লোক দেখেছি। একজন ভদ্র সমাজে বাস করেনা, সে জঙ্গলের শিকারী আর একজন বিচার বিভাগের হাকিম। এরা দৈবাৎ প্রাণে বেঁচেছে কিন্তু মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্য থেকে এরা চিরবঞ্চিত। অরণ্যের দুর্দ্দান্ত দস্যু এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য লুণ্ঠন করে নিয়েছে!

ভালুক যেমন অবলীলাক্রমে দুর্গম পাহাড় আরোহণে, তেমনি বৃক্ষারোহণে পটু। অরণ্যের ভিতরে ডুমুর গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ—এমনকি উচ্চতম শাখায় এদের গভীর নখচিহ্ন দেখা যায়। এই গাছগুলি সর্ব্বাঙ্গে গভীর নখাঘাতের নামাবলী পরে শিকারীকে ভালুকের নৃত্য আবির্ভাবের সংবাদ দেয়।

ঝোপঝাড়ের ভিতরে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়ে এরা পিঁপড়ে, উই

পোকা অনুসন্ধান করে। যে পাথুরে মাটীতে শাবলের সাহায্যে গর্ত্ত করা কষ্টসাধ্য, সেখানে বড় বড় গর্ত্ত দেখে এদের দৃঢ় মজবুত নখরের পরিচয় পাওয়া যায়। অরণ্যে পাহাড়ে এদের যাতায়াতের পথ প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট। সন্ধ্যার প্রারম্ভে এই রাস্তা ধরে এরা খাদ্যান্বেষণে সমতল ভূমিতে নেমে আসে, আবার ভোরের দিকে বিশাল ভুজচতুষ্টয়ের ক্ষিপ্র সঞ্চালনে দুরারোহ পথ অতিক্রম করে আপন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

ভালুকের পদক্ষেপ এবং গতায়াত সম্পূর্ণ নির্ভীক—বেপরোয়া। কিন্তু ভালুক বাঘের মত হুঁসিয়ার নয়, চক্ষু কর্ণ বাঘের মত জাগ্রত নয়। ভালুক একরোখা—কতকটা আত্মনিষ্ঠ। আশেপাশের অন্য জানোয়ার বা মানুষের উপস্থিতি সে ভ্রূক্ষেপ করে না, আপন দেহশক্তিতে তার অখণ্ড বিশ্বাস। কিন্তু বাঘ বনের জানোয়ার শিকার করে খায় তাই তার গতিবিধি নিঃশব্দ ও সংযত। ভালুক কতকটা ভ্রূক্ষেপহীন ব'লে ভালুক শিকার অপেক্ষাকৃত সহজ। পরিশ্রম, নিবিষ্ট অনুসন্ধান এবং নিভৃতে সময়ের প্রতীক্ষা ভালুক শিকারে মোটামুটি এই যথেষ্ট। কিন্তু ভালুক সম্পূর্ণ অসতর্ক বা অসন্দিগ্ধ নয়। ডুমুর গাছে রাত্রের অন্ধকারে লুক্কায়িত আমরা কয়েকটি শিকারী গুলী ছোঁড়ার সুযোগ খুঁজছি—কিন্তু খানিক পূর্ব্বে একটি সিগারেটের ক্ষুদ্র টুকরো থেকে ঈষৎ ধূম বেরোচ্ছে দেখে ভালুক পালিয়ে গেল।

জল সম্পর্কে ভালুকের একটা অদ্ভুত ভীতি দেখা যায় এবং জলের দিকটা সে এড়িয়ে চলে। সাঁতার কাটতে ভালুককে কখনও দেখা যায় নি। নবী আক্তার এসম্পর্কে একটী ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার জঙ্গল পর্য্যটন সময়ে তিনি দৈবাৎ একটা ভালুকের সামনে পড়ে যান। ভালুকটা তৎক্ষণাৎ তাড়া করে। নবী আক্তার প্রাণপণে ছুটে যখন ভালুকের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না তখন হঠাৎ বন্দুকটা ভালুকের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভালুক তৎক্ষণাৎ বন্দুকটা বজ্রমুষ্টিতে

ধরে বন্দুকের ব্যারেলটি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ভেঙ্গে ফেললে! নবী আক্তার ক্ষণিকের এ সুযোগে একটা পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র জলাশয় পার হয়ে ওপার থেকে ভালুককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছিল। নবী আক্তার জানতেন সাঁতার কেটে জল পেরিয়ে আসার ক্ষমতা ভালুকের নেই। বন্দুকের বিনিময়ে সেদিন তাঁর প্রাণটা বেঁচে গেল নিজের উপস্থিত বুদ্ধিতে।

ভালুক আক্রমণের সময়ে সোজা দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত বক্ষে আততায়ীকে তাড়া ক'রে আক্রমণ করে। শিকারী তখন ভয়ে হতবুদ্ধি হলে তার বিপদ অনিবার্য্য। গেরিলা শিকার সম্পর্কেও শুনেছি সে শিকারীকে এক সেকেণ্ডের টার্গেট দেবে। এই অবসরে হয় শিকারী গেরিলাকে মারবে, না হয় গেরিলার হাতে শিকারীর প্রাণ যাবে।

মাধোপুর জঙ্গলে একরাত

কালীপাহাড়ীর বাঁয়ে একটা অনুচ্চ পাহাড়—ভূপৃষ্ঠে প্রস্তরীভূত অজগর। অজগরের মতই এঁকে বেঁকে মিশেছে—দূরান্তের পাহাড়-পুঞ্জে। পাহাড়ের গায়ে বনস্পতির সমারোহ নেই—এর দেহ গাঢ় সবুজ—অসংখ্য ঝোপঝাড়। এদের বিচ্ছেদ পথে মাঝে মাঝে দেখা যায় উষর পাহাড়-খণ্ড, কোথাও বা নিঃসঙ্গ খেজুর গাছ, দুই একটা শিশু বট।

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে কোশ্‌টেক রাস্তা এগিয়ে যাওয়া চলে—কমলপুর পর্য্যন্ত। এ রাস্তা নালা-খাদ আর গহ্বরে সমাকীর্ণ। বহু কসরতে বড় খাদটা পেরিয়ে যেতে পার্‌লে—প্রাচীন মহুয়া গাছটার নীচে গাড়ী রাখা চলে। শীতের অপরাহ্ণ, সূর্য্যাস্তের ম্লান রশ্মি পাহাড়ের ঝোপঝাড়কে বিচিত্র করেছে। একটা তিতির ডাক্‌ছে। বন্দুকটা তুলে নিলাম—রাত্রে আমিষ আহারের ব্যবস্থা হ'ল। বাঁয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য বস্তীটা কমলপুর। নবী আক্তার এই গ্রামের মোড়ল। কমলপুর—সহরের সভ্যতা থেকে অনেক দূরে; কিন্তু সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগে—যখন দিগন্তে ধূলো উড়িয়ে দূরদেশ থেকে মটর আসে—সহরবাসী শিকারীর ধূলি ধূসরিত রথ। কখনো সাহেব সুবো, কভু বা রাজকুমার—ইউরোপীয় পোষাকে পদস্থ দেশী সাহেব।

প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায় প্রশস্ত 'চবুতরা'। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় এখানে বস্তীর লোক জমায়েত হয়—"পুনোয়া" আর "ফাগুয়া"ও আসে। শিকারের গল্পগুজব চলে। সামনের পাহাড়টায় লেপার্ডের দৌরাত্ম্য বেড়েছে, ওদিকে আকের ক্ষেতটায় ভালুক আসে—বাঘের

গর্জ্জন শোনা যায় কালীপাহাড়ীর ক্রোড় শায়িত মাধোপুরের প্রান্তরে, আর 'বিষণপুর পাহাড়ী' থেকে নামছে বৃহদ্দন্ত বরাহ। খবরগুলো ব'য়ে আনে—পুনোয়া, ফাগুয়া আর মহাবীর। জানোয়ারের গতিবিধি এদের একমাত্র শিক্ষা—অরণ্য এদের বিদ্যালয়।

রাস্তায় ধূলোর ঝড় তুলে শীতের সায়াহ্নে আমিও সেদিন পৌঁছেছি এর সান্ধ্য-আসরে, সঙ্গে দুই সাথী। একজন আমার ভ্রাতা সুখ্যাত সাংবাদিক বিজয়বাবু, অপর মাসিক পত্রের লেখক প্রতুল। বিজয়বাবুর শিকারে স্পৃহা নাই, সাহচর্য্যে আনন্দ আছে। প্রতুল চাচ্ছে—গল্পের খোরাক, নিজের চোখে-দেখা শিকার কাহিনীতে তার সাহিত্য সরস হবে। বলা বাহুল্য, এঁদের কেউ শিকারী নন।

সাব্যস্ত হ'লো, আজ রাত্রে মটরে শিকার নয়, রাত জেগে জঙ্গলে কাটাতে হবে জানোয়ারের ধ্যানে। ভালুক ত জঙ্গলে ঢোকার পথেই দেখা যাবে। জঙ্গলে ঝরণার পাশে প্রথম যামে আসে চিতা বাঘ, দ্বিতীয় যামে বিশাল শিং-ওয়ালা শম্বর—কখনও বাঘ, আর ভোরের দিকটায় আসে লেপার্ড আর ভালুক।

আমাদের ক্যাম্প—পাঁচ মাইল দূরে একতারার ডাক বাংলো। আর অনর্থক দেরী নয়—গাড়ী ফিরে গেল সেই বাংলোয়। সেখান থেকে মুখ পুড়িয়ে, গরম খিচুড়ী খেয়ে মটরে ব'সেছি—সর্ব্বাঙ্গে শীতের আচ্ছাদন। গাড়ী তীরবেগে ছুটেছে—মাধোপুরের জঙ্গল সীমান্তে। সঙ্গে এ'ল নবী আক্তারের ছোট ভাই—তাঁরই যোগ্য অনুজ। নবী আক্তার বধির—ছোট ভাই তোতলা—একটি কথা গুছিয়ে বলতে মুখের কসরৎ চলে আধ ঘণ্টা। দুই ভাই-ই সাহসী শিকারী। একটা—অঙ্গ হানি না হ'লে বুঝি বড় শিকারী হওয়া যায় না! যে দিন বন্ধুর হাতের অনর্গল রাইফেলের আওয়াজে

আমার কানের একটা পটহ ছিঁড়ে গেল—সে দিন তিনিও আমাকে এই কথা ব'লেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কাণের মূল্যে কিনেছিলাম শিকারীর খ্যাতি।

জঙ্গল প্রান্তে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি—অরণ্যের নৈশপুরে। বন্ধুদ্বয় ছোট ভাই সহ উঠ্‌লেন যজ্ঞডুমুরের শাখায়—গভীর অরণ্যে ঝরণার পাশে। আমি খুঁজছি আশ্রয়ান্তর। আমাদেরই সঙ্গীর আহ্বানে অরণ্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল—একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ মানুষ। বিস্ময়ে টর্চ জ্বেলে দেখ্‌লাম—এ সেই বেদের সর্দ্দার 'শিবুয়া'—পাহাড়ী ভাষায় এদের বলে 'বিরোরী'। শিবুয়ার দেহ কৃশ, রুক্ষ কেশ থেকে নেমেছে দু-তিনটা দীর্ঘ জটা—এ নৈশ আঁধারের উপযুক্ত দোসরই বটে! মাধোপুরের ঝোপঝাড়ের ভিতরে শিবুয়ার ছাউনী পড়েছে—সঙ্গে তার দল বল—বিশ ত্রিশটী প্রাণী। সৈন্যাবাসের ছাউনী নয়, হাত চারেক লম্বা, হাত দুই উঁচু ডালপালায় তৈরী দুই তিনটী ঝুপরি। ঝুপরির বাইরে ধুনী জ্বলে—ধুনীর উপকরণ দুই একটা গাছের গুঁড়ি। ধুনীতে আলো নেই, শুধু গন্‌গনে আগুন। এই আগুনের চারি ধার ঘিরে বসে—ছেলে, বুড়ো, নারী আর পুরুষ। আগুনে ভুট্টা পুড়িয়ে খায়—পানীয় মহুয়ার মদ।

'শিবুয়া সাথে চল্—মাচা নেই—কোথায় বসি—শিকারে?'

'চল্ জাঘা আছে।'

অন্ধকারে পায়ে চলে এগোচ্ছি—সন্তর্পণে—কাঁটা গাছের ডালে পোষাক আট্‌কে যাচ্ছে—সে টান্‌ছে পিছনের দিকে। সাম্‌নে একটা জলাশয়ের মত। এ অঞ্চলে পুকুর নেই, এটা একটা পাহাড়ী খাদ—পাহাড় সান্নিধ্যে যেমন হ'য়ে থাকে এর ভিতরে ঝরণার জল জমেছে। চারিধারটা বাঁধের মত উঁচু। পশ্চিম পাড়ে জলাশয়ের উল্টোদিকে ঢালু জমিতে উবু হয়ে শুয়েছি। এম্‌নি ভঙ্গীতে কাটাতে

হবে সমস্ত রাত। পিছলে নীচে পড়ে যাচ্ছি—তাই পাশে গাছের শিকড়ে পা দুটো আটকে নিলাম। রাইফেল আর গান দুই-ই বোঝাই করে দুপাশে রেখে দিলাম—ডান হাতের কাছে বেশী ভারী রাইফেলটা। মাথাটা যে একটু উঁচু হয়ে আছে—জানোয়ার দেখতে পাবে নাকি!

চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম—অন্ধকারে সব একসা হ'য়ে আছে। ঝোপ-ঝাড়গুলো নিবিড় কৃষ্ণ, তাইতে এদের চেনা যাচ্ছে। পেছনে একটা বন্ধুর জমি—এখানেও ঝোপ-ঝাড়। সাম্নের দিকে দিগন্ত-প্রসারী শৈলমালা। অরণ্য আর পাহাড়ও অন্ধকারে একাকার হয়ে আছে। সমস্ত অরণ্যপ্রদেশ স্তব্ধ হ'য়ে আছে কিসের প্রতীক্ষায়। আমরা দেখি আর নাই দেখি—এ অরণ্যের আশে-পাশে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আস্‌বে অরণ্যচারী জীব—শেয়াল, হায়না, চিতা, হরিণ, শম্বর, আর ভালুক—হয়ত বা বাঘ। দিনের আলোয় এদের চিহ্ন মাত্র দেখা যেত না। আঁধারের আবরণে পাহাড়ের গুহা আর গহ্বর মুক্ত হয়েছে—সেইপথে বেরোবে কত অপূর্ব্ব জীব, জানোয়ার! হয়ত এদের কাউকে দেখতে পাব না। দেখতে সাধ জাগে। কোটী শক্তি বিদ্যুত-আলো জ্বালিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় এই অগণিত জন্তুর বিচিত্র দেহ আর বিভিন্ন আচরণ!

কিন্তু আজ এই অন্ধকারে কোন্‌ রাস্তায় জানোয়ার আসবে! পেছন দিক থেকেও ত আস্‌তে পারে! শব্দ লেশহীন টাইগার, লেপার্ড বা ভালুক! ওদিকটায় নজর দেওয়ার কোন উপায় নেই। মাথার পেছন দিকেও দুটো চোখ হয় না! আসেই যদি—হয়ত নিঃশব্দে আমাদের তাকিয়ে দেখবে—আমরা জঙ্গলের অপরিচিত জানোয়ার না আর কিছু! যদি সহসা তাদের অতি নিকটেই দেখতে পাই, হাত তুলে রাইফেলের নিশানা করা চলবে না—একটু নড়াচড়ায় নিমেষে বিপদ। গুলী চালানো ত দূরের কথা।

মনে পড়্ছে ভাগবত বাবুর অভিযান। 'ভুঁই আটা'য় বসেছিলেন—হরিণ শিকারে। একটু জায়গা ডালপালায় ঘিরে নিয়ে তৈরী হয় 'ভুঁই আটা'। এক পাশে কিসের খুর খুর শব্দ—ইঁদুর নাকি? একটা জানোয়ারের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—এমন উৎকট গন্ধ কিসের? আবার শব্দ—ঘেরার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকছে একটা প্রকাণ্ড থ্যাবড়া নাক—একটা বড় চোয়াল! ঐ নাক থেকেই বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের আওয়াজ—'বাপরে—বাঘ'! ডালপালায় লাঙ্গুলের চটাপট্ শব্দও শোনা যাচ্ছে। ভাগবত বাবুর চোখ নিমীলিত হয়েছে, দেহ নিষ্কম্প।

রুদ্ধশ্বাসে কতটা সময় পেরিয়ে গেল হুঁস নেই। এই থ্যাবড়া নাক আর চোয়ালটা এবারে ঘেরার বাইরে চলে গেছে, কিন্তু ভাগবত বাবুর স্তিমিত নয়নে এখনও ঘেরার ফাঁকে ফাঁকে ঐ বিচিত্র রংএর চোখ দুটো জ্বলছে! একটা চাপা গর্জ্জন—মেঘের ডাকের মত একটা গুরু গুরু আওয়াজ—তারপরে আবার সব নিস্তব্ধ। বাঘ দূরে সরে গেছে। এই ত বাঘের স্বভাব। মানুষ খেকো (Man-eater) বাঘ না হ'লে বিনা দ্বিধায় মানুষকে সহসা আক্রমণ করে না। কিন্তু একটু নড়াচড়া—এতটুকু সন্দেহ হয়েছে কি রক্ষা নেই! ভাগবত বাবুর সে-রাত্রে আর হরিণ শিকার হ'ল না। খড় কুটো জ্বালিয়ে মশালের আলোতে ফিরে গেলেন নিকটবর্ত্তী আশ্রয়ে।

শিবুয়া সন্তর্পণে আমার গায়ে হাত দিয়েছে—চম্‌কে উঠেছি—ও কিসের আওয়াজ? বাঘের ডাক নাকি?—না,—ওটা ভয়ার্ত্ত শম্বরের আওয়াজ—অদূরে বাঘ দেখে থাকবে! পাহাড়ের গায়ে শম্বরের ডাক দীর্ঘতর হ'য়ে মিলিয়ে গেছে—আবার সব নিস্তব্ধ। মাথার ভিতরে ভীড় করেছে কত এলোমেলো কথা—কত স্মৃতি। এই 'বিরোরী'দের কি অদ্ভুত জীবন! এরা বারোমাস অরণ্যবাসী।

ঝড়-বাদল, বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ নেই। দারুণ শীতে দেহে আচ্ছাদন নেই। ঝুপরির দরজা নেই—অর্গলের বালাই নেই। রাত্রের অন্ধকারে একটা লেপার্ড এদের ঝুপরিতে ঢুকে কাউকে যদি মুখে করে নিয়ে যায়! লোকালয়ে বাস এদের পোষায় না। রাত্রে এদের ঘুমুতেও দেখিনে। যতবার এসেছি—হাঁক দিতেই এরা উঠে এসেছে। দিবাভাগে এরা অরণ্যের আনাচে-কানাচে ঢুকে যায়—লতাগুল্মে জটিল অরণ্যের দুর্গম রহস্যে। ছোট শিশুদের পিঠে ঝুলিয়ে মেয়েরাও চলে যায়—পুরুষদের সঙ্গে। শিকার ধরা জাল ছড়িয়ে—জঙ্গল পিটিয়ে ছোট হরিণ আর খরগোস ধরে আনে—বন-মুরগী আর তিতির। এ কোলাহলে কখনো জেগে ওঠে বনের ঘুমন্ত বাঘ-সদম্ভে নিরীক্ষণ করে অনধিকারীর আনাগোনা। বিরোরীরা গাছে চড়ে—সুযোগ পেলে দৌড়ে পালায়—কখনও মিলিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ভয় দেখায় বনের শার্দ্দূলকে—হাতে বাগিয়ে ধরে তীর আর ধনু। এরা বন-মুরগী আর তিতির বিক্রী করে—দূরদূরান্তরের হাটে। বিক্রী করা পয়সায় গমের ছাতু আর কাঁচা লঙ্কা কিনে আনে—ক্ষুধার খাদ্য—কখনও বা মহুয়া চোঁয়ানো মদ। এদের রুক্ষ চুলে গোঁজা লোহার চিম্‌টে। দেহের কোথাও কাঁটা ফুটলে এগুলি কাজে লাগে। তরুণীদের গলায় রঙীন পলার মালা—কাণেও তাই। সকলের পরিধানেই বস্ত্র নামমাত্র। পুরুষদের হাতে ধনুর্ব্বাণ—কারও বা 'টাঙ্গী'। শীত গ্রীষ্মে এদের দেহ অনাবৃত! প্রকৃতির কোলে লালিত—আধেক মানুষ—আধেক জানোয়ার। কিন্তু এরা 'ইমানদার'। মিথ্যা এদের ত্রি-সীমানায় ঘিঁষিতে পারে না। ও জিনিষটা সহরের সভ্যতার বাহন। অরণ্যের মানুষের গায়ে গ্রীষ্মের উত্তাপ সহে—মিথ্যার উত্তাপ সয়না। অরণ্যে এদের ছাউনী অস্থায়ী—কোথাও সাতদিন, কোথাও দশদিন, কোথাও বা আর কিছু

বেশী। তারপর ছাউনী পড়ে থাকে পেছনে—এরা সে অরণ্য থেকে চলে যায় অরণ্যান্তরে—আট দশ ক্রোশ দূরে। যাওয়ার আগে দোকানের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যায় কড়ায় গণ্ডায়। এদের এই অরণ্য-যাত্রা সুরু হয় গভীর রাতের অন্ধকারে—পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে নূতন জঙ্গলে নূতন বাসা বাঁধে—নূতন ক'রে আবার ক'দিনের অস্থায়ী ঘরকন্না।

আলো জ্বাল্‌লে জানোয়ার দেখতে পাবে, ওভার কোটের আড়ালে সন্তর্পণে টর্চ জ্বেলে দেখলাম—হাত-ঘড়িটায় রাত দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়েছে। উঃ কি কন্‌কনে শীতের রাত! সহসা প্রবল বাতাস উঠেছে—প্রবল ঝড়ের হাওয়া। হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে—প্রকৃতির সর্ব্বদেহে জেগেছে শীতের কম্পন—অরণ্যের পত্র পল্লবে তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর একটা শব্দ—পাহাড়ের গুহাকন্দরে প্রবাহিত হাওয়ার শব্দ হবে। শীতে জর্জ্জর দেহে সম্মুখের পাহাড়, অরণ্য আর ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি—আজ নিশীথিনীর একি ভয়াল উতলা মূর্ত্তি! এর দুর্ণিরীক্ষ্য অন্ধকার—এর ঝোপ-ঝাড়ের গভীর রহস্য, এদের অন্তরালে প্রতীক্ষ্যমান জানোয়ার। প্রকৃতির সর্ব্বদেহে জেগেছে ভ্রূকুটী—হিংসায় ক্রূর! মনে ভাব্‌ছিলাম, এমনি করে এমনি পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে বসে যে কবি অরণ্যের বিভীষিকার মূর্ত্তি দেখেনি অরণ্যের সমগ্ররূপ তার দেখা হয়নি। এমনি নৈশ আঁধারে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের নৈশপুরীতে বিনিদ্র প্রতীক্ষায় এর তমসাচ্ছন্ন ভয়ালমূর্ত্তি যার চোখে পড়েনি অরণ্য দেখা তার সম্পূর্ণ হয় নি। এ রূপ—কল্পনায় ফোটেনা—দেহের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় উপলব্ধির বিষয়। ফাগুনের বনপথে কিশলয়ের উৎসব-সজ্জা যার চোখে পড়েছে, দুই কান ভ'রে শুনেছে নব মঞ্জরীর গান—আর অসংখ্য বিহগের অজস্র কাকলী, পথ হারিয়ে ফেলেছে

মহুয়া বনে;.সে দেখেছে ষোড়শী প্রকৃতির উৎসব সাজ—রং-এ রসে অপরূপ!

আমার চোখে আজ খুলে গেছে—অসংখ্য বিবরের রুদ্ধ অর্গল—অন্ধকারের রহস্য পারাবার। প্রকৃতির পুষ্পাভরণ ঝ'রে পড়েছে—দেখতে পাচ্ছি না—মহুয়ার সুরভিত হাসি—পলাশের রক্তরাগ। চোখে জেগেছে, চিতার কুটিল পদক্ষেপ—ভালুকের রক্তচোখ। আজ শীতের প্রবল বাত্যায় ভেসে এসেছে তাদেরই বিজৃম্ভিত মুখশ্বাস। আমার চোখের আড়ালে, পেছনে, আশেপাশে নিঃশব্দে গুড়ি মেরে আছে সহস্র বিভীষিকা—একটু শব্দ, একটু নড়াচড়া হলে কি যে কাণ্ড ঘটে যাবে, তার স্বরূপ আজও জানিনে।

রাত তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়েছে—আজ অরণ্যের অধিবাসী-দের ভিতরে চ'লেছে একটা ষড়যন্ত্র! লুক্কায়িত শিকারীর অভিসন্ধি সে জেনে নিয়েছে। যে দু-চারটা জানোয়ার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, কি সন্দেহে মুহূর্ত্তে তারা জঙ্গলে আত্ম-গোপন করেছে। অন্ধকারে তাদের চেনা যায়নি, হয়ত আড়ালে লুকিয়ে তাদেরই দুই একটা আমাদের হাব-ভাব নিরীক্ষণ করছে—পেছনে তাকালেই সন্দিগ্ধ চোখ দুটো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হবে। মনে পড়ছে, পুঁথিতে পড়া সেই ইংরেজ শিকারীর অভিজ্ঞতা। চোখে পড়ছে—জঙ্গলের আড়ালে দুই শিকারী—একজন ইংরেজ, একজন নেটিভ। সম্মুখে মুক্ত আকাশের নীচে বালু-শয্যায় রক্ষিত 'কিল'—বাঘে মারা একটা মৃত মোষের দেহ। এরা জঙ্গলের প্রত্যেক অলিগলি নিরীক্ষণ করে দেখেছে। এমনি করে না দেখলে কখন ঝোপের আড়ালে নিঃশব্দে বাঘের মাথা বেরোবে। বোঝা যাবে না—যে সে বাঘের মুণ্ড, না পাহাড়, না বনের শুষ্ক ডালপালা! দূরে বাঘের গর্জ্জন শোনা গেছে বাঘ তীক্ষ্ণ নজরে আততায়ীর সন্ধান শেষ করে অরণ্যের অন্য

জানোয়ারকে তার ক্ষমাহীন শাসন জানিয়ে দিচ্ছে। এবারে 'কিলের' কাছে বাঘ বেরিয়ে আসবে। হঠাৎ নেটিভ শিকারীর হস্ত স্পর্শে সাহেবের নজর পড়েছে, পিছনের দিকে—সে দৃষ্টি আটকে গেল সে দিকেই। বৃহৎ লাঙ্গুল ত্থলিয়ে পেছনে দাঁড়িয়েছে —সেই চিত্রিত দেহ অরণ্যরাজ! চোখে জ্বলছে সংশয় আর শাসনের আগুন! শিকারীদ্বয় নিশ্চল—এতটুকু অবিবেচনা, রাইফেল হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টার সাজা তাঁরা জানে। সে সাজা মুহূর্ত্তে আপতিত বাঘের দংষ্ট্রা! কয়েকটা মিনিট—মনে হ'ল দীর্ঘ সময়। হঠাৎ বাঘ অদৃশ্য হ'ল জঙ্গলের আড়ালে। বাঘের খট্‌কা দূরীভূত হয়নি—এ জঙ্গলে বাঘের প্রতীক্ষা আর হ'ল না। স্বেদাক্ত দেহে পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কখন অজ্ঞাতে একটু খানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। অদূরে মানুষের কণ্ঠস্বরে চোখ খুলে গেছে। চেয়ে দেখি আঁধারের যবনিকা সরে গেছে, আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে "ছোটা ভাই" আর সঙ্গীদ্বয়। রাত্রের মায়াপুরী মিলিয়ে গেছে ভোরের আলোয়।

রাত্রে শিকার হয়নি—তাতে আমার ক্ষোভ নেই। অনিদ্রার গ্লানি মুছে ফেলেছি নূতন আশায়। সম্মুখে নীল আকাশ ছুঁয়ে শুয়ে আছে একতারা ও মহাদেও স্থানের সু-উচ্চ শৈলশ্রেণী। পাহাড়ের গৈরিক মিশেছে অরণ্যের শ্যামলিমায়।

বহুদিন এই পাহাড়-চূড়ায় তাকিয়ে ভেবেছি হিংস্র শ্বাপদের বাসভূমি এই পাহাড়ে চড়ে সন্ধান করব তাদের আশ্রয়-গুহা, প্রত্যক্ষ করব তাদের জীবনযাত্রা। যে ভাবনা এতদিন কল্পনায় পর্য্যবসিত আজ তাই হল সংকল্প।

ডাক বাংলোয় ফিরে এসে হুকুম দিলাম—খানা চাই—একঘণ্টার মধ্যে। বিরোরীদের খবর দেওয়া হয়েছে এই পাহাড়-চূড়ায় শিকার হবে জঙ্গল তাড়িয়ে। মোদিয়া জানালো এই পাহাড়ে

কখনো জঙ্গল পেটানো হয়নি। পাহাড় দুরারোহ। ভোরে পাহাড় চড়া সুরু হলে বেলা দুটোর আগে পৌঁছুতে পারব না। শিকার শেষে ফিরে আসতে রাত হ'য়ে যাবে—জঙ্গল-পথ খুঁজে বাংলোয় ফিরে আসা অসম্ভব। না-না অসম্ভব নয়—আমি জবাব দিলাম। বিনিদ্র রাতের ব্যর্থতা আমাকে তাড়না করছে—নূতন সংকল্পে। হয়ত পথশ্রম পণ্ড হবে—শিকার হবে না—কিন্তু তাতে যায় আসেনা। আবিষ্কারের আনন্দ, প্রয়াসের আনন্দ আমার লক্ষ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। চল চল দ্রুত এগিয়ে চল। মহুয়ার প্রান্তর পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম ক'রে। এর পরে আরম্ভ হবে গভীর অরণ্য। অরণ্যশীর্ষে দেখা যাচ্ছে মহাদেও স্থানের জীর্ণ মন্দির। নীচে বাংলো সংলগ্ন অলিন্দ। অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়েছে বিস্ময়ে। কোন্ সাধক প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল এই মন্দির ? কালের মহাপ্রান্তরে তার নাম হারিয়ে গেছে শুধু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সাধনার সাক্ষী—অরণ্য মধ্যবর্ত্তী এই প্রাচীন মন্দির আর শিবলিঙ্গ। শুন্‌তে পাই আজও শিব-চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাতে নির্দ্দিষ্ট পূজারী এসে এই মন্দিরে আলো জ্বালিয়ে দেয়—অতীতের সে নিষ্কম্প প্রাণ-প্রদীপের প্রতিভূ !

মন্দিরের চত্বর অতিক্রম ক'রে অরণ্যে প্রবেশ করেছি। সম্মুখে শুয়ে আছে প্রস্তর শয্যায় অগভীর পার্ব্বত্য নদী। উচ্চ পাহাড় থেকে নেমে অরণ্য আড়ালে একে বেঁকে ছুটে চলেছে জনপদের উদ্দেশ্যে। লোকালয়ে দিতে হবে পিপাসার বারি—ফসলের ক্ষেতে রসধারা। ভাবছি একি শুধুই প্রবাহ—এর পেছনে কি কোনই নির্দ্দেশ নাই, কোন সংকেত ? সম্মুখের অরণ্য রাশি বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংহত ক'রেছে। সামনে দাঁড়িয়েছে নবী আক্তার। একটুখানি অভিমান লুকিয়ে ছিল মনের কোণে। ইচ্ছা ছিল শিকার শেষে আমাদের সাফল্য প্রমাণ করবে তার নেতৃত্ব ছাড়াও শিকার সম্ভব।

তবু তাকে আজ এই দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে সহযাত্রীরূপে লাভ

ক'রে আমি খুসী হ'য়েছি তাতে সন্দেহ নেই। অরণ্য পথে কোথাও ভালুকের গর্ত্ত। জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম। অরণ্য কোথাও নিবিড় ছায়াময়, কোথাও সমতল হরিৎ ভূখণ্ড আবার চড়াই পথে শিথিল পাথরের রাশি! সূর্য্য তখন মধ্যগগনে। যেদিকে তাকাই রৌদ্র সমুজ্জ্বল সবুজ অরণ্যরাজি। চতুর্দ্দিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত শৈলমালা।

এদিকে তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক-প্রায়। হঠাৎ বিজয় বাবু বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। "আর এক পা-ও যাবনা।" এই হ'ল তার ঘোষণা। তোমাদের এ ঊর্দ্ধগতির ত' আর শেষ নেই, পা ছুটো না চললেও কি যেতেই হবে, আমি বল্‌লাম না গিয়ে উপায় কি? এই জঙ্গলে তোমাকে একা রেখে ত' আর যেতে পারিনে। খানিকটা রাস্তা বাকী। উপরে না গেলে এতটা রাস্তা আবার ফিরে যেতে হবে সেটাই কি এত সহজ? অগত্যা বিজয় বাবু বিরক্তি ভরে উঠে প'ড়লেন।

যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছেছি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। উল্টোদিক থেকে বীট আরম্ভ হ'য়েছে, বিরোরীদের কোলাহল শুন্‌তে পাচ্ছি। আমি কিন্তু পাহাড় চূড়ায় একখানা বড় পাথর বেছে নিয়ে শুয়ে পড়েছি। শ্রান্তির আর অবধি ছিল না গতরাত কাটিয়েছি বিনিদ্র। চোখ ছুটো জোর করেও আর খুলে রাখা যাচ্ছে না। হঠাৎ মোদিয়ার আকর্ষণে ঘুম ভেঙ্গেছে। আমাদের সামনে আর একটা উঁচু পাহাড় আর এই ছুই পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদ। সম্মুখের পাহাড়ের গায়ে বাঘ নয়, একপাল শম্বর। দৃশ্য চমৎকার। রাইফেল ছেড়ে ক্যামেরাটা হাতে নিয়েছি। কি আশ্চর্য্য ক্যামরায় আর একটা ফিলম্‌ও অবশিষ্ট নাই। রাস্তায় ওগুলো শেষ ক'রে ফেলেছি। অগত্যা রাইফেল হাতে নিলাম। শম্বর আমাদের এখান থেকে অন্যূন ছুইশত গজ দূরে। একটা শম্বর বেছে নিয়ে পাহাড়

ফায়ার ক'রেছি। মোদিয়া বল্‌লে মিস্ হ'য়েছে। দূরে উপবিষ্ট নবী আক্তার বিরক্তিভরে বলে উঠেছেন—"মিস্। সাহেব নে শিকার গড়বড়া দিয়া।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার লক্ষ্য ভুল হয়নি। আর কোন জানোয়ার দেখা গেল না। বিরোরীরা বীট করে যখন এগিয়ে এল তখন চেঁচিয়ে আমাদের জানিয়ে দিলে "শম্বর মিল গিয়া।" গুলীবিদ্ধ মৃত শম্বর উঁচু পাহাড় থেকে একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে ছিল। কোলাহল করে ছুটে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসা হ'ল।

তখন আর নূতন বীটের সময় নেই। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব হবে। তাছাড়া বাংলোয় ফিরে যেতে হবে নূতন রাস্তায় অজানা পথে।

বিষণপুর পাহাড়

সে আর একটা রাত। অমা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত বনভূমি আচ্ছন্ন। নিঃশব্দে আমাদের মটর ছুটেছে বন পথে। জমি কোথাও সমতল, কোথাও বা বন্ধুর উপত্যকাভূমি, গাড়ী চলেছে হোঁচট খেয়ে। কোথাও আবার সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গাড়ী একদিকে কাত হয়ে প্রথম গিয়ারে চলেছে। আমাদের ভয় হ'চ্ছে গাড়ী বুঝি উল্টে যায়। ডানদিকে বিষণপুরের পাহাড়। এই পাহাড়শ্রেণী কালী-পাহাড়ী ও মহাদেওস্থানের পাহাড়ে মিলেছে। নবী আক্তার আলো সঞ্চালিত করে রাস্তা দেখাচ্ছে। হঠাৎ অদূরে কয়েকটা বন্যবরাহ নজরে এল। এই জানোয়ারগুলো নালা গহ্বর উল্লম্ফনে পার হ'য়ে যখন ছুট্‌তে থাকে বন্ধুর পথে তাদের দ্রুত ধাবনের শক্তি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। নবী আক্তার গাড়ী থামিয়ে বল্‌লে "ফায়ার"। আদেশ অনুসারে আমরা ফায়ার করতেই দুই বন্ধুর গুলীতে দু'টো শূয়োর প'ড়ে গেল। শূয়োর তখনই কুড়িয়ে নেওয়ার আবশ্যক নেই, তাই গাড়ী আবার অগ্রসর হ'ল পূর্ব্ব সীমান্ত পার হয়ে দক্ষিণ দিকে।

ঠিক মোড়ের কাছে ঝোপের আড়ালে একটা জানোয়ার দেখা যাচ্ছে। জানোয়ারটার লক্ষ্য অন্য দিকে। মনে হ'ল পলায়মান বাকী শূয়োরের দিকেই তার তীক্ষ্ণ নজর। শূয়োর সেদিকে এগিয়ে এলেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বে বরাহের ঘাড়ে। সে যে বাঘ তাতে তখন আর সন্দেহ ছিল না। যদি শূয়োর বাঘের অবস্থানের দিকে ছুটে না আসে এই বাঘ তার পিছু নেবে—যেমন ক'রে বাঘ সন্তর্পণে অনুসরণ করে শিকারের। আক্তার সাহেব স্পট্‌ লাইট

নিভিয়ে দিয়েছেন। এই আলো নিভিয়ে দেওয়ার কারণ আমাদের গাড়ীকে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে হবে যাতে রাইফেলের নিশানা নিতে কোন অসুবিধা না হয়, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী না রাখা পর্য্যন্ত স্পটলাইটের আলো দেখে বাঘের কোন সন্দেহ না হয়। যে মুহূর্ত্তে আবার স্পটলাইটের আলো জ্বলে উঠবে সেই মুহূর্ত্তে ফায়ার করতে হবে। আক্তার সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। বনপথে চলার সময়ে মটরের ব্যাটারী ডিশ্চার্জ না হয়ে যায় এ জন্যে একটা হেডলাইটের বাল্‌ব খুলে নেওয়া হয়।

হঠাৎ নবী আক্তারের হুকুম হ'ল, ষ্টপ্। অভিজ্ঞ সোফার গাড়ী থামিয়েছে আর সেই মুহূর্ত্তে আমি রাইফেল তুলেছি। আলো জ্বলে উঠতেই বাঘ দেখা গেল। আবার নবী আক্তারের হুকুম হ'ল "ফায়ার।"

আমার ৪২৩ 'মজার' রাইফেল থেকে একহাত অগ্নিশিখা বেরিয়ে এল। পাহাড়ে আওয়াজ হ'ল, গুম্-ম্-ম্। আবার ফায়ার করেছি। নবী আক্তারের 'ফায়ার এগেন' অনুসরণ করেই পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে গুম্ গুম্।

তারপরে সমস্ত নীরব। বাঘ দেখা যাচ্ছেনা—দেখার কোন উপায়ও ছিল না। অন্যূন দু'শ ফুট উঁচু পাহাড়ের এক প্রান্তে জঙ্গলের আড়ালে বাঘ। দু'পাশে দু'টো বিচ্ছিন্ন বড় বড় পাথর। পাহাড় ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান গভীর পার্ব্বত্য নালা বা 'রেভাইন'। রেভাইনের তলদেশ কণ্টকাকীর্ণ, গুল্ম-লতায় দুর্গম। এই নালা পেরিয়ে পাহাড়ে চড়ে যাওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। এই রাত্রিবেলা সেখানে অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজনও ছিল না। আমাদের শিকারের পথ-প্রদর্শক মোদিয়া এবং পুনোয়া এই বাঘের সন্ধানে অভিজ্ঞ। কখনও আক্তার সাহেব তাদের নেতা।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঘ পাওয়া না গেলে রক্তের দাগ অনুসরণ করে বাঘের দেহের অনুসন্ধান চলে। এই বাঘ দু'দিন পরে পাওয়া গিয়েছিল নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে সামান্য দূরে।

গাড়ী আবার চলেছে একতারা বাংলোর দিকে। দুপাশের জঙ্গল ঠেলে গাড়ী এসেছে একতারার মহুয়া-প্রান্তরে। সম্মুখেই একটা খাদ। একটা হরিণ ছুটেছে এই খাদ লক্ষ্য করে। অভ্যাসবশে রাইফেল তুলেছি। কিন্তু ততক্ষণে বন্ধুর হাতের রাইফেল তাকে ভূপাতিত করেছে।

সকাল বেলায় আমাদের বাঘ সন্ধান—কিন্তু ভোরের দিকে চৌধুরী সাহেবের খেয়াল হ'ল "শিঙ্গার" যেতে হবে। বাঘ সন্ধানের ভার দেওয়া হল মোদিয়াকে। চৌধুরী সাহেবের শিকারের উৎসাহ এই ফায়ার করা পর্য্যন্ত। সন্ধানের যে থ্রিল, আশা ও নৈরাশ্যের যে বিপুল আনন্দ—চৌধুরী সাহেবের তাতে কোন প্রলোভন নেই। বোধ হয় সময়ের অভাব—রোগীদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ তাকে তাড়না করে সহরের দিকে। আমার কিন্তু প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহের শ্রান্তি নেই। কিন্তু চৌধুরীর ব্যবস্থায় আত্মসমর্পণে আমি অভ্যস্ত, তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও যুক্তিহীন বাক্যের শরজালে জর্জ্জরিত হওয়ার চেয়ে ওকে এড়িয়ে চলাই আমার স্বভাব। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে শিঙ্গারে শিকারের প্রস্তাব মেনে নিতে হ'ল।

শিঙ্গারে পাহাড়-পাদমূলে একটা বড় যজ্ঞডুমুরের গাছে মাচা করে প্রতীক্ষা কচ্ছি। নীচে বাঁধা রয়েছে একটা ছাগলছানা। মাথার উপরে অরণ্যাচ্ছন্ন পাহাড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। যে পার্ব্বত্য নালার কাছে আমাদের মাচা, বাঘের যাতায়াতের রাস্তা সেই। বহু বাঘ এবং প্যান্থার এখানে শিকারীর গুলীতে মারা পড়েছে। এরই নিকটে গর্ত্তের ফাঁদ তৈরী করে বাঘ বন্দী করা

হয়েছিল। সুতরাং আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ ছিল না। পাহাড় বেষ্টিত এই অরণ্যাংশের বিরাট গাম্ভীর্য্যে আমরা আবিষ্ট হ'য়ে আছি। মাচায় সাবিত্রী, আমি ও চৌধুরী সকলেই সম্পূর্ণ নীরব। মৌনব্রত বাঘ শিকারে অলঙ্ঘ্য। অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পূর্ব্বে দু'একটা শূকরকে বিচরণ করতে দেখেছি—কিন্তু তারপরে অন্ধকারে আর কিছুই নজরে আসে না। ছাগল সম্মুখে দেখে শূয়োরও পালিয়ে গেল। পাহাড়ের দেহে অরণ্য থেকে মাঝে মাঝে ময়ূরের ডাক অরণ্যের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়ে তুলছে। আশ্চর্য্য এই ছাগলের বাচ্চাটী চীৎকার করে না। ছাগলের ডাক না শুনলে বাঘ বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও বিশেষ নেই। বাঘের ঘ্রাণশক্তি প্রবল নয়। অনেকে মনে করেন বাঘ জানোয়ার বা মানুষের গন্ধ পেয়ে তাদের পিছু নেয়। এ ধারণা ভ্রান্ত। বাঘের ঘ্রাণশক্তি প্রখর হলে কিলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে শিকারীর গর্ত্তের ভিতরে প্রতীক্ষা করা কিম্বা মাচায় বসে বাঘ শিকার সম্ভব হত না।

আমাদের প্রতীক্ষা ক্রমেই একঘেয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, তবু ক্ষীণ আশা অবলম্বন করে আমরা নীরব-নিথর। আমি নিজে নৈশ রজনীর এই আবেষ্টন ও অরণ্যের সম্ভাবনার কল্পনায় ডুবে আছি। হঠাৎ একটা উচ্চ শব্দের রূঢ় আঘাতে চমকে উঠেছি—মুহূর্ত্তমাত্র। চৌধুরী সাহেবের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে এই ছাগল ছানার বিরক্তিকর নীরবতায়। তিনি হঠাৎ ছাগলকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করেছেন—"চোর"। নিমেষেই খেয়ালী এবং অতি রসিক সঙ্গীর চুরির তাৎপর্য্য এবং আমাদের প্রতীক্ষার নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে মাচা থেকে নেমে এলাম।

শিকার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, জঙ্গল শিকারে কোন জানোয়ারই জখম অবস্থায় ফেলে আসা অন্যায় ও

অসঙ্গত। একতারাতে আমাদের এই নিয়ম প্রতিপালন করা সর্ব্বদা প্রয়োজন ছিল না। এর বিশেষ কারণ সময়ের অনবসর প্রযুক্ত আমাদের শিকারের প্রোগ্রাম এক দিন বা দুই দিনের বেশী কখনই করা যেত না। কমলপুরের নবী আক্তার ছিলেন আমাদের শিকারের লীডার। আমরা শিকারে গেলে তিনি নিজে শিকার করেন না। তাঁর কর্ত্তব্য ছিল আমাদের প্রোগ্রাম তাঁকে পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিলে দু'একদিন শিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং শিকার পরিচালনা। বনের শিকারী পুনোয়া, মোদিয়া, ফাগুয়া ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাধীন এবং নিত্যসহচর। আমাদের শিকারের অসম্পন্ন অংশ আমাদের চেয়ে যোগ্যতর নবী আক্তার উল্লিখিত অনুচরগণের সাহায্যে সম্পন্ন করতেন। এতে আমাদের প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব এবং নিজের শিকারের সুযোগ লাভ ও শিকারবৃত্তি চরিতার্থ হ'ত। যে বাঘ পূর্ব্ব রাতে গুলীবিদ্ধ হয়েছিল আক্তার সাহেব পরে সেই বাঘের কঙ্কালসার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন।

নবী আক্তারের মুখে শ্রুত এক আহত বাঘের সন্ধান আমার মনে পড়ে। নবাব সাহেব রাত্রে বাঘের উপরে গুলী ছুঁড়েছিলেন কিন্তু গুলীর পরে বাঘ কোথায় লুকিয়ে গেল তার সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিন আক্তার সাহেব এবং জঙ্গলের প্রত্যেক অলি-গলি যার নখদর্পণে সেই পুনোয়াকে সঙ্গে নিয়ে একটা স্রোত-ধারার নিকটে জ্যান্ত অবস্থায় বাঘকে দেখতে পান দ্বিতীয় দিনে। মোদিয়ার নেতৃত্বে বহুসংখ্যক "বিরোরী"দের গাছে চড়িয়ে বাঘের গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। যখন বাঘ দেখা গেল, তখন আক্তার সাহেব ও পুনোয়া ছিলেন একটা টিলার উপরে। টিলার ঠিক নীচেই বাঘ! বন্য জানোয়ার শিকারে, শিকারীদের সর্ব্বদা জানোয়ারের চেয়ে উঁচুতে স্থান গ্রহণ করা প্রশস্ত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। জানোয়ার চার্জ্জ ক'রলে

আরোহণে তার যে সময় লাগে একজন সাহসী শিকারী সেই অবকাশে গুলী চালাতে পারেন। সাহসী শিকারী উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে শিকারে সাহসিকতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, বিশেষতঃ বাঘ শিকারে। বাঘের বিপুল আকার, এর বিরাট মুণ্ড, গুম্ফ, শ্মশ্রু, এর চোখের সন্ত্রাসবর্ষী দৃষ্টি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এর রেখাঙ্কিত উজ্জ্বল বিচিত্র দেহও ত্রাসোৎপাদক। দেহের কোন রেখা সাদা, কোন রেখা কালো, পিঙ্গল কোথাও পাটকিলে। বাঘ বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

আগেই বলা হয়েছে আক্তার সাহেব অনুচরসহ ছিলেন টিলার উপরে—তার নীচেই বাঘ! গুম্ গুম্ করে আক্তার সাহেবের ডবল ব্যারেল 'হলাণ্ড এণ্ড হলাণ্ড' দুবার গর্জ্জন ক'রলে, কিন্তু দুটোই মিস্ হ'ল। বাঘ নিশ্চল।

আক্তার সাহেব নীচে অবতরণ করলেন বাঘ থেকে অনেকটা দূরে। তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আবার ফায়ার হ'ল। এবারে বাঘ মরে গেছে। কিন্তু বাঘের চেহারায় মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বাঘ ছিল, ঝোপের আড়ালে পেছনের দিকটা দেখে মনে হ'ল মাটিতে উপবেশনের ভঙ্গীতে বসে আছে। এই বাঘ যখন বার করা হ'ল, তখন দেখা গেল রাত্রে নবাব সাহেবের গুলীতে তার চোয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং পায়ের একটা থাবা সম্পূর্ণ চূর্ণ। তাই ভগ্ন চোয়াল বাঘের দাঁত ব্যবহারের কোন শক্তি ছিল না।

একতারা—পথের মায়া

আবার 'একতারা'! মনটা খুসীতে ভরে গেছে। সেই পরিচিত বাংলো, সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত অঙ্গন। তখন দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে। বাংলোর পশ্চিম-প্রান্তরে অন্ধকার নেমেছে, আম ও মহুয়া গাছের পার্থক্য লুপ্ত। আঙ্গিনায় আরাম কেদারায় শুয়ে দক্ষিণের পাহাড় দেখছি। অন্ধকারে পাহাড়-শিখরের শুভ্র স্রোতধারা দৃষ্টিগোচর হয়না; কাণ পেতে প্রপাতের মৃদু শব্দ শোনা যায়।

এ বাংলোটী পাটনা থেকে ৯০ মাইল দূরে। যেদিকে চোখ যায় অরণ্য আর পাহাড়। সবুজ আর নীলের স্নিগ্ধ সমাবেশ। কলহ নেই, কোলাহলও নয়। তাই অন্তরের অন্তরতম দেশে আসে এর মৌন আবেদন। যাত্রার প্রারম্ভ থেকেই অপূর্ব্ব পুলকে প্রাণ পূর্ণ হয়ে ওঠে। পথযাত্রায় রাস্তার নিতান্ত সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যগুলিও মাধুর্য্যে ভরা।

পাটনা সিটির দুই পাশের বিপণি শ্রেণী; লোকজন গাড়ী-ঘোড়ার ব্যস্ত আনাগোনা, জন কোলাহল পেছনে পড়ে থাকে। দুই পাশে প্রাচীর-ঘেরা আম বাগান, জীর্ণ প্রাসাদ, ভাঙ্গা দেওয়াল—তাও সরে যায়। এবারে চোখে পড়ে অড়হর আর ভূট্টার ক্ষেত। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, বালুচর—তারি পাশে বাদামী রঙ্গের চখাচখী। দূর থেকে তাদের ডাক ভেসে আসে হাওয়ায়—আভাস দেয় সুদূরের। মটরের বেগে নিমেষে 'ফতোয়া' পেরিয়ে যাই। কিছু দূরে বক্তিয়ারপুর, এখানে একটা রেলওয়ে জংসন, পূর্ব্ব-পশ্চিম মুখো মেন লাইন। দক্ষিণে চলেছে বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে। শেষ সীমানায় পাহাড়ের কোলে রাজগীর। এই

বক্তিয়ারপুর কতবার দেখেছি। কূয়োর পাশে, জীর্ণ বস্ত্রে মেয়েরা জল তুলছে। ছেলেরা খেলছে। চা'র দোকানে 'দেহাতী' যুবক লোহার চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে, আর চা কিনে খেয়ে সহরের সভ্যতা শিখছে। মেয়েরা বিক্রী করছে ক্ষেতের বেগুন, মূলো, নেনুয়া, কাঁচালঙ্কা। কাঠের বারকোষে পিরামিডের আকারে সাজানো বুটের ছাতু, তা'তে ফুঁড়ে রেখেছে, সবুজ, লাল কাঁচালঙ্কা। দেহাতীদের দু'পয়সার ছাতু হলেই একবেলা কেটে যায়, নুন আর লঙ্কার দাম নেই। জল ঢেলে ড্যালা করে নুনে ঝালে খেতে বেশ। কুলী আর কৃষক এসব কিনে নিয়ে যাচ্ছে, কুয়োর ধারে। বাঁয়ে হাসপাতাল, মোড় ঘুরেই রেলওয়ে লাইন। মেন লাইনটীর পশ্চিম দিকে পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, পূব দিকে কলকাতা। গোটা হিন্দুস্থানই এই রেললাইনে গাঁথা পড়েছে। রেল লাইনে পা দিয়ে মনে হয় এলাহাবাদ ছুঁয়ে আছি।

কত লোহার পুল পেরিয়ে মোটর ছুটে যায় দক্ষিণে। রাস্তার ধারে শিশুগাছের শ্রেণী। দুইদিকে উদার অবারিত মাঠ। মাঝে মাঝে কৃষক-পল্লী, ফসলের ক্ষেত, সবুজ ক্ষেতের পাশে সাদা বকের সারি, গোরু চরছে, রাখাল বালক বাঁশী বাজায় গাছের ছায়ায়। ফসলের ক্ষেত রোদে জ্বলছে, হাওয়ায় দুলছে। দূর আকাশের কোণে দেখা যায় বিহার সরিফের উষর পাহাড়। "ওয়েনা"—লাইট রেলওয়ের ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখানে ভাল খোয়াক্ষীর বিক্রী হয়। অভ্যাসবশে কিছু কিনে নেই। দাম চায় এক টাকা সের, ধমক দিলে আট আনায় নামে। আজ সাধারণ জিনিষগুলিও খুসীর খোরাক।

বিহারশরিফ—খেলনার মত রেলগাড়ী, গৃহস্থের আঙ্গিনা দিয়ে, জানালা ছুঁয়ে ছুটে চলেছে। ভাজাভুজোর দোকান, মটরবাস ট্যাক্সির সারি, বাঁয়ে জনাকীর্ণ গলিঘুঁজিতে ভরা প্রাচীন সহর।

পুরাণো ইঁট, মাটীর ঢিবি খুঁজলে প্রাচীন কীর্ত্তির গন্ধ পাওয়া যায়। চৈত্য বিহার, বৌদ্ধ শ্রমণ, প্রবাসী বিদ্যার্থী—মাটী খুঁড়ে কাণ পেতে শুনতে পাবে মন্দিরের ঘণ্টা, সমবেত সুরে অতীত কালের সেই 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।' এ চৈত্যের পালক বৌদ্ধ রাজা।

গিরিয়াকের নদী খরস্রোতা, স্বচ্ছতোয়া। এঁকে-বেঁকে ছুটেছে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, ফসলের ক্ষেত ছুঁয়ে। দীর্ঘ লোহার পুল। ছাউনী তক্তার। মটর ছুটে যায় খট্ খট্ শব্দ তুলে। কুমুদ-কহ্লারে ভরা সরোবরের মাঝখানে জৈন মন্দির, সৌধশ্রেণী। ধরমশালা বাঁয়ে পড়ে থাকে; ডাইনে জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের মন্দির। পাহাড় নেবেছে ফসলের ক্ষেতে; কৃষক রমণীরা ঘরকন্না করছে, চারিদিকে সবুজ ক্ষেত। পাহাড়, মাঠ, কৃষকপল্লী আর মন্দির এরা মিতালি করে বাস করছে হাজার হাজার বছর। ঐ রাজগীরে কত রাজা এল, জরাসন্ধ থেকে বিন্দুসার; তারা কালের গর্ভে ডুব মেরেছে কিন্তু সেই শৈলশ্রেণী আজও দাঁড়িয়ে আছে, অচল অটল। উদয় গিরি, অস্তগিরি, রক্তগিরি আরও বিচিত্র বর্ণের কত পাহাড়! গ্রীষ্মে এরা আগুন ছড়িয়ে দেয়, বর্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে। শিখর থেকে ঢল নামে—নালা ডোবা ভরে যায় গৈরিক জলে। শরতে হেমন্তে শীতে রোদের কিরণ শস্যক্ষেতে সোণা ছড়িয়ে দেয়।

নওয়াদা ছোট মহকুমা সহর। বাংলোর চৌকিদারকে দেখা যায়। 'ক্যা চৌকিদার আচ্ছা হ্যায়?'—হাঁ হুজুর, সেলাম, ডাক্তার হবিবের দাওয়াইখানার সামনে, পুলের নীচে গাড়ীর গতি থেমে যায়।—'ডাক্‌টার সাহেব, আদাব। চলিয়ে শিকার খেলিয়ে না।—আইয়ে ম্যানেজার সাহেব! চা পিলিজিয়ে। ওঃ ইনশলে বহুত ডবল শম্বর উতর আয়া।' প্রশান্ত ডাঃ হবিবের দীর্ঘ বাদশাহী দেহ। সেলাম সহবতে বাদশাহী ঢং চোখে পড়ে।

পুলের পরে ডাইনে গয়ার রাস্তা, বামে রাঁচীর। শেষোক্ত রাস্তা ধরে এগোই। আবার রাস্তার দু' পাশে ছোট ছোট ঝাঁকড়া বট অশ্বত্থ আর শিশুগাছ। আকবরপুরের শুষ্ক বালুর নদীটা সোঁ সোঁ শব্দ করে, মটরটা কায়ক্লেশে অতিক্রম করে যায়। আবার শস্যক্ষেতে পাহাড় নেমেছে, ছোট বড় বিভিন্ন আকারের কত পাহাড়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবুকের বিস্ময়। গাছের আড়াল থেকে তাড়ির গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। কোথাও মহুয়া থেকে তাড়ি প্রস্তুত হচ্ছে। পাহাড়ীদের খাদ্য আর পানীয় দুই-ই।

অরণ্যের গন্ধ নাকে আসছে। হাওয়ায় অরণ্যের স্বাদ। ঘরকন্না ফেলে এসেছি পেছনে নদীর ওপারে। এখানকার আবহাওয়া আলাদা। এখানে রান্নার গন্ধ নেই, এ মকাই আর মহুয়ার মুলুক। এদের নৈশ অতিথি বনের হরিণ, পাহাড়ের ভালুক। মটর, সহরের সাহেব এদের কাছে বিস্ময়। এখানকার আকাশ অরণ্যের সান্নিধ্যে পুলকিত। পাহাড় প্রান্তের মহুয়াকুঞ্জ অরণ্যের নেশায় মস্‌গুল।

সহর থেকে আমরা এই অরণ্যের আহ্বান পেয়ে এসে জুটেছি। আকাশে বাতাসে, পাহাড়ে অরণ্যে উৎসবের বাঁশী বাজে নিত্য নিরন্তর।

বাংলোর চৌকিদার তার গৃহ কোটরে আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যার সাথে সাথেই যে বাঘ ভালুক বেরিয়ে পড়ে! ছাগল ছানাটাও ঘরের ভিতরে। চৌকিদার চিতাবাঘকে গাল পাড়ে। ঐ বজ্জাত, শয়তানের যত লোভ ঐ ছাগল ছানাটার উপরে। রাত্রে চিতাবাঘ বাংলোর আঙ্গিনায় রসুই ঘরের পেছনে হেঁকে বেড়ায় ওই ছানাটার লোভে।

পাহাড়ী ঝরণাটা বাংলোর পেছনে কল্ কল্ শব্দ করে ছুটেছে। উঁচু পাড়ের উপরে একটা মহুয়া গাছ। রাত্রে ওখানে ঘুর ঘুর করে

ঘুরে বেড়ায় ভালুক। আঙিনা থেকে রাতের প্রথম প্রহরে শোনা যায় হরিণের ডাক। গভীর রাতে শম্বরের গম্ভীর আওয়াজ, কখনও বা বাঘের গর্জ্জন। ভোরের দিকটায় পাখীর কূজনের সাথে শোনা যায় "কেঁও" "কেঁও" ময়ূরের ডাক। ঘুম ভেঙ্গে যায় বন মোরগের আহ্বানে।

চোখ মুছে বাইরে বেরিয়ে আসি—বনলক্ষ্মীর একি অপূর্ব্ব রূপ। সামনে ক্ষীণতোয়া ঝরণা; জলের ধারা ছুটে চলে, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। ওপারের বন্ধুর ভূখণ্ডে হ্রস্বদেহ বনপলাশ, বৈঁচি আর বন করঞ্জার ঝোপ, আর কচি পাতায় রোদের স্নিগ্ধ ধারা।

বারান্দায় অরণ্য-মুখো হ'য়ে বসে আমাদের প্রভাতের 'চা'-এর আসর। গল্প গুজব সবই শিকার ঘেঁষে। সহর ভুলে যাই, মনে হয় অনন্তকাল ধরে আমরা এই অরণ্যেরই অধিবাসী। জঙ্গল পরিক্রম আমাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়। শিকারের সাথী 'মোদিয়া' আসে, আসে পুনোয়া, ফাগুয়া। পকেটে রবারের নল পুরে আসে বহেরা নবী আক্তার আর তার তোঁত্‌লা ছোট ভাইটাও। ভোঁ ভোঁ করে ভা-ভা-ভালুকের খবর বলে। লখিয়ার গরুটা বা-বা-বাঘে মেরেছে। বল কি? কোথায়? 'মুরদা আভিতক পড়া হ্যায় না দেহাতী লোগ উস্‌কো হঠা লিয়া?' শিকারের আবহাওয়া ঘন হয়ে আসে। তেওয়ারী রাইফেল সাফ করছে, সতৃষ্ণভাবে ওদিকে তাকাই। 'কাঃ-কাঃ-কালী পাহাড়ী চলিয়ে' তোঁত্‌লাটা জিদ ধরে।

আক্তার সাহেব, এবারে বাঘ বের করে দিতেই হবে, আমাদের আবদার। আক্তার সাহেব বাঘ বের করে দিচ্ছেনা। সে নিশ্চয়ই তার খবর রাখে। আক্তার বলে, সে হবে না। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! এস-ডি-ও সাহেবকে এনে কি বোকামিই করেছি। তিনটা বাঘ ঘায়েল হয়েছে। একটাও মরে নি। বেচারী ভয়েতে

হার্টফেল করে আর কি! না, না মাচা তৈরী করার গাছ নেই, সের্প্ ঝাড়ী হ্যায়। গর্ত্ত করে কোথায় বসবেন? বাঘ কোথায় আছে 'উস্‌কো' ঠিকানা হ্যায়? খাটিয়া আড়াল করে তার পেছনে বসা যায় না?. না-না সে কি আড়াল? সে কোথায় উড়ে যাবে। ঝরণার ধারে জল খেতে আসে রাত্রে। নরম মাটীতে, পায়ের দাগ পড়ে, বাঘিনীটার একটা পা খোঁড়া, গুলীতে ঘায়েল—পাঞ্জা দেখে বোঝা যায়। মাটীতে তি । পায়ের গভীর ছাপ পড়ে আর একটা ক্বচিৎ দেখা যায়, তাও অস্পষ্ট।

রাত বারোটার পরে বেরিয়েছি জানোয়ারের আলয়ে। নবী আক্তার সন্ধানী আলো দেখাচ্ছে। ডাক্তার চৌধুরী আছেন। হবিব সাহেবও আছেন।

বিষণপুরের পাহাড়। এর গায়ে তৃণগুল্ম। নবী আক্তার অত করে কি দেখছে? চীৎকার করে গলা ফাটালেও ত বহেরা কিছু শুনতে পাবে না!

কিন্তু বহেরাটা সত্যিই কিছু দেখেছে। বিদ্যুতের মত একটা জ্বলন্ত শিখা ঝোপের আড়ালে ঝল্‌সে গেল। নবী আক্তারের স্পট্ লাইটের শিখা আর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করছে না। ঝোপের এক পাশ থেকে বেরিয়েছে একটা মাথা। মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নেই। যাদের খুঁজছি এ তাদেরি একজন। আমাদেরই সামনে। তীক্ষ্ণ চোখ দুটোয় স্পট্ লাইটের আলো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মাথা ও ঘাড়ের আশে পাশে হরিদ্রা চামড়ার উপরে কালো কালো স্থূলরেখা। নবী আক্তার বললে "লেপার্ড হ্যায়—হুঁসিয়ার।"

রাইফেল তুলেছি, নবী আক্তার ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে—"ফায়ার"। সহসা বাঘের মুণ্ডটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হল। আবার তাকে খোঁজা হচ্ছে। বার করতেই হবে। এবারে ঝোপের উল্টো-দকে মাথা আর দেহের আধখানা বেরিয়েছে। হবিব বল্‌লে বহুৎ

ডবল হ্যায়। বাঘ ওপারে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে, আমরা পাহাড়ের নীচে, দূরত্ব মাত্র ত্রিশ গজ। এক গুলীতে মারা না গেলে আক্রমণ হবে নির্ঘাত।

রাইফেল তুলে গুলী ছুঁড়েছি। পাহাড়ের গায়ে আওয়াজ ওঠে ভীষণ গুম্-ম্-ম্-ম্। যেখানে বাঘের গায়ে গুলী লেগেছে তার দশ হাত দূর থেকেও বাঘ দেখা গেল না। আক্তার সাহেব বললেন—

"ভোর মে তল্লাস কিয়া যায় গা"—কিন্তু ভোরেও তল্লাস হ'ল না। যখন আমাদের ভিতরে ভোর পর্য্যন্ত কোথায় থাকা যায় তার পরামর্শ হচ্ছে—তখন মাথার উপরে কালো মেঘ জমেছে। তাতে বিদ্যুৎ-ঝলক, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। একটা ঝড় আর বৃষ্টি এল বলে। বৃষ্টি এলে পাহাড়ে বালুর নদীতে বাণ ডাকবে সহরে ফিরে যাওয়া হবে না। আমার আফিস, আরও আগে চৌধুরী সাহেবের হাসপাতাল। চৌধুরী হুকুম দিলেন "তেওয়ারী ডাক বাংলোমে চল তুরন্ত।" বুকের ভিতরে যে কাঁটাটা ফুটে আছে দীর্ঘপথ যাত্রার সমস্ত সময়টা আমাকে তা পীড়া দিয়েছে। "বাঘ খোঁজা হল না।" "রাত্রে রাইফেলের নিশানা ঠিক হয় নি।" "ছিঃ।"

কয়েকটা দিন পরে। আবার সহরের সেই এক ঘেয়ে জীবন। আফিসে বাবুদের কাজে ভুল, চাঁদার খাতা, উমেদারের তাড়না, ভৃত্যের বদমায়েসী, গোয়ালার শঠতা, পত্রিকার রাজনৈতিক দলাদলির গ্লানি। সন্ধ্যায় মেন ফটকের পাশে দাঁড়িয়েছে পরিচিত বন্ধু, এক গাল হাসিতে শুভ্র দাঁতগুলি বিকশিত। নবী আক্তার! বনের মানুষ, বয়ে এনেছে অরণ্যের খবর। 'আদাব' 'আদাব'—'আইয়ে'। "ম্যানেজার সাব, আপকো বাঘ ত' মিল গিয়া, উসকো মাঙগাইয়ে। খালত বিলকুল গল্ গিয়া, হাড্ডি আউর দাঁত মিল যায়েগা"। ঝোপের কাছে বাঘের কঙ্কালটী পড়ে আছে। আর

একবার অনুশোচনার তাড়না, এ ক্ষোভ আমাকে বহুদিন নির্য্যাতন করেছে।

কিন্তু আজ আর সে ক্ষোভ নেই। লেপার্ডের কঙ্কালটা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে; চিত্ত-ফলকে ফুটে আছে কূয়োর কাছে জল তুলছে মলিন-বেশা ক্ষুৎ-ক্লিষ্টা দেহাতী জননী, মাঠে গোরু, সবুজ ফসলের পাশে সাদা বকের সারি।

বাঘের পাঞ্জা

সশারাম সাহাবাদ জিলার মহকুমা সহর। সরকারী বাংলোটি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ছুঁয়ে আছে। পূবদিকে গয়া পশ্চিমে বেনারস। হিন্দুর এই মহাতীর্থের মধ্যভাগে সশারাম। ত্রিশকোশ দূরে আরা। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কুনোয়ার সিং-এর দুঃসাহসিকতা আর বদান্যতার কাহিনী ভোজপুরীদের মুখে মুখে। সশারাম সহরের দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল সরোবরের মধ্যস্থলে শের শাহের প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল সমাধি। এ সমাধি নির্ম্মাণ করেছিলেন শের শাহ নিজে। দীর্ঘ পুলের সাহায্যে ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। আরও দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী—আরও পশ্চিমে বহুদূরে বিন্ধ্যগিরিতে মিশেছে। এই পাহাড় ঘিরে ঘন অরণ্য। গিরিনদী আর গহ্বর একে আরো দুর্গম করে রেখেছে। বাংলার বীর শের শাহের হাতে মোগল সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হ'য়েছিলেন এই পাহাড় পথে। ১৫৩৯ সালে শের শাহের অতি উচ্চ ত্রিতল সমাধির প্রত্যেক পাথরখানা সেই কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডিসেম্বর মাস। আড়ষ্ট সন্ধ্যায় সেজেগুজে বাংলোর বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। বন্ধুরা আসবেন পাটনা থেকে। ডাঃ চৌধুরী, ডাক্তার শরণ, তাদের পথপ্রদর্শক জমিদার সীতারাম সিং। দক্ষিণের পাহাড় পল্লীই তাঁর জমিদারী। বাবু সীতারাম সিং-এর শিকার ব্যবস্থা নাকি নিখুঁত। অন্য হিংস্র জানোয়ারের ত' কথাই নাই—বাঘও নির্ঘাত।

পাহাড় পল্লী। গ্রামটির নাম খড়িডহা। বাবু সীতারামের উচ্চ প্রাসাদ পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। আশে পাশে সবুজ ফসলের ক্ষেতে, অড়হর, ভুট্টা, গম, যব। পাহাড়ী কৃষকের বস্তী। কৃষকেরা বাঙ্গালীর মত নিরস্ত্র নহে। গভীর ফসলের ক্ষেতে শম্বর আসে—

বন্য বরাহ আর ভালুক গর্ত্ত খোঁড়ে, চিতাবাঘ গৃহস্থের কোলাহলে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের গ্রাস থেকে ছাগল ভেড়া বাঁচিয়ে রাখাই দায়। বন্য বরাহের শক্তি দুর্জ্জয়, সাহসও অপরিমেয়। কিন্তু বাঘের শক্তি ও কৌশলের হাতে সে প্রাণ হারায়। ভোরের রাখালের চোখে পড়ে—রক্তাক্ত জমির উপরে অর্দ্ধভুক্ত দেহ—বিরাট বন-শূয়োর।

বাংলোর বারান্দায় বসে পথ চেয়ে অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছি। বাবুরা অলস, এরা দীর্ঘসূত্রী। শিকারে এরা সিরিয়াস নয়—এরা এলে কি ভাষায় এদের গাল দেব তাই ভাব্‌ছি। বাংলোয় আমার ড্রাইভার তেওয়ারী আছে। এর বিশাল বলিষ্ঠ দেহ। শিকারের উপযুক্ত দোসর। সাবিত্রী আছেন—শিকারে উৎসাহ আছে—চাঞ্চল্য নাই। অরণ্য ভ্রমণে আনন্দ আছে—কিন্তু ঘরকন্নার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিতে যাত্রায় উৎসাহের প্রকাশ নাই। গাছে চড়তে, মাচায় উঠতে সাহায্য পছন্দ করেন না। দুবার'ত প'ড়ে গিয়েছিলেন। নিঃশব্দে মাচায় বসেন বা গাছের ডালে, বিনা উত্তেজনায় বাঘের প্রতীক্ষা করেন। নির্ব্বিকার নিশ্চল ভাবে ব'সে থেকে আঙ্গুল দিয়ে জানোয়ার দেখিয়ে দেবেন। প্রয়োজন মত গুলী নির্ব্বাচন করে দেবেন।

হঠাৎ অদূরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

"রেডি?" "সিওর"।

পনর মিনিটের মধ্যে আমার মোটর তৈরী হ'ল। তিনখানা আট সিলিণ্ডার গাড়ী গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পার হ'য়ে সহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এ কোন্ পুরাকালের নগরী! পাথরে বাঁধাই অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দুই পাশে সৌধশ্রেণী। আঁকাবাঁকা গলি-ঘুঁজির শেষ নাই। এরি মধ্য দিয়ে রাত্রের জনহীন অন্ধকারে গাড়ীগুলি কায়ক্লেশে পেরিয়ে যাচ্ছে। সহর ছাড়িয়ে গেলেই খড্ডিহার গ্রাম্য-পথ। প্রাচীন কোঠাগুলি দারুময় শক্ত কবাট আর ক্ষুদ্র গবাক্ষের আড়ালে অতীতের রহস্য আগলে আছে। অতীতের মানুষগুলো এই

পথে দেখেছে কাতারে কাতারে সৈন্যশ্রেণী। অশ্বারোহী সশস্ত্র শের শাহের স্পর্দ্ধিত অভিযান, প্রতিদ্বন্দ্বী মোগল বাদশাহ স্বয়ং। কালের গহ্বরে সে শৌর্য্য লুপ্ত হ'য়েছে। দু'মুঠো ছাতুর ব্যবস্থা হ'লে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা যায়, এই হচ্ছে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

দূরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে খড্ডিহার পাহাড়। বাবু সীতারাম সিং এই খড্ডিহার জমিদার। ভাব্‌ছি সীতারাম বাবু সুখী বটে, রাতের শেষে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় অরণ্যে-ঘেরা পাহাড়ের আড়াল থেকে ভোরের সূর্য্য। দুপুরে ছায়ালোকে বিচিত্র অরণ্য। পশ্চিমাকাশে সূর্য্য ডুবে যায় অন্ধকার নেমে আসে। পাহাড় আর অরণ্য হয়ে ওঠে রহস্যময়। সেই অন্ধকারে বিচরণ করে কত বিচিত্র জানোয়ার! বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা। নির্ভীক —স্বাধীন। অরণ্যেই তাদের আহার জোটে—ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই, আত্মরক্ষার পক্ষে কারো সবল দেহ, সুতীক্ষ্ণ দন্ত, কারো ক্ষিপ্র চরণ—এই যথেষ্ট। বাসগৃহের বালাই নাই, শীতাতপের জন্য ক্ষোভ নাই—যখন আকাশ ফেটে জল নামে, এরা কোথায় থাকে? কিন্তু কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা মনে পড়ছে,—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে, দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘ-মন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিতে শীকারের পরে,
অনায়াস সে মহিমা, হিংসা তীব্র সে আনন্দ
সে দীপ্ত গরিমা, ইচ্ছা করে লভি তার স্বাদ।"

ভাবছি এই রহস্যের উপকূলে যাঁরা বাস করেন, সমস্ত দিন রাতে তাদের বৈচিত্র্য আর কল্পনার সীমা নেই। সহরবাসীর ভীরুতা এদের নেই, এরা সহজে সাহসী—শৌর্য্যের চর্চ্চা এদের নিত্য নিরন্তর। শ্রমশীলতা এদের স্বভাব, পরোপকার এদের পত্রিকার পাঠকদের জন্য নহে! বাবু সীতারামের সমস্ত অবয়ব, তাঁর চোখের চাহনি, তাঁর চলার ভঙ্গী আমার কাছে সার্থক ও আমাদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হোলো।

সীতারাম বাবুর প্রাসাদে চা ও জলযোগান্তে যখন আমাদের নৈশ আহার প্রস্তুত হচ্ছে, টুরার কার নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছি কয়েকজন বন্ধু। অদূরের পাহাড়টার আশে পাশে যদি কোন নৈশচারীর সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়। অন্ধকারে যে দু'একটা জানোয়ার দেখে আমরা ত্রস্ত হয়ে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তার সব ক'টাই বনশূয়োর।

পরদিন আহারান্তে আমরা অরণ্যে প্রবেশ করেছি। দুইতিন মাইল পথ মটরে—তারপর পায়ে হেঁটে। একটা পার্ব্বত্য ঝরণার কাছে এসে মটর বন্ধ হল, আমরা নেবে গেলাম। অরণ্যের একি সমারোহ,—ভয়ে, বিস্ময়ে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি। আচ্ছা যদি আরণ্যিকেরা আজ যুদ্ধ ঘোষণা করে—যদি ঝোপঝাড়ে আড়াল থেকে তাদের দ্রংষ্ট্রা দেখা দেয়! যদি সবাই যুক্তি ক'রে আমাদের তাড়া করে ছুটে আসে? ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে তাদের বিকট ভঙ্গী! আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছে তুচ্ছ!

বাঘ সন্ধানে একটি মুহূর্ত্তও বেহুঁসিয়ার হলে চলে না। আমরা সহরের সাহেব, শিকার আমাদের বিলাস। কুলীর হাতে বন্দুক নিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস। এজন্য কত শিকারী বিপদের মুখে পড়েছে—প্রাণ হারিয়েছে। লিখ্‌তে বসে মনে পড়ছে ডাক্তার চৌধুরীর পার্টির সেই বিপদের ইতিহাস—জানোয়ারের কবল

থেকে তাঁরা যে সেদিন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন সে নিতান্তই দৈবানুগ্রহ।

এমনি অরণ্য পথে তাঁরা চলেছেন পায়ে চলে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে জঙ্গল পেটান হবে। হঠাৎ সামনের অদৃশ্য বাঁকের আড়াল থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারের দ্রুত ধাবনের শব্দ। এক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিকারী চেঁচিয়ে উঠেছেন "Doctor, pigs-pigs শূয়োর," ডাক্তার রাইফেল হাতে নিতেই দেখ্‌লেন যে-জানোয়ারটা তেড়ে আস্‌ছে সে শূয়োর নয়—ভালুক। অগ্রবর্ত্তীদের বন্দুকের গুলীতে বোধ হয় ঘায়েল হয়েছে। ডাক্তার হাঁটু গেড়ে রাইফেল তুলে গুলী ছুঁড়েছেন। গুলী ঠিকই লেগেছে, কিন্তু ভালুকের গতি তাতে রোধ হলো না। ভালুক এত কাছে এসে পড়েছে, আবার ফায়ার হলো না। পেছনে হতবুদ্ধি য়্যাংলো সাহেব কুলীর হাত থেকে রাইফেল নিতেই সময় কেটে গেল। গুলী বোঝাই আছে কিন্তু ফায়ার করতে গিয়ে অনর্গল ট্রিগার টানছেন কিন্তু ফায়ার হয় না! সকলের মুখে আর্ত্তনাদ, সাহেব সহসা রাইফেল ফেলে পেছনে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ধরাশায়ী! সকলেই ভাব্‌ছেন ভালুকের দাঁত ও নখর তারই ঘাড়ে বসেছে! লিখতে এতটা সময় লেগেছে কিন্তু এতটা ঘটনা নিমেষে ঘটে গেল। হঠাৎ ভালুকের কি খেয়াল হল—তার গতি ফিরে গেল। লাফ দিয়ে পাশের নালাটা পার হচ্ছে দেখতে পেয়ে ডাক্তারের চৈতন্য ফিরে এসেছে। আর দ্বিধা নাই। রাইফেল তুলে ফায়ার করেছেন দুম্ দুম্। দুবার। এবারে ভালুকটা শুয়ে পড়েছে, ফাঁড়াটা কেটে গেল। সকলেই স্তব্ধ। সাহেব তো লজ্জায় ক্ষোভে লাল। পরীক্ষা করে দেখা গেল—তাড়াতাড়ি যে রাইফেলটা তিনি কুলীর হাত থেকে নিয়েছিলেন সেটা তাঁর রাইফেল নয়! এ রাইফেলটার 'সেফটি ক্যাচ' সম্পূর্ণ উল্টো, তিনি নিজেই রাইফেলের অভ্যাসক্রমে

'ট্রিগার' রেড়ি করতে গিয়ে তাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার পরে ট্রিগার ধরে টানাটানি করলেও ফায়ার হয় না।

একবার গাছে চড়তে গিয়ে পায়ের কাছ থেকে কি একটা জানোয়ার ছুটে পালালো—তাকে চোখে দেখতে পাইনি। সামনে একটা উঁচু পাহাড়, তাতে জঙ্গল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না, ঐ পাহাড় তাড়িয়ে কুলীরা আমাদের মাচার দিকে জানোয়ার নিয়ে আসবে। শুনতে পেলাম ঐ উঁচু পাহাড়ের উপরে কৃষকদের বস্তী আছে। এরা বাঘের সঙ্গে ঘর করে—সেকালের গাদা বন্দুক দিয়ে শম্বর শিকার করে। যখন বর্ষায় পর্ব্বত থেকে ঢল নেমে মাঠ প্রান্তর প্লাবনে ভাসিয়ে দেয়, আহার্য্য দুর্ঘট হয়ে উঠে, তখন সযত্নে শুকিয়ে রাখা এই শম্বরের মাংস এই অরণ্য অধিবাসীদের একমাত্র খাদ্য।

বিট্ কখন শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত মধ্যাহ্ন কেটেছে জানোয়ারের সন্ধানে। পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই ক'রেই, বাঘের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করছি, কিন্তু যাদের খুঁজছি তাদের সাক্ষাৎকার হলো না। যখন অরণ্যের ভিতরে অপরাহ্নের ছায়া নেমে এসেছে, তখন আমাদের শেষবারের বিট্ আরম্ভ হবে। পাহাড়ের পশ্চিম দিকটায় কুলীরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উল্টো দিকটায় পাহাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছি আমরা শিকারীরা। বিটারেরা ওদিক থেকে জঙ্গল পিটিয়ে পাহাড়ের উপরে চড়ে যাবে, আবার সে জঙ্গল পিটিয়ে ঢালু বেয়ে আমাদের দিকে নেবে আসবে। এই দুই দলের মাঝখানে জানোয়ার পিছনের তাড়ায় আমাদের দিকে ছুটে এলে হবে আমাদের শিকার।

সংকীর্ণ অরণ্যপথে এগিয়ে চলেছি—সর্ব্বপ্রথমে চলেছে অতি প্রাচীন অশীতিপর বৃদ্ধ এক পাহাড়ী—শিকার-সন্ধানে এ অঞ্চলে তার জোড়া নেই, সে-ই পথ-প্রদর্শক। তার পশ্চাতে দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহ

রাজপুত শিকারী রণধীর সিং—তার পরে আমরা যারা সহর থেকে এসেছি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। আমাদের কথাবার্ত্তা নিষিদ্ধ—শিকারের এই নিয়ম। অনতিকাল মধ্যেই পাহাড়ের উল্টো দিক থেকে বিট্ সুরু হওয়ার কোলাহল আরম্ভ হবে, কিন্তু এর পূর্ব্বেই আমাদের জঙ্গলের আড়াল খুঁজে রাইফেল লোড করে মাটিতেই বসে যেতে হবে, বিটও আরম্ভ হ'ল বলে।

একটু ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনে সম্মুখে তাকিয়ে দেখি পথ প্রদর্শক বুড়ো শিকারী মাথা ঝুঁকে মনোযোগ সহকারে কি দেখছে, রাস্তার ধূলি? ঠোঁটে একটা আঙ্গুল দিয়ে আমাদের পায়ে-চলার ক্ষীণ শব্দটুকুও বন্ধ করে দিলে! বৃদ্ধ আবার কি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে,—আর সঙ্গী রণধীরজিকে উত্তেজনার সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে, পা টিপে এগিয়ে দেখলাম বাঘের পাঞ্জা! বাঘ ও বাঘিনীর টাট্‌কা পায়ের চিহ্ন। এইমাত্র আমাদের পদশব্দে তারা সম্মুখের দিকে এগিয়েছে। আমাদের পদক্ষেপ আরও সংযত হল। সকলের চোখে ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ অতি প্রাচীন শিকারী, বাঘের হালচাল তার ভাল করেই জানা আছে। হাতে একবারমাত্র গুলী করার মতো একটা গাদা বন্দুক। কিন্তু এই ভাবলেশহীন শীর্ণ শুষ্ক মুখেও আমরা যথেষ্ট উত্তেজনার লক্ষণ দেখতে পেলাম। সে এদিক সেদিক দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে আর প্রতিক্ষণেই আমাদের হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে।

এবার বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছে, আঙ্গুল দিয়ে পাশের একটা জঙ্গল দেখিয়ে দিচ্ছে। যেখানটায় বৃদ্ধের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেখানটায় আমাদের আসার পূর্ব্বে বোধ হয় বাঘ-বাঘিনী শুয়েছিল। আমাদের পায়ের শব্দে জেগে উঠে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গেছে। এবারে বুড়ো যে-জঙ্গলটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, বোধ হয় সেই জঙ্গলেই বাঘ। হয়তো আড়াল থেকে এই শান্তিভঙ্গকারীদের

অভিনিবেশ সহকারে দেখে নিচ্ছে। সেই স্বল্পপরিসর রাস্তার মধ্যেই বুড়োকে ঘিরে আমরা সকলে জড় হয়েছি। বুড়ো তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে মৃদুস্বরে অথচ উত্তেজনার সঙ্গেই যা বলল্ তার সহজ বাংলা অর্থ এই—এটা ভীষণ বিপজ্জনক স্থান, শিকার হতেই পারে না—আমি পারবো না।

'কেন পারবে না? বাঘের সন্ধান পেয়েও ফিরে যাবো কেন?'

'আপনারা আড়াল নেবেন কোথায়? মাচা নেই, ছোট গাছের জঙ্গল, সন্ধ্যে হয়ে এলো! অন্ধকারে জানোয়ার দেখবেন কি করে? জঙ্গল থেকে বেরুবেন কি করে?'

আমি বল্লাম—'আমরা এখানেই বোসে যাবো।'

'দূরে নজর চল্‌বে কি করে? ঝোপের ভিতরে যে কিছুই দেখা যাবে না।'

'দেখা পেলেই ফায়ার করবো, না দেখলে ফায়ার হবে না।'

'সে হয় না, চারিদিক না দেখলে কি শিকার হয়, কে কাকে রক্ষা করে?'

'না হয় চারিদিকে চোখ রেখে একজায়গায়ই সকলে বসে যাবো।'

'নেহি, নেহি সো নেহি হো স্যাক্‌তা হায়',—যদি বাঘের গায় গুলী লাগে—এক গুলীতে বাঘ মরবে না, সে বাঘ কি আপনারা সামলাতে পারবেন? এই জঙ্গলে অন্ধকারে বাঘের হাতে সকলের প্রাণ যাবে। রাত্রে কি জঙ্গল থেকে পালাবার পথ পাবেন?'

সীতারামবাবু এগিয়ে এলেন। তিনিও গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, 'এ কখনই চলবে না'। বৃদ্ধও অটল তাই 'ডিসিপ্লিন' মেনে নিতে হলো। একবার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—'বাঘের খোঁজ পেয়েও ফিরে যেতে হবে তবে এখানে এলেন কেন?'

'পালাও পালাও', তখন সকলের মুখে ও মনে ঐ একই কথা,—

নিকটেই বাঘ। ওদিকে পাহাড়ের উল্টোদিক থেকে বিটারদের মৃদু কোলাহল শোনা যাচ্ছে। বিট্ আরম্ভ করেনি তো? বিট আরম্ভ হলে যে একেবারে বাঘের মুখে পড়ে যাবো। সীতারামবাবু হেঁকে বলছেন—'জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো।' আমরা তখন ছুটে জঙ্গল থেকে বেরোবার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে পথ দেখাবে, ব্যস্ততায় তারই রাস্তা ভুল হয়ে যাচ্ছে। এবারে পেছনের থেকে তাড়া,—'ভাগো ভাগো—পালাও পালাও' এতটুকু দেরী চলবে না, সকলেই আতঙ্কিত, কাঁটা গাছের ফাঁক দিয়ে পথ করে নিতে ব্যস্ত। হাতের রাইফেলটাও তখন ভারী হয়ে উঠেছে। কোথাও বেঁকে, কোথাও ঝুঁকে পড়ে কাঁটাগাছের পাশ কাটিয়ে, হোঁচট্ থেকে সাম্‌লে নিয়ে, আমরা যেদিকে এবারে অনেকটা এগিয়েছি সেটা বিপথ নয়। এবারে গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই অদূরে ছোট রেল লাইন। দূরে কোন পাহাড়ের গাঁ পরিত্যক্ত সিমেণ্ট কারখানার ছোট রেল।

বিপদটা কেটে গেছে, এবারে রেলের লাইন ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। এখনও দুই পাশে বন। কিন্তু সম্মুখ ও পশ্চাৎ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল থেকে বেরোতেই পাহাড়ের গায় বৃক্ষ-শীর্ষে সূর্য্যালোক—অপরাহ্নের শেষ সূর্য্যরশ্মি। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাছের নীচে জড়ো হয়েছে কৃষকের দল। সেখানে একটা রক্তাক্ত মেষ! তার ঘাড় ভেঙ্গে, রক্ত শুষে বাঘ পালিয়েছে!

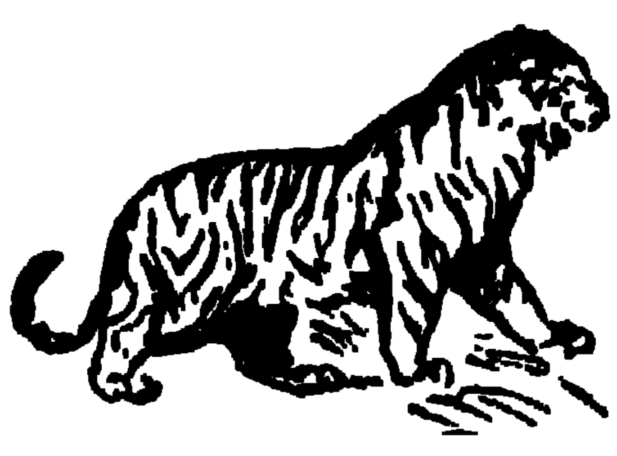

"নবী আক্তার মর গিয়া"

সশারাম থেকে ফিরে আসার কয়েকটা দিন পরে অপরাহ্নের দিকে উপস্থিত হ'লেন নবী আক্তার। খড্ডিহা অরণ্যে শিকারের ব্যর্থতায়—মনটাকে হতাশায় ছেয়ে ফেলেছিল। এমন সময়ে ডাক্তার চৌধুরীকে বাদ দিলে যার সান্নিধ্য বিশেষভাবে উৎসাহ সঞ্চার ক'রবে সে এই নবী আক্তার। খড্ডিহার জঙ্গল থেকে সেদিন আমাকে একরকম জোর ক'রে ফিরিয়ে—আনা হ'য়েছিল। কোথায় যে আমাদের ত্রুটি মনে মনে তারই পর্য্যালোচনা করছিলাম এই নিঃসঙ্গ অপরাহ্নে। মনে মনে ভাবছিলাম বেপরোয়াভাবে বিপদের মুখোমুখি না হ'লে শিকারে সার্থকতা সুদূর পরাহত। আর গাল দিচ্ছিলাম খড্ডিহার শিকারীদের। অশীতিপর সেই অভিজ্ঞ শিকারীর দিন পেরিয়ে গেছে। রণধীর হ'য়েছে রণক্লান্ত, সীতারাম সিং সার্থকতার বাহুল্যে বৈষ্ণব বনে গেছে। শুধু হস্তধৃত আলোক শিখার মত আজও অটল ও নিষ্কম্প ঐ নবী আক্তার। নবী আক্তারকে দেখে, আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছি। চেঁচিয়ে বল্লাম,—

"আসুন, আসুন আক্তার সাহেব—হাজার বার স্বাগত, ত্ু'লক্ষবার।" আক্তার সাহেব আসন গ্রহণ ক'রে নিকেলের চোঙ্গটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি বল্লাম—"গল্প বলুন আক্তার সাহেব—আর কোন কথা নয় শুধু গল্প—শিকারের গল্প। নেপালে না গেলে আর বাঘ পাবনা। এদিকের বাঘ আপনারা মেরে নির্ব্বংশ করেছেন—।" আক্তার সাহেব বললেন,—"আপনাদের জন্য শিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে সাত গাঁওয়াতে—।" আমি বললাম—"না-না বাঘ চাইনা। আমি চাই বাঘের গল্প। আনাড়ী ফিরিঙ্গি—যে

রাইফেলটা বাগিয়ে ধরতে জানে না, বাঘ ম'রল কিনা তাঁর হাতে! সশারামে বাঘ ছেড়ে এলাম কাছে পেয়েও, সেই বাঘ মারা প'ড়ল দেহাতী অনভিজ্ঞ চাষীর গাদা বন্দুকে!" আমরা সেই দিনই খবর পেয়েছিলাম—শূয়োরের মাংস লোভে গ্রাম্য চাষী আকের ক্ষেতের পাশে গাদা বন্দুক নিয়ে গর্ত্তের মধ্যে বসেছিল। একটা সচল অন্ধকারের স্তূপ এগিয়ে আসতে শূয়োর মনে করে ফায়ার ক'রেছে। নিমেষে বাঘের গর্জ্জনে তার ভুল ভেঙ্গে যেতে বন্দুক ফেলে চোঁচা দৌড় দিলে বস্তির উদ্দেশে। পরদিন সকালে বস্তির লোক দেখতে পেলে আকের ক্ষেতের পাশে—বিরাট রয়াল বেঙ্গল টাইগার! "বাঘ জুটল তার—যে খুঁজেছে শূকর! বাঘের খবর পেলে যে লোক তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।"

আমার বক্তব্য শেষ হ'তেই আক্তার সাহেব হেসে বললেন—"অর্ডার দিয়ে পোষাক তৈরী করা চলে কিন্তু বাঘ তৈরী করা যায় না। আপনাদের ধারণা স্বতন্ত্র কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে বাঘ শিকারে ভাগ্য বলে কথাটা নেহাৎ অবান্তর নহে। আমি এমনও দেখেছি—বাঘে মারা কিল সামনে রেখে মাটিতে গর্ত্ত ক'রে প্রতীক্ষা করছি, দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখের দিকে, হঠাৎ বাঘের নিশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি মাথার পেছন দিকে! তখন ঘুরে বসে রাইফেল তুলে নিতে চেষ্টা করা আর বাঘের মুখে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া একই কথা। রুদ্ধ শ্বাসে বসে আছি অপলক। বাঘটা পেছনের দিকে কি শুঁকছে, নাকে ঢুকছে আমারই গাত্র গন্ধ। খোদা মালিক প্রাণ বাচল তাঁরই দোয়ায়। কিন্তু কিলের কাছে বাঘ আর ফিরে এলনা। আরও শুনুন সমস্ত দিন বাঘের জঙ্গল পিটিয়ে বাঘ পেলাম না। সন্ধ্যার দিকে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছি লোকালয়ের দিকে। সামনেই পাহাড়ের ফাটলের ভিতরে শুয়ে আছে বাঘ! তিন চারটি শিকারী নিঃশব্দে রাইফেল সামনে বাগিয়ে ধরে পেছনে হটে যাচ্ছি

নিশানা নিয়ে ফায়ার করব। লক্ষ্য সেই ফাটলের দিকে। হঠাৎ বাঘ নজরে এল আমাদের নীচে নয় আমাদের বাঁয়ে অন্যূন একশত গজ দূরে। ঘুরে রাইফেল তুলতেই সে অদৃশ্য। তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে—শিকার হ'লনা।

"পরদিন সে বাঘের আর সন্ধান পাওয়া গেল না—তার পরেও নয়। অথচ কয়েক দিন পরে জিলার ইংরেজ জজ সাহেব যখন জ্যান্ত মোষ নীচে বেঁধে মাচায় ব'সলেন, বাঘের আবির্ভাব হ'ল আধ ঘণ্টার ভিতরে। নিজের মারা মোষের কিল নয় জ্যান্ত কিল ধরে চিবিয়ে খাচ্ছে বিরাট বাঘিনী। সাহেব বেচারার এই বাঘ না মেরে কোন গত্যন্তর ছিল না। তিনটে ফায়ার হ'ল এই বাঘের উপরে—বাঘ মরল। সাহেব তখন রাইফেল রেখে মাচায় একটু নিদ্রার আয়োজন কর'ছেন। হঠাৎ কিলের কাছে কড় মড় শব্দ পেয়ে দেখ্‌তে পেলেন দ্বিতীয় বাঘ। মোষের হাড় গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে। আবার ফায়ার হ'ল বাঘ গুলীবিদ্ধ হয়ে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

নবী আক্তার বর্ণিত এই শিকারের স্থান আমাদের বিশেষ পরিচিত। তাঁর বর্ণনায় আমার চোখের সামনে এই বনভূমির সমস্ত আবেষ্টন ফুটে উঠেছে। এরই পাশে ঝোপঝাড়ে বসে এবং মাচায় উপবেশন করে বাঘের প্রতীক্ষা করেছি। রাত্রে মোটরে সন্ধান করেছি কিন্তু দু চা'রটে শূয়োর বা শম্বর ছাড়া বাঘের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

নবী আক্তার ব'ললেন যে দ্বিতীয় বারের বাঘ অনুসরণের ভার পড়েছিল তাঁর উপরে। "উঃ কি ভয়ই সেদিন পেয়েছিলাম। একবার মনে হ'য়েছিল বাঘ আমার পা-খানা ধরে ফেলেছে এবারে ঘাড় কামড়ে চিবিয়ে দেবে। সাহেব ত' আমার কবরের ব্যবস্থা করেছিল"! 'বলুন আক্তার সাহেব সেই গল্পই বলুন।'

নবী আক্তারের এই শিকার কাহিনী আমার ডাইরিতে যেমন ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে নীচে তা উদ্ধৃত হ'ল।

"যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর অরণ্য। 'কালী পাহাড়ী' নয়, চোখে পড়ে তারই সংলগ্ন সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী।

'থালী' এই অরণ্য-উপকণ্ঠের একটি ছোট বস্তী। রাস্তার দুই পাশে দরিদ্র গৃহস্থদের ছোট ছোট কুটীর। দুই-একটি মুদী দোকান। বিক্রয়দ্রব্য তেল, নুন, চাল, দাল, আটা। কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি, আর এক-আধ টিন নকল গোল্ডফ্লেক সিগারেটও দোকানে দেখা যায়।

রাস্তায় জনকোলাহল বিরল। অনাবৃত দেহে দশ-বারটি গ্রাম্য লোক সকালে সন্ধ্যায় জড় হয়। কথাবার্ত্তায় ব্যক্ত হয় দরিদ্রের ছোটখাট সুখদুঃখ। "আকের ক্ষেত ভালুকে নষ্ট করেছে। অড়হর খেয়ে যাচ্ছে বনের হরিণ আর শম্বর। মহুয়ার সঞ্চয় মন্দ হয়নি।" এমনি কথাবার্ত্তা, আলাপ চলে মাসের পর মাস। এদের ক্ষুদ্র বুকে আশার উত্তেজনা নেই, তাই নৈরাশ্যের গুরু বেদনাও নেই। অনাড়ম্বর, মন্থর জীবনযাত্রা।

দোকান-সম্মুখের মৃদু আলাপ মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হ'য়ে ওঠে মটরের হর্ণে। সাহেব-লোগ শিকার খেল্‌নে আয়ে হায়। এরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে কখনও খাস বিলাতী সাহেব, কখনও ইংরেজী পোষাকে দেশী সাহেব। বন্দুক-রাইফেলের সমারোহ, উর্দ্দি পরিহিত খানসামা, সম্ভ্রমে মাথা পেতে নেয় তাদের অনাবশ্যক অনুশাসন—নগ্ন শিশুর দল তাড়া খেয়েও ভিড় ক'রে দাঁড়ায় গাড়ীর চতুর্দ্দিকে। মোটরের যে যত কাছে এগিয়েছে, বালক-দলে তার সমাদর তত বেশী।

দোকানের চাষীদের তখন গল্প সুরু হয়—সম্ভব অসম্ভব কত গল্প। জঙ্গলে হঠাৎ কবে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েছিল; ভালুকের

আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে গত সন্ধ্যায়! বাছুর বাঁচাতে গিয়ে চিতাবাঘের সঙ্গে কাড়াকাড়ি। বস্তীর জীবনযাত্রায় এই একমাত্র চাঞ্চল্য। ক্ষণিকের কৌতূহল ও উত্তেজনা।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। প্রায় অপরাহ্নে দেশী ছোট ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হ'লেন কমলপুরের নবী আক্তার। কমলপুর এখান থেকে কোশভর উত্তরে অবস্থিত পাহাড়-ঘেরা বস্তী। নবী আক্তার এ পল্লীর মুরব্বী। সাহসী শিকারী ব'লে দরিদ্র চাষীদের রক্ষক, মালিক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কোন্ বড় সাহেব শিকারে আস্‌ছেন, নবী আক্তারের এই অসময়ে উপস্থিতি তারই হেতু। দূরে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। কোনও চাষীর ইসারা পেয়ে নবী আক্তার তাকিয়ে দেখ্‌লেন—ধূলির ঝড় তুলে একখানা মোটর ছুটে আস্‌ছে। গাড়ী কাছে আস্‌তেই আক্তার সাহেব হাত তুলে হাজিরা জানালেন। সাহেব ইঙ্গিতে নবী আক্তারকে তিন মাইল দূরে একতারার ডাকবাংলায় যেতে আদেশ ক'রলেন।

কয়েক দিন থেকে জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে মোষ বাঁধা হচ্ছে। 'কিলে'র খবর পেয়ে সাহেব এসেছেন। রাত্রে মাচায় বসে মাংস-লোভী বাঘের প্রতীক্ষা করবেন। সঙ্গে সাহেবের একটি কুমারী কন্যা। শিকারে এর উৎসাহ সাহেবের চেয়ে কম নয়।

মাচায় জায়গা যথেষ্ট নয়। ব্যবস্থা হ'ল সাহেব কন্যাকে নিয়ে মাচায় বসবেন। আশঙ্কার কারণ নেই, মাচা খুব উঁচু ক'রেই বাঁধা হয়েছে। নবী আক্তার ডাকবাংলোতে থাকবেন। রাইফেলের আওয়াজ হ'লে মোটর নিয়ে এগিয়ে যাবেন সাহেবের সাহায্যে। মাচা দূরে নয়, ডাকবাংলো থেকে বন্দুকের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাবে।

একটা আরাম চেয়ারে মুক্ত অঙ্গনে আক্তার সাহেব চোখ বুজে শুয়ে আছেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন হিসাব নেই। খানসামা

এসে ঘুম ভাঙ্গালে। জঙ্গল থেকে দুইবার রাইফেলের আওয়াজ শুনেছে। নবী আক্তার ঘড়ি খুলে দেখ্‌লেন ভোর চারটা। মাচার দিকে এই মুহূর্ত্তে এগিয়ে যাওয়া অনাবশ্যক। গ্রীষ্মের ছোট রাত, আধ ঘণ্টায় দিনের আলো দেখা দেবে। ড্রাইভারকে মাচার দিকে মোটর নিয়ে যেতে আদেশ ক'রে নিজে খানসামার সঙ্গে মুর্গীর আণ্ডার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হলেন। এ জিনিষগুলো এ অঞ্চলে সুলভ নহে, কোন শ্বেতাঙ্গ সাহেবই এখবর পছন্দ করেন না।

এক ঘণ্টা পরে মোটর ফিরে এল। নবী আক্তার দেখ্‌তে পেলে লাগেজ-কেরিয়ারে কি একটা খুব ভারী জানোয়ার বাঁধা। সাহেব হৃষ্ট, তাঁর কন্যা উল্লাসে দিশাহারা। আক্তার সাহেব তাকিয়ে দেখলেন পেছনের ভারী জানোয়ারটা একটা বিপুলকায়া বাঘিনী। বিস্ময়ে মুখখানা বিস্ফারিত ক'রে নবী আক্তার বললেন, "সাহেব, আপনার বরাত ভাল! এত অনায়াসে এখানে কেউ বাঘ শিকার করেনি।" সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, "ভাগ্যের শেষ কোথায় এখনও জানি না। ব্যাঘ্রী ত কুড়িয়ে এনেছি, কিন্তু বড় বাঘ গুলী খেয়ে জঙ্গলে কোথায় প'ড়ে আছে। এইবারে তোমার পালা—বাঘ খুঁজে আন।"

তিনটি শব্দের হুকুম—'বাঘ খুঁজে আন'। এর গুরুত্ব কতখানি সাহেব নিশ্চয়ই জানেন। নবী আক্তার ততোধিক জানেন। আক্তার সাহেব বললেন, "বাঘ যদি পড়েই আছে, সেটাকেও নিয়ে এলেন না কেন?"

সাহেব জানালেন সমস্ত রাতের অনিদ্রায় তিনি শ্রান্ত, বাঘ সন্ধানের সামর্থ্য তাঁর নেই।

যেতেই হবে, দ্বিধা করা চলবে না। যিনি আদেশ করছেন তিনি ইংরেজ, নবী আক্তার গ্রাম্য নেটিভ; আর নবী আক্তারের

শিকারী-চিত্ত বিপদে পরাঙ্মুখ নয়। এমনি বিপদে সে এগিয়ে গেছে—কখনও সঙ্গীসহ, কখনও প্রায় নিঃসঙ্গ।

মাচার কাছে গিয়ে দেখ্‌তে পেলে কয়েকজন গ্রাম্য লোক সেখানে ব'সে আছে, আক্তার সাহেবেরই প্রতীক্ষায়। এরা নিকট-বর্ত্তী বস্তীর লোক। রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ শুন্‌তে পেলে এরা ভোরেই বেরিয়ে পড়ে। ভরসা শম্বর, শূকর আহত হ'লে খুঁজে বের ক'রে নেবে। দুই-চারদিনের উপাদেয় আহার। মাংস প্রচুর হ'লে এরা শুধু মাংস খেয়েই থাকে। রাত্রে জঙ্গলে কেউ শিকারে বেরোলে এরা অতি প্রত্যূষে মোটরের চাকার দাগ দেখে জঙ্গলে ঢুকে যায়। শুক্‌নো পাতায় বা পাথরের টুকরোয় ক্ষীণ রক্তের দাগ এদের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। এই রক্তের বিন্দু অনুসরণ ক'রে এরা আহত জানোয়ার সন্ধান করে। যে জানোয়ার গুলীবিদ্ধ হ'য়ে তৎক্ষণাৎ মরে যায়, আগন্তুক শিকারীর পক্ষে সেই জানোয়ার ছাড়া আহত জানোয়ার খুঁজে বার করা অসম্ভব। অরণ্যচারী বস্তীর লোক সেই জানোয়ার খুঁজে নেয়। প্রয়োজন হ'লে বল্লম টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করে। শিকারীর চোখে ধূলি দিয়ে কখনও বা মৃত জানোয়ারও তুলে নেয়। মৃত জন্তু জঙ্গলে ফেলে রেখে আগন্তুক শিকারী অন্য শিকারে রত হ'লে এইরূপ চুরির সুযোগ ঘটে। মাংসাহার আর মাংস বিক্রয় ক'রে এ গরীবদের দু পয়সা উপার্জ্জনও চলে।

রাত্রে রাইফেল ফায়ার হয়েছে, বস্তীর লোক জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েছে জানোয়ারের সন্ধানে। এরা জানত না, যে-জানোয়ারের উপরে রাইফেল চলেছে সে শম্বর বা শূকর নহে। সে রাইফেলের লক্ষ্য ছিল বাঘ, সন্ধ্যার পরে গ্রাম-প্রান্তে যার গর্জ্জন শুন্‌লে এরা আতঙ্কে দোর বন্ধ করে ক্যানেস্তারা পিটোয়—বাঘকে ভয় দেখিয়ে দূরে তাড়াবার চেষ্টা করে।

এমনি একদল লোক সাহেবের নজরে পড়েছিল মাচা থেকে ডাকবাংলোয় ফেরার পথে—আর তাঁরই আদেশে এরা প্রতীক্ষা করছিল মাচার নিকটেই।

নবী আক্তার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দু জায়গায় রক্ত দেখতে পেলে। সাহেবের কাছে পূর্ব্বেই শুনেছিল, ব্যাঘ্রী মরার খানিক পরেই বিশালকায় বাঘ উপস্থিত হয়েছিল। সাহেবের গুলী তার পেটে বিদ্ধ হয়েছে। পেটে বিদ্ধ হ'য়ে বাঘ যে খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি তাতে সন্দেহ নাই।

আক্তার সাহেব গ্রাম্য লোকদের বুঝিয়ে দিলে বাঘ খুঁজতে হবে। এর বিপদ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক ক'রে জানিয়ে দিল—সাহসী জোয়ান ছাড়া যেন কেউ তার অনুগামী না হয়। কয়েকজন লোক তখনই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। 'মোদিয়া'র নেতৃত্বে ছয়জন লোক আক্তার সাহেবের সাথী হ'ল।

মোদিয়া ডাকবাংলো-সংলগ্ন বস্তীর অধিবাসী। সে এই অঞ্চলের চৌকিদার। কখনও চাকুরী আছে, কখনও নেই। চাকুরী যখন থাকে তখন সপ্তাহে দু দিন থানায় হাজিরা আছে। তিন ক্রোশ দূরে গোবিন্দপুর থানায়। এ রাস্তাটা মোদিয়ার পক্ষে এতটা দীর্ঘ নহে। সে জানোয়ার-সঙ্কুল জঙ্গলের রাস্তাই পছন্দ করে। জঙ্গলের রাস্তা অনেক কম। থানায় হাজিরা দেওয়া মোদিয়ার কোন বালাই নয়। রোজই অতি ভোরে সে বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলে। রাত্রে কখন সে ফিরে আসে কেউ জানে না। রাত্রে মাঝে মাঝে তাকে তাড়িখানায় দেখা যায়। সমস্ত সকাল, দুপুর, অপরাহ্ন সে খুঁজে বেড়ায় বনের জানোয়ার। হাতে ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্র নেই। জানোয়ারের দেখা পেলেও শিকারের সম্ভাবনা থাকে না। তবু প্রত্যেক জন্তুর পরিচিত আশ্রয়, ভালুকের গহ্বর, বাঘের মান (বাসা) সে খুঁজে দেখে। ওৎ পেতে শুয়ে থাকে তারই আশে

পাশে। জন্তুর নিশ্বাস নাকে আসে, নিঃশ্বাসের শব্দ, জানোয়ারের গর্জ্জন শুন্‌তে পায়। কখনও দূরে পালিয়ে যায়, প্রয়োজন হ'লে গাছে চড়ে। প্রত্যেক শিকার দলের সে সাথী, পথপ্রদর্শক। ছিপ-ছিপে গঠন আর মুখের মিষ্টি হাসিতে এর সাহসী চিত্তের আভাস-টুকু নাই, হাসিতে চিক্‌মিক্ করে এর তাম্বুলরাগহীন শুভ্র দাঁতগুলি।

অনুমান দুইশত গজ দূরে শক্ত পার্ব্বত্য লতায় গঠিত এক বিস্তীর্ণ জঙ্গল। ঠিক এরই সম্মুখে রক্তের দাগ দেখা গেল। এই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। মাকড়সার জালের মত লতার গাঁথুনী একে দুর্গম করে রেখেছে। ভিতরে যাওয়াও বিপজ্জনক। উঁকি দিয়ে দেখাও নিরাপদ নয়। এক লহমায়, বাঘের এক থাবায় পঞ্চত্ব লাভ কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। মানুষের মাথাটা চিবাইয়া দেওয়াও বাঘের পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। নবী আক্তার আদেশ করলেন, জঙ্গলের বাইরের দিকটা প্রথমে ঘুরে দেখ্‌তে হবে। বাইরের দিকটায় রক্ত দেখ্‌তে পেলে বুঝতে হবে এ জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মোদিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ও দিক্‌টায় রক্ত দেখ্‌তে পেলে। সেই রক্তের দাগ দেখে আবার অনুসন্ধান সুরু হ'ল। এতটুকু রাস্তা দেখ্‌তেই বেলা এগারটা বেজে গেছে। রক্তের গতি পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল 'ককুলতে'র ঝর্ণা এসে সমতল ভূমিতে যেখানে অরণ্যকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে নীচে নেমে গেছে বাঘ সেই দিকের রাস্তা ধ'রে এগিয়েছে।

এপ্রিল মাস। পাহাড় বনভূমি রৌদ্রের খর তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। যেদিকে রোদ, সেদিকে তাকাতে চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে। আক্তার সাহেব বুঝে নিলেন জলতেষ্টায় বাঘ ঝর্ণার দিকে এগিয়েছে ঝর্ণা বেশী দূরে নয়। এক সঙ্গে এত লোকের অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবেনা। বিপদ ত আছেই, তা ছাড়া মানুষের পদশব্দে

বাঘ একবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কাও প্রচুর।

নবী আক্তার একবার সম্মুখের ঝরণার দিকে তাকালেন। একবার উর্দ্ধে আকাশের পানে তাকালেন। খোদার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন কি? স্থির করলেন, এবারে এগিয়ে যাবেন সম্পূর্ণ একক। যে লোকটা সম্পূর্ণ বধির, শুষ্ক পত্রে বাঘের পদধ্বনি দূরে থাক, যে বাঘের গর্জ্জনে পাহাড় অরণ্য থর থর ক'রে কাঁপে এই শিকারীর কানে তার এতটুকুও পৌছায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরামর্শই উত্তম। জীবনে বহুবার তিনি বাঘের দংষ্ট্রার সম্মুখীন হয়েছেন। বাঘের যে দৃষ্টি বহু শিকারীর বন্দুকের মুষ্টি শিথিল ক'রে দেয়, নবী আক্তার সে দৃষ্টি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মৃত্যুভয় কতটা তা জানি নে। একবার তাঁকে বলেছিলাম, "ক্রুদ্ধ বাঘের সামনে পড়ে গিয়ে তার গর্জ্জন শুনে অবিচলিত থাকৃব এমন বিশ্বাস ত আমার নেই। আপনার এমন অবস্থায় ভয় হয় না?" উত্তরে তাঁর পাথরে গড়া মুখখানা হাসির উচ্ছ্বাসে ভরে দিয়ে বলেছিলেন, "হাম ত বহেরা হাঁয়, হামে ডর কেয়া হাঁয়? হামে ত শেরকা গরজ্না শুনাই হি নেহি পড়তা হাঁয়।"

নবী আক্তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—তারা গাছের উপরে আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু চরম প্রয়োজনে তারা যেন দুর্লভ না হয়। সম্মুখের ঝরণা পার হয়ে তিনি এগিয়ে চললেন পাহাড়ের পাদদেশে দূরের ঝর্ণায়। হাতে উদ্যত দোনলা রাইফেল্স। চোখের দৃষ্টি চকিত। খানিকটা দূর এগিয়ে অদূরে ছোট টিবি। ভালই হ'ল, এই টিবির উপর থেকে অনেকটা দূর দেখা যাবে। একশত গজ দূরে তার সন্ধানী চোখ বাঘ দেখতে পেলে। মনে হ'ল, বাঘের পিছনের বাঁ দিকের পা খানা আহত। বাঘ এগিয়ে চলেছে সম্মুখে—নবী আক্তার পশ্চাতে। সাহেব বলেছিলেন, বাঘ পেটে আহত হয়েছে।

সাহেবের সে অনুমান সত্য নহে। বাঘের চলার ভঙ্গী দেখে আক্তার সাহেব বুঝে নিলেন, এক গুলীতে বাঘ নিহত না হ'লে আজ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পায়ে আহত বাঘ জ্যান্ত বাঘের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে, পরন্তু আহত হয়ে সে অধিকতর হিংস্র হয়ে উঠেছে।

বাঘের পিছন দিক দেখা যাচ্ছে। কোথায় গুলী করা যায়! আক্তার সাহেব সাব্যস্ত করলেন, পেছনের অন্য পা খানা ভেঙ্গে দিলে বাঘ প'ড়ে যেতে পারে, কিন্তু এতটুকু সময়ে বাঘ আরও এগিয়ে গেছে। এতদূর থেকে গুলী করা সঙ্গত হবে না—পিছন নিতে হবে। ঢিবি থেকে নীচে নেমে এসে সন্তর্পণে আবার এগিয়ে চল্‌লেন। ভরসা এই, বাঘকে তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আড়াল থেকে অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কা নেই। বধির শিকারীর পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধই প্রশস্ত। কিন্তু বাঘ পায়ের শব্দ শুন্‌তে না পায়। এপ্রিল মাস—নীচে শুষ্ক পাতার রাশি। আক্তার সাহেব পা টিপে রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে চললেন। এবারে দূরত্ব পঞ্চাশ গজ মাত্র। কি সন্দেহ ক'রে বাঘ মাথা তুলে ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিলে। আক্তার সাহেব রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। বাঘ আবার এগিয়ে চলল। না—আরও কাছে যেতে হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে রক্ষা নেই। লক্ষ্যচ্যুতি হ'লে বিপদ ত বটেই, কিন্তু বাঘের নিকট-সান্নিধ্যে কি ভয় নেই? নবী আক্তারের এই যুক্তি গ্রহণ করার মত বুকের পাটা কয়জন শিকারীর আছে? কিন্তু এসব কারুর না থাক, নবী আক্তারের তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি এগিয়ে চল্‌লেন। এবারে দূরত্ব ত্রিশ গজ মাত্র! ব্যস্—এইবার। নবী আক্তার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেলে নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টেনে দিলেন। রাইফেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল।

বাঘের গর্জ্জনে বনভূমি কেঁপে উঠেছে—নবী আক্তারের তাতে

কিছু এসে যায় না, সে যে বধির। কিন্তু বিপদ হ'ল—মুহূর্ত্তে বাঘ ঘুরে গিয়ে আক্তার সাহেবকে তাড়া ক'রে ছুটে এল। দূরত্ব যৎ-সামান্য, নিশানা ক'রে গুলী করার অবসর নেই। তিনি ছুটে গেলেন একটা কাঁটা ঝোপের দিকে। একটা ধারণা ছিল বাঘ কাঁটা ঝোপকে ভয় করে। ঝোপের ভিতরে ঢুকে যেতে একটা পা যে বাইরে আটকে গেল, সেটাকে টেনে কিছুতেই ঝোপের ভিতরে নেওয়া যাচ্ছে না। পায়ে দারুণ যন্ত্রণা। বাঘ একটা পা মুখের ভিতর পুরেছে কি! শুয়ে পড়ে শুধু হাতের কনুই ভর ক'রে দারুণ যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে আক্তার সাহেব চোখ বুজে পড়ে আছেন। ভাব্ছেন—আব্ পাক্ড়িস, আব্ পাকড়া। আব্ খতম্। হঠাৎ চোখ খুলে গেল—আক্তার সাহেব দেখ্তে পেলেন—বাঘ ঝোপের বাইরে দাঁড়িয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় উদগ্র। রোষে ক্ষিপ্ত, লাঙ্গুল মাটিতে ঠুক্ছে। মুহূর্ত্তে আক্তার সাহেবের চেতনা ফিরে এসেছে। শায়িত অবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক ক'রে নিয়ে আবার ট্রিগার টেনে দিলেন। আবার বাঘের ভীষণ গর্জ্জন, উল্লম্ফন—তারপর সব নীরব। আক্তার সাহেবের মুখ থেকে বেরোল, "ব্যস্ খতম্।"

রাইফেলে আবার ছুটো টোটা পুরে নিয়ে কাঁটার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। পায়ের দিকে লক্ষ্য করার অবসর নেই। রাইফেলে বাঘের মস্তক লক্ষ্য ক'রে নবী আক্তার এগিয়ে এলেন বাঘের অতি নিকটেই। আবার অস্ফুট গর্জ্জন—ছু বার মুখ হাঁ ক'রে বাঘ নিশ্চল হয়েছে। বাঘের দেহের উপরে রাইফেল রক্ষা ক'রে চেঁচিয়ে বল্লেন, "তোম্ শালে কোই হ্যায়?" মোদিয়া নিঃশব্দে আক্তার সাহেবের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল—তিনি দেখ্তে পাননি। যারা গাছের উপরে শ্বাসরোধ ক'রে বসেছিল তারাও এগিয়ে এল।

জলের কাছে গিয়ে আক্তার সাহেব চোখে মুখে জল দিলেন। পকেট থেকে সিগারেট তুলতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখ্লেন একটা

হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে গিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। পায়ে, বস্ত্রে রক্তের ধারা!

ডাকবাংলোয় সাহেবের কাছে খবর গেল। "মার দিয়া, বাঘ মার দিয়া, নবী আক্তার সাহেবনে মার দিয়া। জান্‌সে খতম্।" বাংলো থেকে সাহেব রাইফেল ও ঘন ঘন বাঘের হুঙ্কার শুনেছেন—এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। নিজের হিন্দী বিদ্যায় বুঝে নিলেন, নবী আক্তার মরে গেছে। কন্যাকে ডেকে বললেন, "বেচারী নবী আক্তার মর্ গিয়া।" বাইরে এসে সংবাদ-দাতাকে বল্‌লেন, "কেয়া করে? যাও, বয়েল গাড়ীমে উঠা কর্ লাও—বেচারা আচ্ছা আদমী থা।"

সাহেবের মুসলমান ড্রাইভার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বুঝে বললে, নবী আক্তার মরে নি, বাঘ মরেছে, সাহেবকে তাই বুঝিয়ে দিলে। সাহেব রেগে খুন। এ লোকটা তাকে উল্টো বুঝিয়েছে, হিন্দী তিনি খুব ভালই বোঝেন, হিন্দী ভাষায় তাঁর পাশের সার্টিফিকেট আছে। এদেশী ড্রাইভার, প্রতিবাদ করার সাহস তার নেই—মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে নিলে।

এবারে মোটর চ'ড়ে সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। হাতে বোম্বাই '৪৭৬ রাইফেল, পকেটে প্রচুর গুলী। নবী আক্তারের কাছে বাঘের অনুসরণ বৃত্তান্ত শুনে সাহেব আবার রেগে খুন। এমন অবস্থায় নবী আক্তারের এগিয়ে যাওয়া উচিত হয় নি। বিপদ হ'তে পারত। বাঘ দেখে সাহেবকে খবর দেওয়া উচিত ছিল! আক্তার সাহেব জবাব দিয়েছিলেন—খবর দিতে গেলে বাঘ পালিয়ে যেত—আর সাহেব বল্‌তেন—কাপুরুষ, বাঘ দেখ্‌তে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা পালিয়ে এলে! তোমরা হিন্দুস্থানী লোক এমনি কাপুরুষ বটে!

আক্তার সাহেবের আঙ্গুলটা ধ'রে ক'সে টান্‌তেই সেটা খট্ ক'রে

নিজের জায়গায় ব'সে গিয়েছিল। পায়ের ক্ষত বাঘের দংশনে হয় নি—ওটা কাঁটা গাছে লেগে জখম হয়েছিল, টিঞ্চার আইওডিনের ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হ'ল।

যে গ্রাম্য লোকগুলি পায়ে চ'লে জঙ্গল থেকে ফিরে আসছিল তারা তখনও ফিরে আসেনি। সাহেব দুই বাঘ নিয়ে সগর্ব্বে মোটর ছুটিয়ে দিলেন শহরের দিকে। বড় বাঘশিকারী ব'লে সেদিন থেকে সাহেবের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অরণ্য-উপকণ্ঠের সেই ছোট বস্তী থালী আজ উত্তেজনায় চঞ্চল। মুদী-দোকানের সাম্‌নে জুটেছে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা। সকলের মুখেই বাঘের প্রসঙ্গ। এক কাঠুরে জানালে, বনে কাঠ কাট্‌তে গিয়ে গতকল্য—সে বাঘের গর্জ্জন শুনেছে। কেউ জানালে মাচা তৈরী কর্‌তে সে গাছের ডাল আর সখুয়ার রজ্জু সংগ্রহ করেছিল। দূরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ধূলো উড়িয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে আস্‌ছে মোটর। থালী আর জনতাকে ডাইনে রেখে গাড়ী বেরিয়ে গেল আকবরপুরের দিকে। দুটী বাঘ শক্ত ক'রে বাঁধা হয়েছে। ওজন কমিয়ে দেওয়ার জন্য পেটের নাড়ী ভুঁড়ি বার ক'রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে উত্তপ্ত গ্রীষ্ম দিনের প্রায়াপরাহ্নে ছোট ঘোড়ায় চ'ড়ে উপস্থিত হলেন নবী আক্তার। ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট। মুদী দোকানের মালিক বিড়ির বদলে তাকে একটা নকল গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খেতে দিলে।

বনে জঙ্গলে, রজৌলী

গয়া জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে রজৌলীর পাহাড় শ্রেণী। এই পাহাড় কেটে মোটর চলাচলের জন্য হাজারীবাগ ও রাঁচী অভিমুখে রাস্তা তৈরী হ'য়েছে। রজৌলীর ডাক-বাংলো ছুঁয়ে এই পাহাড়-কাটা রাস্তা ন'ক্রোশ দূরে কোডার্মা পর্য্যন্ত নিবিড় অরণ্যাচ্ছন্ন। কোডার্মা অভ্রের খনির জন্য প্রসিদ্ধ। অভ্রের ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কোডার্মায় বহু বাঙ্গালীর আবাস নির্ম্মিত হয়েছে। রজৌলী ও কোডার্মার মধ্যবর্ত্তী এই রাস্তা কোথায়ও গভীর খাদে নেমে গিয়েছে, কোথাও চড়েছে পাহাড়শীর্ষে, কোথাও বা খানিকটা সমতল। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই রাস্তার তুই দিকে অবিচ্ছিন্ন অরণ্যরাশি। এই অরণ্যে বহু জানোয়ার, বিশেষতঃ ব্যাঘ্রের বাস। বাঘের উপদ্রব এই অঞ্চলে দৈনন্দিন ঘটনা।

অরণ্যের পশ্চিম দিকে সুউচ্চ শৃঙ্গী বা শিঙ্গার পাহাড়; আরও পশ্চিমে পার্ব্বত্য নদী অরণ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে ছুটেছে। বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে গর্জ্জন করে জলধারা নীচে নেমে আসে; অন্য সময়ে চোখে পড়ে নদীর বুকে শুভ্র বালুর রাশি, পাথরের টুকরো— অনন্ত, অসংখ্য।

নদীর পশ্চিম তীরে পাহাড় ও অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে কৃষকের বস্তী। মাটীর দেওয়াল এবং আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে বেঁউড় বাঁশের শক্ত কাঁটাওয়ালা কঞ্চির তুরতিক্রম্য প্রাচীর। পাহাড়ে শক্ত জমিতে ভুট্টা আর অড়হর এদের একমাত্র ফসল। সন্ধ্যা হতেই এদের আঙ্গিনার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। বাঘের গর্জ্জনে গরু মহিষ চঞ্চল হয়ে পা ছোড়ে—দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে। লেপার্ডের কাছে মানুষের কৌশল টেঁকে না; কঞ্চির দেওয়াল ভেঙ্গে গোশালা

থেকে গোরুবাছুর মুখে নিয়ে পালিয়ে যায়। দিনের বেলা পাহাড় পথে গোরুমহিষের পালে বাঘ পড়ে। চাষীরা ছুটে পালায়। দু'একজন ডানপিটে টাঙ্গী হাতে বাঘকে তাড়া করে। কখনো বাঘ তাড়িত হয়; কখনো বাঘ ঐ বেয়াদবীর সাজা দেয় দুঃসাহসী চাষীর ঘাড় ভেঙ্গে।

গয়ার বন্ধুদের কাছে রজৌলীর ভাগবত বাবুর নাম শুনেছিলাম। ভাগবত বাবু বড় শিকারী। তাকে নিয়ে শিঙ্গার পাহাড়ে শিকারে যাবার সংকল্প করে রজৌলী উপস্থিত হলাম। ডাক-বাংলো থেকে মোটরে ভাগবত বাবুর সন্ধানে চ'লেছি। আমার ভাগ্য ভাল তাঁর অঙ্গনে গ্রাম্য শিকারীর দল জড় হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনকে আমার বিশেষ ভাবে মনে থাকবে। এক জনের অনাবৃত দেহে সর্ব্বত্র পোড়া দাগ ও ক্ষতচিহ্ন। অপর জনের একটি চোখ নেই; মুখ বিকৃত বীভৎস; নাসিকার ছিদ্র ছাড়া বাকী অংশ প্রায় লুপ্ত। প্রথম লোকটি বাঘের কবল থেকে মহিষ ছাড়িয়ে আনতে বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছে; আর অপর লোকটির চোখ নাক লুপ্ত হয়েছে ভালুকের নখরে। মনে ভাবলাম আজ শিকারের দোসর ভালই হল। বাঘও পাব—ভালুকও। পাহাড়ের ঢালু দেহে রয়াল টাইগার তাড়িয়ে যে ওলট-পালট খেয়েছে মোষ সে বাঁচাত পারে নি—নিজের প্রাণটাও রক্ষা পেয়েছে দৈবাৎ। বাঘের দংশন জ্বালা ও ক্ষতমুখে তীব্র এসিডের দাহ সে আজও ভোলে নি। তার হৃদয়ের শৌর্য্য আজও অটুট। আজও প্রত্যেক শিকারযাত্রায় সে অগ্রণী! হয় ত বাঘের পেটে লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি অদম্য শৌর্য্যে সে সাড়া দেবে।

ভাগবত বাবুর সঙ্গে শিকার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ চোখে পড়ল দেয়ালে লম্বিত কয়েকটি মৃত বাঘের চামড়া। শিল্পীর নৈপুণ্যে এরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে—হাঁ-করা মুখে বৃহৎ দংষ্ট্রা, তার

ফাঁক থেকে বেরিয়েছে রক্তাক্ত লেলিহান জিভ্, দেহের বিশালতাও বিস্ময়কর। ভাগবত বাবু বলছিলেন কয়েকদিন থেকে বাঘের গর্জ্জনে পাহাড় কাঁপছে—কয়েকটা গৃহপালিত জানোয়ার খোয়া গেছে। আমি সশঙ্কপুলকে ভাবছিলাম আজ রাত্রে হয় ত এদেরই কোন সহোদরের সঙ্গে মুখোমুখি হব। আমার সঙ্গিনী অভিনিবেশ সহ-কারে বাঘের হাঁ-করা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন ; কিন্তু শিকার-ব্যবস্থার আলোচনার এক বর্ণও যে তাঁর কাণ এড়ায় নি আমি তা' বেশ জানি।

ভাগবতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে আমার মোটর এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর। হোঁচট খেয়ে গাড়ী চলেছে। মাথার উপরে হুড্ নেই ; উইণ্ড-গ্লাস খুলে ফেলেছি। অরণ্যপ্রান্তে প্রথমে মহুয়া ও পলাশ গাছ। তারপর আরম্ভ হল ঝোপ-ঝাড়। পাহাড়ের সানুদেশে উঁচুনীচু টিবির উপরে নীচে বনকুল, বৈঁচী, বনকরঞ্জা আর শিয়ালকাঁটার ঝোপ জঙ্গল—তারপর এল গহন বন। শীতের অপ্রখর সূর্য্যালোকে এর সৌন্দর্য্য অপরূপ। শ্যামল অরণ্যানী অপরাহ্নের পাণ্ডুর রৌদ্রালোকে বিচিত্র হয়ে উঠেছে ; কোথাও চলেছে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি। কিন্তু সদ্য বাঘের খবরে অরণ্যের এ রূপ-সজ্জাকে আজ আর বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই সৌন্দর্য্য তার বাহিরের ছলনা। এর গভীর গহনে যে হিংস্র বাঘের আনাগোনা চলেছে আমরা তার সন্ধান জানি নে ; কিন্তু এই মূক প্রকৃতি, অরণ্যগুল্ম তার খবর রাখে। সে দেখতে পাচ্ছে কোন্ রাস্তায় চলেছে গুম্ফশ্মশ্রু মণ্ডিত তার বিশাল মুণ্ড, দেখছে তার ভয়াল মুখের ভীষণ জৃম্ভণ। আমাদের ঘাড়ে তারা লাফিয়ে পড়লেও অরণ্যপ্রকৃতি তার বাষ্পটুকুও জানতে দেবে না।

আগেই বলেছি—খোলা মটর। দুই পাশের গাছের শাখা-প্রশাখা আমাদের সর্ব্বদেহে, মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোথাও

সন্তর্পণে চোখের চশমা বাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে। হঠাৎ এক শিকারী আমার দিকে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—করছেন কি, বন্দুকে গুলী পূরে নিন। জানোয়ার নজরে আসা অসম্ভব নয়।" বন্দুকে গুলী পূরে নিতে নিতে প্রশ্ন করছি, 'কোন্ জানোয়ার?' উত্তর হল, 'যে কোনও জানোয়ার। সন্ধ্যা হয়ে এল; লেপার্ডের বেরোবার সময় ত হয়েইছে—বাঘও বেরোতে পারে।'

জিজ্ঞাসা করলেম,—"এই কি বাঘ চলাচলের পথ?" —'পথ বই কি? দেখবেন? শিকারী চারিদিক তাকিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললেন। আমাকে বললেন, "নেমে আসুন—একটা মজা দেখবেন।"

আজ স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু এই প্রায়ান্ধকার বনপথে বাঘের সম্ভাবনা জানিয়ে দিয়ে নীচে গিয়ে মজা দেখবার প্রস্তাবে আমার দেহের রক্ত চলাচল্ দ্রুত হয়েছিল বললে ভুল হবে না। মোটর থেকে নেমে মাথা নুয়ে জঙ্গল থেকে চশমা বাঁচিয়ে বক্তার অনুসরণ করছি—আরও পশ্চাতে সঙ্গিনী তখন বৃক্ষচূড়ায় অস্তমান সূর্য্যের পাণ্ডুর আভা মিলিয়ে যাচ্ছে; নীচে নিঃশব্দে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে আসছে। সামনেই গভীর গহ্বর—ভিতরে অন্ধকার-রাশি।

—বাঘের গহ্বর নাকি?

শিকারী বললেন, হাঁ এ বাঘ-ধরা গহ্বর; আমরাই তৈরী করেছি।' আমি সভয়ে গর্ত্তের ভিতরের অন্ধকার নিরীক্ষণ করে দেখছি—ওর ভিতরে এখন কেউ নেই ত?

শিকারী বললেন, 'গর্ত্তটা ২৪ ফুট গভীর। পাঁচবার পাঁচটা বাঘ পা ফস্‌কে এই ফাঁদে বন্দী হয়েছে। তিনটে লেপার্ড এই গভীর গর্ত্তে বন্দী হয়েও পালিয়েছে! ভীষণ জানোয়ার বটে লেপার্ড। একটা বাঘকে গুলী করে মারা হয়। সব চেয়ে বড় বাঘটাকে লোহার পিঁজরায় পূরে আলীপুর চিড়িয়াখানায় চালান করা হয়েছে।

শুনছি এখনও তার বুনো স্বভাব বদলায় নি। আপনি দেখেন নি শিঙ্গারের সে বাঘ—রয়াল বেঙ্গল টাইগার? অফিসারের বিশেষ অনুমতি নিলে দেখতে পাবেন।”

কি করে বাঘ বন্দী করলেন?

শিকারী বললেন, “সে অনেক আয়োজন—অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি। ঐ যে অতবড় গহ্বর দেখছেন—তখন দেখলে কি একে গর্ত্ত বলে চিনতে পারতেন? হয়ত উপরে নরম মাটীতে লাগানো কাঁচা ঘাসের উপরে পা দিয়ে আপনিও গর্ত্তে পড়ে যেতেন—একেবারে পাতালপুরীতে। আশেপাশের ঘাস জঙ্গল থেকে এই জায়গাটির চেহারায় কোন পার্থক্য ছিল না। রোজ দিনের বেলা আবার নতুন ঘাস বদলে দেওয়া হত। শুকনো ঘাস দেখলে যে বাঘের সন্দেহ হয়! গর্ত্তের এই পাশে একটা মোষ বেঁধে রাখা হত। মোষ ধরতে এসে অসাবধানে এই ঘাসে-ঢাকা গর্ত্তের উপরে পা’ দিলে সোজা ২৪ ফুট গভীর পাতালে পড়ে যাবে। কিন্তু বাঘ এই ফাঁদে পা না রেখে অন্য দিক থেকেও মোষ ধরতে পারত। তাই তাকে এই ফাঁদে পা’ দিতে বাধ্য ক’রেছিলাম।”

আমি সবিস্ময়ে বললাম, “কি করে বাধ্য করলেন?” “সে কিছু কঠিন নয়। গর্ত্তের তিনটা দিক শক্ত কাঁটা জঙ্গলে ঘিরে দিয়েছিলাম। বাঘের চামড়া নরম—সে কাঁটা গাছ এড়িয়ে চলে! খোলা রাখা হয়েছিল শুধু এই দিকটা। কিন্তু বাঘ ভয়ানক সন্দিগ্ধ জানোয়ার। চার রাত কাছে এসেও সে মহিষকে স্পর্শ করেনি। হয়ত পঞ্চম রাতে লোভ দুর্জ্জয় হয়েছিল। বাঘের গর্জ্জনে বনের কাঠুরেরা পালিয়ে গেল—গর্ত্তের কাছে আসতে কারও সাহস হল না। আলীপুরে তার পাঠান হল—সেখান থেকে ওস্তাদ এল পিঁজরা নিয়ে।” গহ্বর সংলগ্ন প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটা নালা দেখিয়ে বললেন,—ঐ নালা কাটা হয়েছিল পিঁজরাটা গর্ত্তের তলায় নামিয়ে

দিতে ; প্রথমে ঐ দিকটা কাটা হল, তারপরে গর্ত্তসংলগ্ন অংশটা। এইখানে খাঁচাটা রাখা হল। উপরে গাছের সঙ্গে কপিকল বেঁধে দড়ি দিয়ে পিঁজরা বেঁধে দেওয়া হল—আর একটু একটু করে নালা কাটার সঙ্গে সঙ্গে কপিকলের সাহায্যে পিঁজরা নামিয়ে দেওয়া হল। একদিনে হয় নি ; এই কাজে ২৫ দিন লেগেছে। কিন্তু মুস্কিল—বাঘ খাঁচায় ঢুকবে না। পাথর ছোড়া, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, তুবড়ী মাতাম জ্বালিয়ে গর্ত্তে ফেলা প্রভৃতি করা হল। বাঘ লাফিয়ে খাঁচায় ঢুকতেই কলের সাহায্যে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

তারপরে কপিকলের দড়ি ধরে পিঁজরাটা টেনে উপরে তোলা অসাধ্য নয়। কিন্তু দড়ি ধরে টানে কে ? কাঠুরেরা ভয়ে পালিয়ে যায়, যদি বাঘ দরজা ভেঙ্গে ফেলে। শুধু তিরস্কারে কোন ফল হল না ; বন্দুক রাইফেল নিয়ে ঘিরে দাঁড়াতে তারা কাজে প্রবৃত্ত হল।

মোটরে ফিরে এসেছি। এ অরণ্যের বাস্তবরূপ আর একটুখানি স্পষ্ট হল। বন্দুকটা শক্ত করে ধরে, চারিদিক তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখছি। মনে হচ্ছিল আজ এ গহনের প্রত্যেক কন্দরে জিঘাংসু বাঘ আমাদের গতিবিধি তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে!

সম্মুখে শুষ্ক বালুরাশিতে পার্ব্বত্য নালা—বর্ষায় পাহাড়ের উপর থেকে এই পথে জলধারা নেমে আসে—ভাগবতবাবু বললেন, "বাঘের চলাচলের এই রাস্তা—নেমে গেলেই বাঘের পাঞ্জা দেখতে পাবেন।" নিঃশব্দে চলে যাবার উপযুক্ত রাস্তাই বটে—এমন আড়ালও আর হয় না। ঝোপঝাড়ে সমাকীর্ণ দুই উচ্চ তীরের মধ্যে এমন আঁকাবাঁকা নালা ; সামান্য একটুখানি দেখা যাচ্ছে, তার পরেই বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নালার ভিতরে বালুরাশিতে গাড়ীর ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টায় অনেক ঠেলা-ঠেলিতে আট-সিলিণ্ডার গাড়ী আর্ত্তনাদ করে বেরিয়ে গেল।

তিন ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে আমাদের গাড়ী যখন "শিঙ্গার-বু পৌঁছল তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার। এই আমাদের ক্যাম্প। সামনে দেখতে পাচ্ছি বিরাট জীর্ণ প্রাসাদ। শিঙ্গারের রাজা নেই, বংশধরেরাও কেউ বেঁচে নেই; কিন্তু কুঠী সম্পূর্ণ নির্জ্জন নয়। বাহিরের চত্বরে যেখানে বৃক্ষতলে আমাদের গাড়ী থেমেছে, তার বাঁ দিকে একটি মন্দির।

এই বহু প্রাচীন প্রাসাদের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। সম্মুখে সুউচ্চ দারুময় বিরাট কবাট; রুদ্ধদ্বার আমাদের গতিরোধ করেছে। পুরাকালের যে দীর্ঘ দেহ রাজন্য-গণের জন্য এই বিশাল ও উচ্চ তোরণ নির্ম্মিত হয়েছিল আজ তাঁরা কোথায়? সেই অতিকায মহামানবগণের দ্বারপ্রান্তে আমরা গুটিকয়েক হ্রস্বদেহ মানব আতিথ্য ভিক্ষা করছি। অন্ধকারের আড়াল থেকে পালোয়ানের মত দুইটি জোয়ান পুরুষ বেরিয়ে এল; এরা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোল। তাদের সবল বাহুক্ষেপে কবাট মুক্ত হল। ডানদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা; আমাদের সামনের দিকে খোলা অঙ্গন; আরও সামনে বিরাট প্রাসাদ; ভিতরে প্রবেশের জন্য আবার সুউচ্চ দরজা। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে একটা লোক সিঁড়ি বেয়ে আমাদের দ্বিতলের অরণ্যমুখী বারান্দায় পৌঁছে দিলে। ভাগবতবাবু আশ্রয় নিলেন নীচের একটা কক্ষে। একটা কামরায় প্রবেশ করে দেখছি মাথার উপরে ছাত নেই—সেখানে চন্দ্রাতপের মত জড়িয়ে আছে একটা গাছের শাখাপ্রশাখা। আরও কত কক্ষ আছে, কত তার রহস্য; কিন্তু আজ তার সন্ধান করব না—থাক না বিস্ময়ের ঘোর রহস্যে শঙ্কিল! অন্ধকারে আমার সঙ্গিনী সহ চুপ করে প্রাসাদের অতলস্পর্শ রহস্যে ডুবে আছি—ভৃত্যটা নীচে চলে গেছে একটা আলোর সন্ধানে। হঠাৎ প্রাসাদ কাঁপিয়ে কি একটা

আওয়াজ উঠেছে—গম্ভীর শব্দময় বাদ্যোদ্যম! ও কিসের আওয়াজ? বহু শতাব্দীর সুপ্ত দুর্গাধিপতি কি সহসা জেগে উঠেছে! ভৃত্য আলো নিয়ে ফিরে এসে জানালে ও ভেরীর শব্দ; মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে। আরতির সময়ে ভেরী বাজে। এই প্রাসাদের উপযোগী আরতিই বটে—এ যে রণবাদ্য!

রাত এক প্রহর কেটে গেছে। পশ্চাতের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রাসাদসংলগ্ন অরণ্যাচ্ছন্ন পাহাড়ের নৈশরূপ দেখছি। পাহাড়ের সানুদেশ ঝোপঝাড়ে পূর্ণ; অন্ধকারে এদের পরস্পরের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে শুনছি পাহাড়ী পেচকের গম্ভীর আওয়াজ, শম্বরের গর্জ্জন। পাহাড় প্রদেশে শব্দগুলি কি গম্ভীর!

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি এর আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করছে ভালুক, শম্বর, লেপার্ড ও বৃহদ্দন্ত বন্যবরাহ। আর এই ঘন অরণ্যের আড়ালে চলন্ত প্রাচীরের মত নিঃশব্দে চলেছে বাঘ—বরাহের অনুসরণ ক'রে। সহসা এ নীরন্ধ্র অন্ধকার জানোয়ারের আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ হবে। শোনা যাবে শিকার-মুখে শার্দ্দূলের চাপা গর্জ্জন। আমরা খবর পেয়েছি এই জীর্ণ কুঠীসংলগ্ন অরণ্যে কয়েকদিন থেকেই বাঘ হানা দিচ্ছে। এই শীতের রাত্রেও কি প্রবল হাওয়া; থর থর করে কাঁপছি, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মনে মনে পর্য্যালোচনা করছি ভাগবতবাবু বর্ণিত তাঁদের দেয়ালে লম্বিত বাঘশিকারের কাহিনী।

বাঘে মোষ মেরেছে খবর পেয়ে ভাগবতবাবুর নেতৃত্বে কাঠুরেরা নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকেছে। গাছের ডালে মাচা তৈরী করে তারা কোলাহল তুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেল—যাতে করে অদূরে জলের কাছে জঙ্গলের আড়ালে বাঘ বুঝতে পারে এদিকে যারা এসেছিল তারা সকলেই চলে গেল—যাতে বুঝতে না পারে সকলেই

ফিরে যায় নি, দু'জন শিকারী নিঃশব্দে বসেছে গাছের ডালে মাচার উপরে বাঘের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায়।

আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন এবং বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। মাথার উপরে আর মাচার চতুর্দ্দিকে ঘন পল্লবের আচ্ছাদন; তবু গোলাগুলি বাঁচান দায় হ'ল। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল; গাছের পাতা থেকে বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত জল পড়ছে টপ্ টপ্ শব্দ করে। দূরে শোনা গেল বার্কিং ডিয়ারের সারমেয়ী আওয়াজ। দুই শিকারী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রাইফেল তুলে নিলেন। বাঘ বেরিয়েছে; বার্কিং ডিয়ারের শব্দে তারই ঘোষণা; ভয় না পেলে এ জানোয়ারের আওয়াজ শোনা যায় না।

অদূরে এগিয়ে আসছে একটা সচল অন্ধকারের স্তূপ। বিদ্যুতালোকে দেখা গেল বাঘ—তার বিশাল দেহ আর মুণ্ড। তড়িতালোকে ক্ষণে ক্ষণে বাঘের চোখে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছে। বাঘ চারিদিকে তাকিয়ে অদৃশ্য আততায়ী খুঁজছে। নিঃশব্দ উল্লম্ফনে খানিকটা এগিয়ে গেল—কিলের অদূরে থাবা গেড়ে বসেছে—এবার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সহসা শব্দ হল খট্ খট্; মৃত মোষের হাড়গুলি শক্ত দাঁতে কড়মড় করে চিবিয়ে খাচ্ছে। এক শিকারীর হাতের টর্চ জ্বলে উঠেছে—বন্দুকের নির্ঘোষ ও বাঘের প্রলয়কারী গর্জ্জন। আবার ফায়ার, বাঘ কিলটাকে ছুড়ে ফেলেছে; আবার বন্দুকের আওয়াজ, বাঘের উল্লম্ফন; বাঘ দাঁতে করে পাথর চিবিয়ে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে; আবার গুলী হল—এবার সব নীরব।

ভাগবতবাবুর যে শিকার কাহিনী আমার মনের পরদায় চলচ্চিত্রের বেগে ফুটে উঠছিল পেছনে কিসের একটা অদ্ভুত আওয়াজে তা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। সে দিকটায় তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছি—অন্ধকারের বুকে একি ভয়াবহ দৃশ্য! খানিকক্ষণ তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ভালুকের নখরে বিকৃতমুখনাসিকা এ সেই

বন্য শিকারী। সে আদাব দিয়ে বললে—বাহিরে গাড়ী তৈয়ার। গাড়ী তৈয়ার? বহুত আচ্ছা, এখনি বেরোচ্ছি। যে বাঘটা সেই বৃষ্টিঝরা বাদলারাতে ভাগবতবাবুর গুলীতে পঞ্চত্বলাভ করেছে আজ গভীর রাতের শীতার্ত্ত পাহাড়পুরে তারই সহধর্ম্মিণী বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে! 'নেভার মাইণ্ড', আমিও রেডি। শিকারের পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লাম; সঙ্গিনী ঠিক ছায়ার মতনই পেছনে আছেন। বাহিরে অন্ধকার বৃক্ষচ্ছায়ায় আমার খোলা মোটর দাঁড়িয়ে আছে; আরও দু'তিনটি লোক যারা আমার শিকারের সঙ্গী হবে তাদের সকলের হাতেই বন্দুক বা অন্য হাতিয়ার; সকলেই নিঃশব্দ। জঙ্গলে যে নৈঃশব্দ বিধি অবশ্য পালনীয়—যাত্রার প্রাক্কালে এ তারই সূচনা। শীতের আচ্ছাদনে সকলের দেহ, মস্তক ও মুখ এমন ভাবে আবৃত হয়েছে যেন আমরা মেরু প্রদেশের অধিবাসী; কাউকে দেখেই চেনা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গিনীও প্রায় তথৈবচ।

শিকারের জন্য যে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা পাহাড় জঙ্গল কেটে তৈরী হয়েছিল সেই বন্ধুর পথে আমার আট-সিলিণ্ডার গাড়ী লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে—কখনও পাশের গভীর খাদে টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে যাচ্ছে। প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ পথ চলে হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হয়ে গেল; মটরের নীচে বালুর সমুদ্র, একটি জলহীন পার্ব্বত্য নদী। তারপর বহু শ্রমে আমাদের সংগৃহীত চাকার নীচে গুঁজে দেওয়া ডালপালা আঁকড়ে ধরে গভীর হুঙ্কার আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করে নদীর দখিল পথে গাড়ী আবার ছুটে চলল। দুই তীরে অন্ধকার অরণ্য রাশি মোটরের বেগে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এ জঙ্গল যে বড় বড় বাঘের আলয় তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

দূরে একটা পাহাড় চূড়ায় আঁভের কারখানার আফিসে আগুন জ্বলছে। হয়ত কারখানার কুলি শীত আর বাঘের ভয়ে আগুন

জ্বেলে রাত কাটায়। অনভিজ্ঞ স্পটারের হাতে টর্চ লাইট; কোন জানোয়ার চোখে পড়ছে না। হয়ত অন্ধকারের আড়ালে বিচিত্র রেখাঙ্কিত যে মুণ্ডগুলি ফাঁকা জায়গার দিকে আংশিক বেরিয়ে এসেছিল, মোটরের হুঙ্কারে তারা জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে। তাদের তমসাচ্ছন্ন আবাস ভূমিতে আমরা ট্রেস্‌পাসার্।

এবারে নদীর দীঘল পথ ছেড়ে মোটর বাঁয়ে একটা নিতান্ত অপরিসর নালাপথ ধরেছে। মাথার উপরে উচ্চ তীরের ঝোপ-ঝাড়ের স্পর্শ অনুভব করছি—এই অবস্থাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বন্দুকের মুষ্টি নিজের অজ্ঞাতে দৃঢ়তর হচ্ছে। বালুর প্রতিবন্ধকতায় গাড়ীর গতি মন্থর; উপর থেকে ভালুকের বা লেপার্ডের উল্লম্ফন কি সম্পূর্ণ অসম্ভব! টাইগারের?

নালা এইবারে প্রায় শেষ হয়েছে। সামনেই একটা খুব উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের সর্ব্বদেহে গভীর বন। মনে হল পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে এই নালার সৃষ্টি। সামনের পাহাড়ে আমাদের মোটরের গতি রুদ্ধ হয়েছে। সঙ্গীদের কথাবার্ত্তার রকম শুনে মনে হল তারা পথ হারিয়ে ভুল রাস্তায় এসেছে; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ নালায় মোটর ঘুরিয়ে নেওয়াও অসম্ভব। ড্রাইভার তেওয়ারী পথ প্রদর্শকের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করছে; কিন্তু সকলের বিরক্তি, আলোচনা স্তব্ধ হল—বাঘের গর্জ্জনে। বাঘ অতি নিকটেই; খুব সম্ভব নদী-কিনারে ঝরণার কাছেই; কিন্তু টর্চ জ্বলছে না। মোটরের হেড্-লাইট যেখানে পড়েছে সে দিকে বাঘ নাই। একটা অসহিষ্ণু বিমূঢ়তা আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। ধন্ন্যা সিং বললে, ব্যাক্ কর; কিন্তু গাড়ী ষ্টার্ট হচ্ছে না। হায়, তুচ্ছ আয়োজন! একটা বাঘের গর্জ্জনে সমস্ত আয়োজন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

গাড়ী ষ্টার্ট হতেই সকলের মুখেই কথা ফুটেছে। কেউ বলছে বাঘ বিরক্ত হয়ে গর্জ্জন করেছে; কেউ বলছে, আহারের সময়ে বাঘ

অমনি করেই বাঘিনীকে ডাকে। এ সমস্যার সমাধান হল না। গাড়ী নালার বাঁকে বাঁকে আঘাত খেয়ে বড় নদীর বালুর রাস্তার উদ্দেশে পিছিয়ে চলেছে। অন্ধকার অরণ্যের দিকে আমি স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে আছি ; কে জানে হয়ত বাঘ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। বাঘের গর্জ্জনের অর্থ নির্ণয়ে আমার প্রয়োজন নাই। সে প্রণয়িনীর উদ্দেশে আদর অভ্যর্থনাই হোক্ বা আততায়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ ভৎ‍র্সনাই হোক্ ; এই গর্জ্জন যে বিশাল মুখবিবর থেকে বেরিয়েছে সে কত ভয়ঙ্কর! এই সমস্ত ব্যাপারটার যথার্থ রূপ বহুদিন কল্পনা করেছি। গভীর নালার ভিতরে কয়েকটি অপোগণ্ড প্রাণী ঃ মাথার উপরে অরণ্যসঙ্কুল উচ্চ তটভূমি ; সম্মুখে পাহাড় প্রাচীর ; টর্চ জ্বলে না ; গাড়ী ষ্টার্ট হচ্ছে না ; অন্ধকাররাশি আলোড়িত করে ঠিক সম্মুখেই ধ্বনিত হল বাঘের গর্জ্জন! তাতে স্নেহ বা কোমলতার লেশমাত্রও নাই। বাঘ নিকটেই, কিন্তু সে কোথায় তাও জানা নাই!

বিরাট চীৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে আবার সেই বালুর নদীতে গাড়ী চলছে ; সে রাতে আর বাঘের সন্ধান হল না। শুধু পাহাড় স্তূপের মত একটা বন্যবরাহ দুচারটা বন্দুকের ইতস্ততঃ গুলী হজম করে বেমালুম ছুটে পালালো। ধন্যু সিং বললে, রাত ভোর হয়েছে ; অন্য জঙ্গলে যাওয়ার আর সময় নেই। পরদিন সহরে ফিরে যেতেই হবে। ভোরে বনপথ ধরে গাড়ী ছুট্‌লো সহরের দিকে। তখন ময়ূর, তিতির আর বন্যমোরগ চতুর্দ্দিকে প্রভাতীবন্দনা সুরু করেছে।

রজৌলি—আর এক রাত

ডিসেম্বরের শীত-জর্জর রাত। পাহাড়ের নীচে একখানি নামমাত্র চালা। চালার নীচে শীতে হাত পা গুটিয়ে পড়ে আছি। একপাশে গোটা কয়েক বন্দুক আর রাইফেল কয়েকটা গোলাগুলির ভারী থলে আর কার্ট্রিজ বেল্ট। আগের রাতটা কেটেছে সম্পূর্ণ নিদ্রাহীন। শৃঙ্গী পাহাড়ের আশে পাশে বাঘের চলাচলের পথ। রাত্রে শিকার হয়নি—একটা বড় ধাবমান ভালুক চোখে পড়েছিল। এক শিকারী অনর্থক একটা ফায়ারও করেছিল। ভালুকটা অবাক হয়ে হয়ত আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে ছিল—এই মাত্র। আজও সমস্ত দিন কেটেছে—অরণ্য পর্য্যটনে। বিটিংও হয়েছে—একটা জানোয়ারও দেখতে পাইনি। যারা জঙ্গল পিটিয়েছে—হিংস্র জন্তুর ভয়ে তারা পাহাড়ের গহ্বরের দিকটা ছেড়ে দিয়েছে।

একাকী শুয়ে সেই গানটার কথাই ভাবছিলাম। "কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী"। কিছু পাইনি সে কথা মিথ্যা। নিঃশব্দে মাচায় বসে পল্লবঘন অরণ্যের অপূর্ব্ব রূপসুধা পান করেছি—পেয়েছি দূরান্তরের স্নিগ্ধ হাওয়ার বীজন, অন্তরে পুলক জাগিয়েছে—সুদূরের পরশ। যা খুঁজছি ব'লে মনে হচ্ছে তাকে পেলেই কি এ খোঁজা ফুরিয়ে যাবে—কে জানে!

চালার নীচে শুয়ে তমসাচ্ছন্ন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছি। পাহাড়ময়-অরণ্য, অন্ধকারে একাকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল—ঐ পাহাড় আমাকেই তাকিয়ে দেখছে। কি তার প্রশ্ন জানি না।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়েছে। মনে প'ড়্ছে—সেও তেমনি ছিদ্রহীন রজনী। জঙ্গল কেটে যে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা দিনের আলোয় তৈরী হয়েছিল সেই প্রস্তরাকীর্ণ দুর্গম পথে আমার মটর বেরিয়েছে শিকার

সন্ধানে। ভরসা ছিল বাঘ পেলে মটরের লোক্‌সান সইবে। সে দিন বাঘের সাড়া পেয়েছিলাম, তার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শুনেছি। সশরীরে সাক্ষাৎ পাইনি। আমার সে ক্ষোভ আজও মেটেনি।

সহসা খেয়াল হ'ল—এ পাহাড়ে ম্যান ইটার নাইত? এ জঙ্গলে সে বাঘের আতঙ্কের কথা ত ভুলেই গিয়াছিলাম। সে বাঘ ম্যান ইটার কি ক'রে হ'ল তাও মনে পড়েছে। একবার মানুষ খেয়ে বাঘ হয় "ম্যান ইটার"। শিকারের সে এক করুণ কাহিনী। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মোষ বেঁধে মাচায় বসেছেন। মাচায় বসলেই কি বাঘ আসে? বাঘগুলিও শেয়ানা হ'য়েছে। কত শিকারীর মাচায় কেটে যায় ব্যর্থ রাত। তিন চারিটা মোষ বাঁধা হয় জঙ্গলের বিভিন্ন অংশে। যে মাচায় শিকারী সেখানে বাঘ আসে না। মোষ মারা পড়ে যেখানে শিকারী নাই। কিন্তু সে দিন রাজপুরুষের বরাত ভাল। একটা বড় জানোয়ার এগিয়ে আসছে কিলের দিকে। গাছের নীচে একটা গোলমেলে কি হ'য়ে গেল। ...র আলো, রাইফেলের দুটো আওয়াজ, বাঘের গর্জ্জন। এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার—অরণ্য আবার নিস্তব্ধ। বাঘ নিশ্চয়ই মারা পড়েছে—কিন্তু এই রাত্রে মাচা থেকে নামা যায় না। শিকারী নেমে এলেন পরদিন সকালে—লোকজনের কোলাহলে। কিন্তু বাঘের চিহ্নমাত্রও নাই। অদূরে একটা ঝোপের কাছে খানিকটা রক্ত!

বাঘ বের করা চাইই—পঞ্চাশ টাকা বখশিস্। সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এরা বারোমাস বাঘের সঙ্গেই ঘর করে। পঞ্চাশ টাকার লোভও কম নয়—এত টাকা এক সঙ্গে এরা জীবনেও দেখেনি। এরা জঙ্গলের ভিতরে দু' পা এগিয়ে যেতেই একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। একটা ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জ্জন—একটা আর্ত্তনাদ, একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ। লোকজন কে কোথায় পালিয়ে গেল। ফিরে এসে সভয়ে দেখতে পেলে—দুটি রক্তাক্ত

দেহ—একটিকে বোধহয় মুখে করে ছুঁড়ে ফেলেছে। বাঘ নিরুদ্দেশ। তারপর সে অঞ্চলে আতঙ্কের আর রোদনের অবধি নাই। রঘুয়ার ছাতাটা প'ড়ে আছে—রঘুয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন পরে লছমিয়া বিলকুল গায়েব। রামসখীয়ার কাঠের বোঝাটা আছে কিন্তু সেদিন থেকে তাড়ির আড্ডায় তার উচ্চ কণ্ঠ আর শোনা যায়নি। দশ বার ক্রোশ পরিধির ভিতরে বাঘের মানুষ ধরার আতঙ্ক। ভীত ত্রস্ত পল্লীবাসীরা বাঘ মারার জন্য কালেকটর সাহেবের কাছে আবেদন জানালে। কালেকটর সাহেব বললেন যাঁর হঠকারিতার ফলে এই বাঘ ম্যান ইটারে পরিণত হয়েছে—বাঘ মারার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতে হবে তাকে।

এ দিকে টেকারীর রাজা সব বৃত্তান্ত শুনে বাঘ শিকারে এলেন। দ্বিসহস্রাধিক বীটার নিযুক্ত করে বাঘের সম্ভাবিত আবাসস্থান ঘিরে ফেলা হল। এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। যথাসময়ে বাঘ দেখা গেলে দ বার রাইফেলের আওয়াজ হ'ল। বীটাররা বয়ে আনলে এক কঙ্কালসার বাঘ। গুলির জখম বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হয়েছিল। মানুষ ছাড়া কোন জানোয়ার ধরে খাওয়ার শক্তি বাঘের ছিল না।

আবার চিন্তা সূত্র ছিঁড়ে গেল। হঠাৎ মনে হল—এক শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য সান্নিধ্যে অন্ধকারে আমি একাকী। অভ্যাস বশে রাইফেল ও বন্দুকে গুলী পুরে নিয়ে কোলের উপরে রেখে দিলাম।

সঙ্গীদের কোনই সাড়া নেই। আমাদের ক্যাম্প তিন মাইল দূরে। দিনের পর্য্যটনের পরে তাঁরা ক্যাম্পে আহারের জন্য ফিরে গেছেন। আহারান্তে আবার সুরু হবে আমাদের নৈশ অভিযান। আমার জন্যও তাঁরা খাবার নিয়ে আসবেন। দিনের বেলা বাঘের আনাগোনার স্থান জেনে নিয়েছি। অরণ্যঘেরা একটা অর্দ্ধ শুষ্ক পুকুর। এই পুকুরের কাদা মাটীর সর্ব্বত্র জানোয়ারের পদচিহ্নের

নামাবলী, বাঘের পাঞ্জা। এখানে শম্বর, বন্যবরাহ, ভালুক জল খেতে আসে। বাঘ নিঃশব্দচরণে এদের পিছু নেয়। এই পুকুরের ধারে একটি মাচা তৈরী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুৎপিপাসায় দেহ শ্রান্ত, নিদ্রার অভাবে চোখ জ্বালা করছে। এই অরণ্য প্রান্তরে শীতের দৌরাত্ম্যও কম নয়। হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছি। পরিচিত সুরের আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। "উঠুন, দেখুন না কেমন খাবার এনেছি। এই যে ফ্লাস্কে চা, পেয়ালাও আছে। বেশ একটু খান দেখিনি।" এদের বিলম্বের জন্য মনে মনে চটেছিলাম—কিন্তু টর্চের আলোকে প্রিয় বন্ধুর হাতে ধূমায়িত চা দেখে অভিমান ভুলে গেছি।

এখান থেকে অনেকটা দূরে একটি মাত্র মাচা তৈরী হয়েছে। সেখানে কে বসবে—আমরা যে অনেক। আলোচনার পরে সে গৌরব আমাকেই দেওয়া হ'ল। অন্য শিকারীরা এখন চালার কাছেই ফসলের ক্ষেতের আশেপাশে গাছের শাখায় ব'সে হরিণের আশায় রাত কাটাবে। একজন গ্রাম্য লোক সঙ্গে নিয়ে মাচার দিকে রওয়ানা হ'লাম।

দীর্ঘ বন্ধুর পথ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়ে চলার সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছি। কন্‌কনে শীতের হাওয়া। গরম কোট, ফ্লানেল, ওভারকোট, কম্বল, রাইফেল, বন্দুক, ভারী গোলাগুলীর বোঝা, জলের কেরিয়ার, দুটো টর্চ। এত বোঝা ব'য়ে টর্চ ফেলে রাস্তা চলা সুগম নহে। আর টর্চ দিয়ে জানোয়ারদের ভড়কে দেওয়াও চলবে না। তাই নিঃশব্দে পা-টিপে এগিয়ে চলেছি। প্রতিপদক্ষেপে এই প্রস্তরাকীর্ণ পথে হোঁচট খাওয়ার ভয়। সামনের বিচ্ছিন্ন পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে হবে। সন্তর্পণে উপরে উঠছি—হঠাৎ ভারী বোঝা সহ সঙ্গী আমাকে প্রায় চেপে ধরেছে। থমকে গেলাম। ব্যাপার কি? জবাবের প্রয়োজন হল না। একসঙ্গে

অনেকগুলো জানোয়ারের পদধ্বনি শোনা গেল—বোধ হয় ভয় পেয়ে জলের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। বন্য বরাহ হবে। নিমেষে শিকারের আবহাওয়া জেগেছে কিন্তু সে নিরর্থক। বন্দুকে গুলী পোরা নেই। একবার জানোয়ারের পায়ের শব্দ আমাদের অতি নিকটেই শোনা গেল, খুব সম্ভব ওদের বাঘেই তাড়া করেছে। আমাদের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে পালালে আমাদেরই দিকে ছুটে আসত না। কিন্তু এত জল্পনাও নিষ্ফল। নিঃশব্দে অনুসরণ করে যে দুর্জ্জয় অরণ্যচারী এতগুলো বন্যবরাহকে প্রাণ ভয়ে আতঙ্কিত করেছে—এই অন্ধকারে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়া যায় না। খানিক চুপ করে থেকে আবার এগিয়ে চলেছি। শ্রান্ত আঁখি দুটি চোখের কোটর থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে, যাকে দেখি না তারই সন্ধানে। কিন্তু এই বোঝা বয়ে ভরা বন্দুক নিয়ে চলারও বিশেষ অর্থ নাই।

মাচা দেখে বিরক্তির আর সীমা ছিল না। এই মাচা, এখানেই বাঘের পথ চেয়ে রাত কাটাতে হবে! মাচাটি মাত্র চার ফুট উঁচু। সেই পুকুরের পূব দিকের উঁচু পাড়টার সমতল জমিতে একটা কাঁটা গাছের শিকড় থেকে কয়েকটা ফোঁড় বেরিয়েছে। এরি ভিতরে বাঁশ পুতে এই অপূর্ব্ব মাচাটি তৈরী। কচিপাতায় আমাদের জন্য যৎসামান্য আচ্ছাদন তৈরী করেছে। মাচায় বসে সম্মুখে পশ্চিম দিকে সেই পুকুর। পেছনে সমতল ভূমি পাহাড়ে মিশে গেছে—তাতে দুইচারিটা বনকুলের ঝাড়। উত্তরে ঝোপ-ঝাড়। সেও পাহাড়ে মিশেছে। পুকুরের পশ্চিমে দুর্গম অরণ্য। চুপি চুপি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ মাচায় বসে জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচব—ভালুক উঠে আসবে না? সঙ্গী বললে—মাচায় ওঠার দরকার নেই—বাঘ, ভালুক নীচে থেকেই আমাদের পেড়ে ফেলবে; ছিঃ ছিঃ মাচাটা দিনের ভাগে দেখা হয় নি! কিন্তু যে দিনের ঘটনা বলছি—সেদিন উৎসাহের আতিশয্য থাকলেও

অভিজ্ঞতার বালাই আমাদের ছিল না। মাচাটি জীর্ণ তাতে বিছানো ডালপালা উঁচুনীচু। কম্বল বিছিয়ে দুজনে সভয়ে সেই সঙ্কীর্ণ আসনে বসেছি। সিগারেট চলবে না, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার উপায় নেই, নড়াচড়া বিপদ সঙ্কুল। পাথর মূর্ত্তির মত জেগে থাকতে হবে সমস্ত শীতের রাত নিশ্চল নিথর, কিন্তু চেতনা জাগিয়ে রাখতে হবে চোখ ও কানের।

মাচায় বসে চতুর্দ্দিকেই হিংস্র জানোয়ারের সত্তা অনুভব করছি—সম্মুখে, পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে। পশ্চাতে তাকাবার উপায় নাই। একটু নড়াচড়ায় হয়ত মাচাশুদ্ধ বহু নিম্নে গভীর খাদে পড়ে যাব, জানোয়ারে ঘাড় না ভাঙ্গলেও নীচের পাথরের ঘায়ে সে অটুট থাকবে না। পেছনের কথা ভাবাই যাচ্ছে না। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে যদি বাঘই নেমে আসে—হয় ত বা ম্যান ইটার; চোখের সামনেই দেখবে আকাঙ্ক্ষিত আহার্য্য। কিন্তু এ কল্পনার ত সীমা নেই।

রাত অনুমান বারোটা। চোখ দুটো আর জোর করেও খুলে রাখা যাচ্ছে না। সঙ্গীকে বললাম—তুমি খানিকটা জেগে থাক—আমি কয়েক মিনিট চোখ বুজব। তাড়ির যে বোট্‌কা গন্ধ সঙ্গীর মুখ থেকে আমাকেই মাতাল করে তুলেছিল—তার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিতে সেটা আরও দুঃসহ হয়ে উঠল। কিন্তু শিকারে বসে এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না।

হঠাৎ সঙ্গীর শক্ত আঙ্গুলের চিমটী খেয়ে জেগে উঠেছি। পুকুরের অপর পাড়ে দুটো ভারী জানোয়ার দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়েছি কিন্তু এই অন্ধকারেও ঠাহর করে বুঝে নিলাম ওটা শম্বর। টর্চ্চ দেখাবার ইঙ্গিত ক'রে রাইফেলটা হাতে নিতে ওদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর ঘুমোবার উপায় নাই—যেদিকে শম্বর দুটো পালিয়ে গেছে

সেই পশ্চিমের অরণ্য মুখো হ'য়ে তাকিয়ে আছি। মাচার নীচের দিকটায় জলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছল ছল শব্দ। কখনো আস্তে সন্তর্পণে, কখনো দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ। পাতার আড়াল থেকে কিছুই নজরে আসছে না—নড়াচড়ারও যো নাই। দিনের রৌদ্রালোকে অরণ্যের যে শ্যাম শোভা আমাকে আকুল করেছিল—রাতের অন্ধকারে সে মসীলিপ্ত—সবুজের চিহ্নমাত্রও নাই। এমনি কত কি ভাবছি—হঠাৎ পিছনে একটা ভারী জানোয়ারের গভীর নিশ্বাস কাণে এল শব্দটা এগিয়ে আসছে—একটা ফোঁস ফোঁস শব্দের মত। এই নিতান্তই ভঙ্গুর মাচায় ঘুরে দেখারও উপায় নাই—তা আগেই বলেছি। কোন্ জানোয়ার ? বাঘ নয়ত ! যাকে চোখে দেখা যাবে না—যেখানে ফায়ার করারও কোন সুযোগ নাই, সেখানে কোন জানোয়ারই তুচ্ছ নয়। নিশ্বাসের শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। মনে হল পিছনের বনকুলের ডালপালা ধরে টানাটানি কচ্ছে—বলিষ্ঠ বাহুর তাড়না বটে ! মনে মনে ভাবছি দিনের বেলা দেখেছি গাছের কুলগুলিতে পাক ধরেছে—এ ভালুক না হয়ে যায় না। এত কাছে ভালুক ! এর চেয়ে বাঘ হ'লে যে ভাল ছিল। ম্যানইটার না হলে আমাদের এই পাথর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে সংশয় নিয়েও আপন গন্তব্য পথে চলে যেত। কিন্তু ভালুকটা মাচাটা ধরে একটু ঠেলে দিলেই যে সাবাড় ! সঙ্গীর হাত ধরে টিপে দিলাম। মাতালটা গভীর নিদ্রায় অচেতন। ও যেমন ভাবে বসেছে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পারা ওর পক্ষে সম্ভব। এবার জোরে ওর হাতটা চেপে ধরেছি। সে জেগে আমার দিকে তাকাতেই—পেছনের দিকটা দেখিয়ে দিলাম। ওর চোখটা বড় হয়ে উঠেছে—মুখটা হাঁ করতেই বুঝে নিলাম পিছনের জন্তুটা ভালুক। রাইফেলটা একটুখানি তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই সে আমার হাত ধরে নিরস্ত্র করলো। শ্বাস রোধ করে

ষ্ট্যাচুর মত বসে আছি। খানিক পরে—কত সময় জানি না—ভালুকটা বনকুলের লুণ্ঠন শেষ করে গাছ কটাকে গোত্রহীন করে অন্তর্ধান করেছে।

আবার সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে আছি। সংকল্প করেছি—দূরে জানোয়ার দেখলেও আর ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমাদের পক্ষে হিংস্র জন্তুর নিকট সান্নিধ্যে থ্রিল আছে—বাঁচোয়া নাও থাকৃতে পারে।

হঠাৎ শান্ত রজনীর স্তব্ধতা চিরে একটা বিকট আওয়াজ হল! এ পরিচিত আওয়াজ—বার্কিং ডিয়ারের—অন্য জানোয়ারকে হুঁসিয়ার ক'রে দিচ্ছে। সঙ্গী জানালে—বাঘ দেখতে না পেলে বার্কিং ডিয়ার ডাকে না। বাঘ বেরিয়েছে? বেরিয়েছে ত বটেই। বাঘ শিকারের জন্যই ত এত। সংবাদ শুভ বই কি; কিন্তু সে কোন্ দিকে? ডাইনে, বাঁয়ে, সম্মুখে কি পশ্চাতে। ভালুকটা মূর্খ জানোয়ার, নিঃশ্বাসের শব্দ লুকোতে জানে না। বনের প্রাণী ভালুকের খাদ্য নয়—তাই তার গতিবিধি কতকটা বেপরোয়া। কোন জানোয়ার পালিয়ে গেলে ভালুকের কিছু এসে যায় না—কিন্তু বাঘ? সে জন্ম শিকারী—তার প্রত্যেক রোমকূপ হুঁসিয়ার! তার চলাচলে এতটুকু শব্দ নাই—তাই কখন নিঃশব্দে এসে পেছনে ল্যাজটা নাড়বে—তার কোন নোটিশই পাবোনা! দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে—রাইফেলটাকে শক্ত মুঠো করে হাতে নিয়েছি—কখন সে মহা মুহূর্ত্ত আসবে—তার সূত্র জানি না।

পায়ের নীচে, পুকুরের কিনারায় একটা জানোয়ার ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গীর হাতে বোঝাই বন্দুকটা। সে পুকুরের উত্তর দিকটায় কি নিরীক্ষণ করে দেখছে! ঝোপ-ঝাড়ে ক্রমোন্নত হয়ে পাহাড়ের ঢালুতে মিশেছে—অন্ধকারে মনে হচ্ছে—সারি সারি জানোয়ার ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু সঙ্গীটা অত কি দেখছে।

প্রশ্নের অবকাশ হয়নি—হঠাৎ কিসের একটা ভয়াবহ, গম্ভীর আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠেছি—আর একটা প্রাণীর আর্ত্তনাদও শোনা গেল—তারপর একটা টানা দীর্ঘ, গম্ভীর আওয়াজ—প্রথম আওয়াজের চেয়ে মৃদু। সঙ্গী আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরতেই আবার চম্‌কে উঠেছি—"শুনিয়ে নর-মাদীন লড়াই ক'রতা হ্যায়" বাঘ আর বাঘিনীতে যুদ্ধ? কোথায়; এযে অতি নিকটেই! উত্তরের ঐ প্রথম ঝোপটার আড়ালেই কি? আমার সঙ্গী ত সেই দিকেই তাকিয়ে কি দেখ্‌ছিল। কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে! নাই বা দেখা গেল—এবারে জানোয়ার পেছনে নয়। শিকারীর সমস্ত শৌর্য্য এবারে ফিরে এসেছে—রাইফেলটা ঝোপ লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরেছি। এতটুকু দেখতে পেলে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবেনা।

আর একটা গম্ভীর আওয়াজ! লাউডস্পিকারে মুখ রেখে আওয়াজ করলে যেমন হয়—এ তেমনি। এবারে সঙ্গী তার ভুল বুঝেছে। আমার কাণের কাছে মুখ রেখে বললে বাঘ বাঘিনীর যুদ্ধ নয়—বাঘ শম্বর ধরেছে। আর্ত্তনাদটা সেই শম্বরের। যেটা ডাকছে সেই ঐ ধৃত শম্বরের সাথী—সাথী শম্বরটা ডেকেই চলেছে। তার আর্ত্ত, মেটালিক, গম্ভীর আওয়াজ পাহাড়ে ঠেকে ছড়িয়ে প'ড়ছে। আমাদের ডানদিকে ঝোপটায় তখনো কি একটা তোলপাড় চলছে। বাঘের গলা থেকে মাঝে মাঝে যে টানা আওয়াজ বেরোচ্ছে সে তার ভোজনে তৃপ্তির—না, এই সাথী শম্বরের প্রতি শাসন!

রাইফেলটা তখনও লক্ষ্য করে আছি। বাঘের দূরত্ব মাত্র পঁচিশ ত্রিশ গজ। যদি ক্ষণিকের জন্যও এতটুকু নজরে আসে নূতন শিকারীর এ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আর সাফল্য ফলাও করে বলবার অধিকার হবে। বহু দূরে বৃক্ষশাখায় যে শিকারী বন্ধুরা হরিণের আশায় রাত জেগে বসে আছে—তারা আমাকে কি ভাষায় অভিনন্দন জানাবে।

রাত প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় অন্ধকার হালকা হয়েছে। বাঘ যদি দূরে সরে যায় তবু আজ গুলী চালাতে দ্বিধা করব না। আমার সঙ্গীও উদগ্র। এই বর্ব্বরটা আগে ফায়ার না করে এই ভয়।

হুম! হুম!! কে বন্দুক ছুঁড়লে? আমি সঙ্গীর দিকে তাকিয়েছি—না সে ফায়ার করেনি। সেও বিস্ময়ে আমাকে দেখছে। শম্বরটার আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পাচ্ছি বন্দুকের শব্দে সেটা ছুটে পালিয়েছে। ঔদরিক বাঘের সে মহাভোজেরও বুঝি অবসান হল—আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।—একটা অসতর্ক বন্দুকের আওয়াজে যবনিকা পতন। এবারে সঙ্গী বল্‌লে গাদা বন্দুকের আওয়াজ। পাহাড়ী কোন গ্রাম্যশিকারী গুলী ছুঁড়ে থাকবে। মাংসের লোভে এ অঞ্চলে ওরা ফসলের ক্ষেতের কাছে আড়াল তৈরী করে রাত কাটায়। বাঘের সাড়া পেয়ে শুয়োর হরিণ ছুটোছুটি কচ্ছিল—এগুলীর লক্ষ্য তারাই। নিকটেই আমাদেরই মত কে নৈশ আসরে লুকিয়েছিল আমরা তার বাষ্পটুকুও জানতে পাইনি। যাক্—সব খতম্—অন্যান্য বহু রজনীর ব্যর্থতার মত আজও শ্রান্ত আর নিদ্রাশ্লথ দেহটাকে টেনে ক্যাম্পে ফিরে এসেছি।

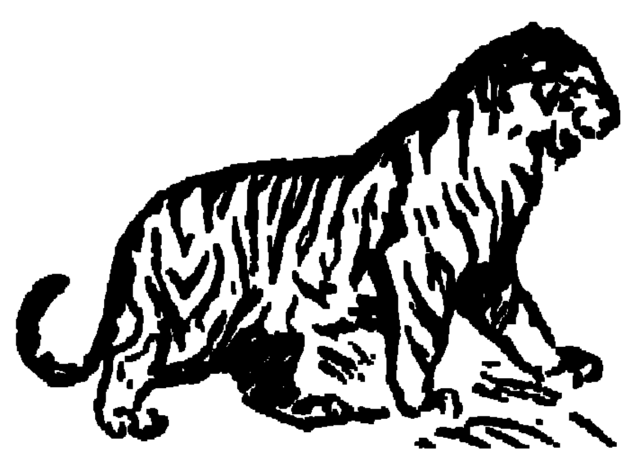

পরবতার বাঘ

সন্ধ্যার দিকটাতেই এই বনাঞ্চলে অন্ধকার গাঢ় হ'য়েছে। সঙ্কীর্ণ কাঁচারাস্তার দুই পাশেই নাতি উচ্চ জঙ্গল। দূর থেকেই একটি দীপ শিখা নজরে আসছিল। মটর থামিয়ে দিতেই দেখলাম ডানদিকে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর। ছোট্ট একখানি দোকান। বিক্রেয় দ্রব্য কিছু বাতাসা, মোমবাতি, বিড়ি ও দেশলাই। দোকানির লম্বা দাড়ি আমি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে দেখছি। 'ভবানী পাঠকের' দোকান নাকি ? দস্যুদের সংবাদ আদান প্রদানের আউট পোষ্ট ?

মাথার উপরে দ্বিশতাধিক বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। দোকানের ক্ষীণ আলোকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে—একটা পুরানো মসজিদও। পরে জেনেছি বহু প্রাচীন এই দরগায় যাঁরা মানত ক'রে, আলো জ্বেলে দেয়, দোকানের বিক্রেয় দ্রব্য তাদেরই জন্য।

আমার পার্শ্বচর [illegible] াকে জানিয়ে ছিল এই অঞ্চলে দিকে বাঘের দৌরাত্ম্যের অবধি নাই। [illegible]রু-বাছুর প্রায় নিঃশেষ হ'য়েছে, মানুষের উপর আক্রমণেরও খবর আছে। আমার এতটা বিশ্বাস হয় নাই, তাই শুধু সট গানটা নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছি। দোকানীকে প্রশ্ন করলাম—"এ জঙ্গলে বাঘ আছে ?"

সে জবাব দিলে—"আছে বই কি এখনি ত বাঘের ডাক শোনা গেল।"

আশ্চর্য্য, লোকটার মুখে কিছু মাত্র ভাবান্তর নাই।

আমি আবার প্রশ্ন কর্‌লাম—"বাঘ কোন দিকে ডাক্‌ছিল ?"

উত্তর হল—"এই নিকটেই—গরু-বাছুর ত বাঘের পেটেই গেল। শিকারে যাবেন—এই রেতের বেলা ?

আমি বললাম—“শিকার না হোক— এগিয়ে গেলে ডাক শুন্‌তে পাব ?”

দোকানী বললেন—“পাবেন না আবার—এখানে একটু ব’সলেই শুন্‌তে পাবেন।”

আমি বললাম—“ও দিকটায় যেতে পারব না ? রাস্তা ত চিনি নে।”

দোকানী—”এই গাঁয়ের রাস্তা ধ’রে এগিয়ে যান না।”

দোকানে একটা লোক দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা লুকিয়ে শীতে আড়ষ্ট হয়ে ব’সে ছিল। হাতের কাছে একটা নেভানো ল্যাণ্টার্ণ। আমি তাকে বললাম—

“এই মিঞা চলনা আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দেবে ?” লোকটা করযোড়ে নিবেদন করল “হুজুর আমি গরীব—”

তার কথার অর্থ এই—আপনারা বড়লোক, ম’রে গেলে আপনাদের কিছু যায় আসে না, আমি গরীব। মরে গেলে আর বাঁচব না।

আমি বললাম—“ভয় কি—আমরা আগে থাকব, তুমি থেকো াকে টোন পেছনে। চলো—পয়সা পাবে

লোকটা সভয়ে আমাদের পিছু নিলে। তার হাতের লণ্ঠনের আলোটা উস্কে দিতেই আমি বললাম “আলো চ’লবেনা, ওটা নিভিয়ে দাও। দরকার হ’লে টর্চ আছে।” আমার কথা তার পছন্দ হ’লনা। খানিকটা এগিয়েই একখানা কুটীরের বাঁশের ঘেরার ভিতরে অদৃশ্য হ’ল। বলে গেল এই-ওখানটা-থেকেই সেদিন এমনি সময়ে বাঘে গরু নিয়ে গেছে।

আমি জানি গোহাল থেকে যে বাঘ গরু নিয়ে যায় সে বাঘ দুঃসাহসী। মানুষের চলা ফেরার কায়দা কানুন ও অভ্যাস সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল। সরু রাস্তা দুই পাশে নালা। দু’পাশের গাছ-

পালা মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে। আমরা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চ'লেছি।

হঠাৎ মোহনলাল থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোয় দেখলাম তার চোখ ছ'টো কোটর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুখে আওয়াজ হ'ল বা-আ-ঘ। আমিও বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে বাঘ খুব বেশী দূরে নয়। হয়ত সে এই রাস্তা ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। ননী বাবু মুহূর্ত্তে আমার হাতে বন্দুক দিয়েছে। আমাদের অপর সঙ্গী নানা বাবু। নানা বাবু কিশোর, ননী যুবক।

আমার উপরে এদের বিশ্বাস অপরিসীম। ইসারায় কথাবার্ত্তায় নিষেধ জানিয়ে আমি এগিয়ে যেতে হুকুম দিলাম। নেপালীরা স্পষ্ট হুকুম পেলে নেতার আদেশ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। বাঙ্গালীর মত তর্ক করেনা।

খানিকটা যেতেই আবার বাঘের আস্ফালন কানে এল। এবারে আরও কাছে। অদূরে চাষীদের ঘরে কেনেস্তারা পেটানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ ডান দিকের জঙ্গলে কি একটা বড় জানোয়ার অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মোহনলাল অন্য দিকে টর্চের আলো ফেল্‌চে। আমার হাত ধরে—ব'ললে চলুন ওদিকটায় খরগোস আছে।

আমি চ'টে গিয়েছি। "বেকুব—পেটুক কাহেকা। বাঘ খুঁজ্‌ছি—খরগোস মেরে কি হবে?" রোজ মাংস না খেলে এই নেপালীর ভোজনে তৃপ্তি নাই।

টর্চ ফেলে জানোয়ারটা আর দেখা গেলনা।

খানিকটা দূরে আবার বাঘের সাড়া পেলাম। ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখা হচ্ছে কিন্তু আমার সন্দেহ হ'ল আজ মোহনলালই আমাকে চালিয়ে নিচ্ছে। সে যেন মতলব ক'রেই বাঘের সম্ভাবিত জায়গাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে।

সে রাত্রে বাঘের কোন সন্ধান হ'লনা। পরদিন ভৃত্যদের কাছে শুনলাম মোহনলাল জানিয়েছে সাহেবকে সে কাল রাতে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছে। বাঘ দেখা গিয়েছিল কিন্তু সটগানে গুলী ছিলনা, ছিল খরগোস মারা—কার্ট্রিজ। গুলি ছুঁড়লে আর রক্ষে ছিলনা! মোহনলালের উপরে ভার ছিল সঙ্গে নেওয়ার গুলীগুলো বেছে নেওয়ার। সে নিজের বুদ্ধিতে ছর্‌রা গুলী সাথে নিয়েছিল। আমার কাছে সে কথাটি গোপন ছিল। আর একবার সংকল্প করলাম নিজে সব আবশ্যকীয় সরঞ্জামগুলো না দেখে আর শিকারে বেরোবনা।

মোহনলালের ভয়ের হয়ত আরও একটা কারণ ছিল। হিংস্র জানোয়ার শিকারে যতবার সে বেরিয়েছে, দু'চার জন অল্প বিস্তর বাঘের হাতে জখম হ'য়েছে। কেউ কেউ মারা গেছে। এই সব অভিযানের নেতা ছিলেন গুর্খা পল্টনের ইংরেজ সাহেব। গুর্খারা জঙ্গল ঘিরে বিট ক'রতো আর সাহেব থাকতেন মাচায়—মদের নেশায় বিভোর। আমি মোহনলালের নূতন মনিব। পায়ে হেঁটে শিকারে বিপদের সম্ভাবনা ছিল প্রত্যেক মুহূর্ত্তে। বিপদ ঘটলে আমি নিজে বাঁচব আর নিরস্ত্র মোহনলালকে বাঁচাব এই বিশ্বাসের তার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

পরদিন রাইফেল গান এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়েছি দিনের আলোয়। উদ্দেশ্য ছিল উপদ্রুত গ্রামবাসীদের জড় ক'রে জঙ্গল তাড়িয়ে বাঘ বের ক'রব। কৃতকার্য্য না হ'লে অপরাহ্নে বাঘের চলাচলের রাস্তা খুঁজে নিয়ে কিল বেঁধে মাচায় বসে বাঘের প্রতীক্ষা ক'রব। কিন্তু বহু প্রয়াসেও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জঙ্গল পেটাবার সাহস এদের নাই—তাই অজুহাত ছিল অসংখ্য। অজানা অরণ্যে আমাদের পথ চিনিয়ে নেওয়ার লোকও পাওয়া গেলনা। তাই আমরা নিজেরাই জঙ্গল,

বাঁশঝাড়, এঁদো পুকুরের পাড় খুঁজে দেখ্ছি। কিন্তু ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত অরণ্যে এই সন্ধান সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাই সন্ধ্যার দিকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে কিল বেঁধে চেষ্টা হ'ল। কিন্তু বাঘের সন্ধান ত' হ'লই না, মশার উৎপাতে নিশ্চল হ'য়ে দীর্ঘ রাত জেগে ব'সে থাকা অসম্ভব মনে হ'ল।

তবু আমাদের চেষ্টার বিরাম নেই। বাঘের সন্ধান চ'লল দিনের পর দিন। বাঘের অত্যাচারের সংবাদের অবধি ছিলনা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাঘে গরু নিয়ে গেলে এরা বিলাপ করে, হা হুতাশ করে কিন্তু আশে-পাশের জঙ্গলগুলো খুঁজে দেখে না।

বহু ব্যর্থতার পরে আমার সংকল্প হোল জঙ্গলে জানোয়ার চলাচলের রাস্তা ধরে রাত্রে এই বাঘ খুঁজে বেড়াব। বাঘ রাত্রে আহার্য্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসে তাই একদিন হয়ত তার মুখোমুখী হব। আর আমাদের চেষ্টা যদি সার্থক নাই হয়, বাঘ খুঁজে বেড়াবার আনন্দ ও শিহরণ লাভ হবে প্রচুর। আমার ২।১ জন শিকারী বন্ধু এইরূপ জঙ্গল ঘুরে রাত্রে বাঘ সন্ধানের প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করিলেন। ভয় আমারও ছিল কিন্তু বাঘের মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল দারুণ।

সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে শিশুদের পিঠে-খাওয়ার কোলাহল। দিনের আলোককে আড়াল করে আছে গাঢ় কুয়াসা। এই কুয়াসার—'রসাভাস' আমার বরদাস্ত হয়না। মনে জাগে বিদ্রোহ। বেরিয়ে প'ড়ব ? কোথায় ? অপরাহ্নের কাছ ঘেঁষে এলেন ননীবাবু।

"চমৎকার," আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছি।

"ননী, এ বাদলা সন্ধ্যায় ঘরের কোণ আর ভাল লাগছে না।"

"সত্যি, চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথায় ?"

"মাঠে, জঙ্গলে, ঘর ছেড়ে আর কোথাও—

"শিকারে ?"

"নিশ্চয়—মোহনলালকে ডাকব ?"

"তাই কর।"

মহা উৎসাহে দ্রুত শিকারের পোষাক প'রে নিলাম। আজকে গুলী ও অন্য সরঞ্জাম নিজের হাতেই গুছিয়েছি।

মটর থামল—আবার সেই দোকান ঘরের সাম্‌নে। সেখানে নিশ্চল ব'সে আছে সেই রহস্যময় দোকানী।

আজও দোকানীকে বাঘের খবর জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মাথা চুলকিয়ে দোকানী জবাব দিলে "বাঘ ত' র'য়েইছে। কখন কোথায় থাকে কি করে ব'লব ? আজকাল এ দিকটায় ত' কোন হামলা শুন্‌ছি না।"

আমি বললাম—"একজন লোক সঙ্গে দিতে পার ? আজ এই পূবদিকের জঙ্গলটা দেখব। রাস্তা জানা নেই। এই রাতে পথ হারিয়ে কোথায় বেঘোরে ঘুরে বেড়াব ?"

দোকানী বললে—"লোক কোথায় পাব ? রাতে বাঘের জঙ্গলে কেউ কি যেতে চায় ? আমি মনে মনে বললাম দিনেও কেউ যেতে চায় না !

পূবদিকে যাওয়ার প্রস্তাবে মোহনলাল প্রবল আপত্তি জানালে। ওর আপত্তিতে আমার জিদ আরও বেড়ে গেল। শিকারে এই দিকটাই প্রশস্ত—এদিকেই বাঘ পাওয়া যাবে। মোহনলাল মিলিটারী ক্যাসানে সেলাম জানিয়ে বললে—"বহুৎ আচ্ছা।"

ননীবাবু ছাড়া আজ তৃতীয় সঙ্গী জমিরদ্দীন। উৎসাহী যুবক—জঙ্গল ভ্রমণে শ্রান্তি নাই।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই সামনের রাস্তাটা অতিক্রম ক'রে দেখা গেল একটা ছোট জানোয়ার ছুটে পালাচ্ছে ডান দিকে। বাঘের বাচ্চা না ত' ? জলপাইগুড়ির বাঘের কথা স্মরণ হল। সেও এমনি

রাস্তা ক্রস্ করে এসেছিল। আজ আর কাউকেই ক্ষমা নেই। বন্দুক তুলেই জানোয়ারের উপর ফায়ার ক'রেছি। ছিঃ—এটা একটা প্রকাণ্ড বন বেড়াল!

মোহনলাল জানোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে, "ভালই হ'য়েছে গেরস্তের মুরগী-হাঁস আর বক্রীর বাচ্চাগুলো বেঁচে যাবে।

আবার এগিয়ে চলেছি। মনের ভিতরে আমাদের সকলেরই একটা আশ্চর্য্য সিরিয়াস্‌নেস এসেছে। একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে। এই বন্দুকের শব্দে আমার সংকল্পে আরও দৃঢ়তা এনেছে। মাংসপেশী আর স্নায়ুতে শিথিলতার লেশ মাত্র নাই। মনে হচ্ছে আজ বাঘের সম্মুখীন হবে। কিন্তু কি তার পরিণাম জানি না—সকলেই নির্ব্বাক, গম্ভীর। একবার মাত্র ননী কাণের কাছে মুখ এগিয়ে আমাকে ফিস ফিস করে ব'ললে। "আজ বাঘ নিশ্চয়ই মারা পড়বে। এই বুনো জানোয়ারটাও ত' বাঘ হতে পারতো?" আমার মুখে জবাব ছিল না কিন্তু অন্তর তার উচ্চারিত প্রতি বর্ণে সায় দিল। বাঘের মত মানুষেরও বুঝি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। যদি তাই না হবে এ অনুভূতির অর্থ কি?

এ জঙ্গলে আগে কখনও আসা হয় নি তাই বারংবার রাস্তা ভুল হচ্ছে। এ ভুলের মধ্যেও কি একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে! মোহনলাল বলছে এই শীতের গোটা রাতেও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে না। আমি মনে মনে ভাবছি রাস্তা না পাই বাঘ ত' পাব। এও সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি! মোহনলালের দারুণ অনিচ্ছার ভিতরে সেই একই অনুভূতির আভাস পাচ্ছি।

জঙ্গলের মধ্যে দু'খানা ছোট ঘর, ভিতর থেকে বন্ধ। দু' চা'রবার ডাকের পরে সাড়া পেলাম। জমিরুদ্দীন ব'ললে এরা বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করে আছে। রাস্তা দেখানো দূরের কথা এরা বাঘের ভয়ে ঘরের বার হবে না। গৃহস্থ বললে, যে তার অসুখ করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এদিকে বাঘের ডাক শুনতে পাও?" ঘরের ভিতরের লোকটা বললে—"বাঘের খবর জানিনে"—হয়ত বাঘের খবর জানালে তাকে বাঘে খাবে!

আমি আবার বললাম "তোমাদের গরু বাছুর বাঘে মারে না? উত্তর হল—"আমার গরু নেই।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললাম—"এগিয়ে চল—এরা বেকুব। গোষ্ঠী শুদ্ধ বাঘের পেটে ঢুকলেও এরা হাত পা ছুঁড়বে না। জাতটাই পচে গেছে। সব কেঁচো, মাড়ালেও চেঁচায় না। নিঃশব্দে মরে।"

সামনেই বাঁশ ঝাড়, ফুলঝুরি আর শিয়াল কাঁটা গাছের অন্ধকার ভরা জঙ্গল। পরস্পর ঠাসাঠাসি ক'রে রাস্তাকে দুর্গম করে রেখেছে।

হঠাৎ মোহনলালের টর্চটা নিভে গেছে! মুখ থেকে আওয়াজ বেরিয়েছে, "বাপ", আমার মনে হল মোহনলালের সামনেই বাঘ! একটা গর্জ্জনের শব্দের খানিকটা আমারও কানে এসেছে। আমি হুকুম করলাম, "টর্চ দেখাও"। টর্চের আলোতে দেখলাম সামনে কিছু নাই কিন্তু দূরে আবার সেই বাঘের আওয়াজ।

খানিক পরে মোহনলাল বললে, "বাঘ প্রায় এক মাইল দূরে হবে।" আমি তাকে ঠেলে দিয়ে বললাম—"চলনা, এই দিকেই এগিয়ে চল। জোরে চল।" মুখের দু'পাটির দাঁত দৃঢ় সংবদ্ধ।

দ্রুত এগিয়ে চলেছি। একটা অদৃশ্য শক্তি আমাদের সামনের দিকে তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কতটা রাস্তা এগিয়েছি তার হিসাব নেই। দুই দিকে গভীর জঙ্গল—ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ পথ। আমরা দাঁড়িয়েছি একটা নালার ভিতরে। নালাটা অন্ধকার ও অরণ্যে জটিল। মোহনলালের মুখে আবার সেই ভীতি জড়িত শব্দ। এবারে বাঘের ডাক স্পষ্ট। হয়ত বাঘ তার সঙ্গিনীকে খুঁজছে।

সামনেই একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে। মোহনলালকে জোরে ঠেলে দিয়ে উপরে চ'ড়ে যাচ্ছি। উপরে একটা সমতল ভূমি, চোরকাটায় আচ্ছন্ন। মোহনলালকে বল্‌ছি "বাঢ়, কোন ভয় নেই।" মোহনলালের কাছে আমার হুকুমের মূল্য অপরিসীম—আমার আশ্বাস বাণীর কোন মূল্য নাই। ত্রিশ বছর সে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে কাজ করে ইংরেজ অফিসারের শিকারে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেক শিকারে বিপদ ঘটেছে। সে সকল শিকার হত দিনের আলোকে, তার হাতে থাকত রাইফেল। আজ তার হাতে অস্ত্র নেই, আছে একটা টর্চ। এক খেয়ালী মনিব তাকে চালিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মিলিটারী শিক্ষায় কমাণ্ডের মূল্য সে জানে। যদি অন্ধকার ঝোপ-ঝাড় থেকে বাঘ ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মনিবের আশ্বাস বাণী কাজে আসবে না, কিন্তু সে চ'লেছে—দ্বিধাহীন ডিসিপ্লিন্‌ড সৈনিক। মাথার টুপীর পশ্চাদভাগ থেকে ঝুল্‌ছে একটা বেণী পৃষ্ঠদেশে, সাপের মত। এর বলিষ্ঠ বাহু, দেহ-গঠন ও দৃপ্ত পদক্ষেপে মনে হচ্ছে প্রয়োজন উপস্থিত হলে এ লড়াই ক'রবে হাতে পায়ে—ডুয়েল।

ফাঁকা ময়দানের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। টর্চের আলোকে কিছুই দেখা যায় না। ময়দানটা প্রায় অতিক্রম ক'রেছি হঠাৎ মোহনলাল পেছন দিকে একবার টর্চের আলো ফেলেছে। মুহূর্ত্তে তার গতি রুদ্ধ হ'ল! টর্চ শুদ্ধ হাতখানা কাঁপছে থর্ থর করে। শব্দ হীন ভাষায় মুখে ব'লছে বা-আ-আ-ঘ! আমাদের পেছনে মাত্র বিশগজ দূরে চলেছে বিরাট কলেবর হেলে দুলে! টর্চের আলোয় সে সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন। মানুষের সান্নিধ্যে সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্র নাই। এক মুহূর্ত্তে ননী আমার প্রসারিত হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছে। নিমেষে আমার বন্দুক গর্জ্জন করেছে 'গুড়ুম'! বাঘ পড়ে গেছে। আবার ফায়ার করেছি। বাঘ শিকারের অলঙ্ঘ্য রীতি!

জমিরদ্দীন চীৎকার তুলেছে "বাঘ—প'ড়েছে।" আমার হুকুম হ'ল খবরদার—এক পাও এগিও না। ঢিল কুড়িয়ে নেও।"

খানিক পরে বন্দুক বাগিয়ে এগোচ্ছি। ঢিলের আঘাতে বাঘ নড়ছেনা। তবু হুসিয়ার হয়ে এগোতে হবে। সামনেই পড়ে আছে বাঘের বিরাট দেহ!

এই জঙ্গলে আর একটা পর্য্যটনের কথা বল্‌ছি—

সেদিন শনিবার, অমাবস্যা। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যেপে অরণ্য রাশি অন্ধকারে একসা হয়ে আছে। অমাবস্যা রাতে বাঘ নাকি ক্ষেপে যায়। সে গর্জ্জন করে পশু হত্যা করে। উদ্‌ভ্রান্তের মত বিচরণ করে অরণ্যময় বাঘিনীর সন্ধানে? অসম্ভব নয়। ঋতুর পরিবর্ত্তন জানাচ্ছে আরণ্য প্রকৃতি। দিনের আলোকে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি। রাত্রে সে রূপের চিহ্ন মাত্র নাই। চতুর্দ্দিকে শুধু অন্ধকারের রাশি। কয়েক ক্রোশ জঙ্গল পর্য্যটন করেছি বাঘ খুঁজে। অন্ধকার মূক অরণ্য তার কোন সন্ধান দিলে না। মধ্য রজনী—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শ্রান্ত দেহে খানিকটা পথ চলে এসে গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি। গাড়ীতে ফিরে যেতে হবে দশ মাইল রাস্তা। সোফার গাড়ীতে স্পীড দিয়েছে! আট সিলিণ্ডার ভি, এইট, ফোর্ড আমার চোখ অর্দ্ধনিমীলিত! সমস্ত ইন্দ্রিয়ে শ্রান্তির শেষ নাই। পাশে চুপ ক'রে ব'সে আছে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নির্ম্মল ও কমল। গাড়ী কি ৭০ মাইল বেগে ছুটেছে! টেলিগ্রাফ পোষ্টগুলো একটার পর একটা বিদ্যুৎ বেগে অদৃশ্য হচ্ছে।

চেঁচিয়ে উঠলাম—"ড্রাইভার সাবধান, আস্তে চল।" একবার গাড়ীর বেগ খানিকটা কমে গেল, আবার ছুটেছে সে নক্ষত্রবেগে। থামিয়ে দেওয়ার আর অবকাশ হ'ল না। সামনের আলোর স্তম্ভ আর একটা ফুলের বাগানের লৌহ স্তম্ভে আছড়ে প'ড়ে গাড়ী লাফিয়ে উঠেছে আকাশে। তার পর মুহূর্ত্তে কি হল, একটা ওলট-

পালট খেয়ে মড়ার মত পড়ে আছি অন্ধকার মটরের ভিতরে বন্দী। গাড়ীর চাকা গেছে আকাশের দিকে, হুড ভেঙ্গে শুয়েছে মাটীতে। গাড়ীর দরজাগুলো জ্যাম হ'য়ে গেছে। বুকে একটা দারুণ ব্যথা; দেহের উপরে কিসের বোঝা। একটা জানালার একটুখানি ফাঁক ছিল, অতি সামান্য। অতি কষ্টে সেই পথে বেরিয়ে এলাম ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাতর আহ্বানে। আশ্চর্য্য তাদের আঘাত যৎসামান্য আমার বুকের দুটো পাঁজরার হাড় ভেঙ্গেছে।

* * * *

ভাবছি ডাঃ চৌধুরীকে পাটনাতে খবরটা দেব। সোদরপম কালুকে তার করে দেওয়া হ'ল। পাটনাতে পরদিন তার এল চৌধুরীর কাছ থেকে। শিকার থেকে মোটরে ফেরার পথে মিলিটারী ট্রাকের ধাক্কায় চৌধুরীর ডান হাতের কনুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সে হাসপাতালে। অপারেশনের পরে হুঁস হ'লে আমার খবর পেয়ে তার দিয়েছে। তারপরে দু'পক্ষের আশ্বাস দেওয়া চলল টেলিগ্রামে।

* * * *

আমার পাঁজরার হাড় কোন রকমে জোড়া লাগল। চৌধুরীর কনুই আর ঠিক হয় না। চ'লল এরোপ্লেনে বিলেত। সেখানেও সংশোধন হ'ল না। বিলেত থেকে এয়ারে ছুটল্ আমেরিকা। আমেরিকা থেকে বহুদিন পরে কনুইটা মেরামত করে এনেছে।

বন্ধুত্ব দু'জনকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে তাই ভাবছি।

হাওদা শিকার

শিকারের যতরকম আয়োজন আছে হাওদা শিকার তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রাজসিক। শিকারের জন্য বিশেষ ভাবে সুশিক্ষিত হাতী ছাড়া হাওদা শিকার চলে না। হাতী সুশিক্ষিত না হ'লে বিপদ অনিবার্য্য। বাঘ বা অন্য হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণে হাতী ভয় পেয়ে পাগলের মত ছুটে পালায়, তখন হস্তীপৃষ্ঠে পালঙ্কের উপরে উপবিষ্ট শিকারীরা গাছের শাখা প্রশাখার আঘাতে কিরূপ সঙ্কটাকুল অবস্থায় পতিত হন তা বলাই বাহুল্য। হাতী শিক্ষিত হ'লেও হাওদাশিকারে বিপদের লেশমাত্র নাই এই ধারণাও ভ্রান্ত। আহত বাঘ হাতীকে আক্রমণে জর্জ্জরিত করেছে, মাহুতকে পেড়ে ফেলেছে, শিকারীকে জখম ক'রেছে এরূপ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নয়। নেপাল জঙ্গলে এক লাট সাহেবের শিকারসময়ে লাট সাহেবের মিলিটারী গার্ড হাওদা থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতের রিভলবারের গুলীতে বাঘ মারা যায়, কিন্তু ঐ বাঘের আক্রমণে তিনি নিজেও প্রাণ হারিয়েছিলেন!

ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে বর্নিত এবং শিকারী মিঃ বার্টন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটা শিকার কাহিনী বিশেষভাবে রোমাঞ্চকর। এই শিকারে ক্রুদ্ধবাঘ মুহুর্মুহু হাতীকে আক্রমণ করে তার পা ক্ষত-বিক্ষত করেছিল তথাপি শিকারীর একটা রাইফেলের গুলীও বাঘকে স্পর্শ করেনি! হাতীর বিরাট কলেবরের নীচে আক্রমণরত বাঘকে নিশ্চিত লক্ষ্যে গুলী করা সম্ভবপর ছিলনা। বাঘ একটু স'রে যেতেই শিকারী আবার গুলী চালালেন। এবারেও গুলী ব্যর্থ হ'ল এবং রোষোক্ষিপ্ত বাঘ আবার হাতীকে আক্রমণ ক'রল। বাঘ ঝুলে আছে হাতীর পা কামড়ে—হাতী পা' ঝেড়ে বাঘটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে

হাওদা শিকার

—পৃঃ ১৫২

দিতেই শিকারীর গুলী বাঘের পেটে বিদ্ধ হ'ল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বাঘ লাফিয়ে হাতীর দাঁতের কাছে নিজের দাঁত বসিয়ে দিয়ে হাতীর শুঁড়ের উপরে শুইয়ে দিলে নিজের দেহটা! এই সংঘর্ষে শিকারী ছিটকে প'ড়ে গেলেন নীচে। তখন বাঘও নীচে প'ড়েছে শিকারী-থেকে মাত্র চার ফুট দূরে। বাঘ ঐ ভূমিষ্ঠ শিকারীকে দেখতে পেলে তার যে অবস্থা হ'ত তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শিকারী রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সন্তর্পণে পিছিয়ে গেলেন। ওদিকে মাহুত তখন ঝুলছে হাতীর লেজের কাছে। বাঘ তাকে চার্জ্জ করে তার পা ছুটোকে চিবিয়ে দিয়েছে। এই শিকার পার্টির অন্য একটা হাতী জঙ্গল থেকে ভূমিষ্ঠ শিকারীকে যখন তুলে নিলে তখন বাঘ আবার এই দ্বিতীয় হাতীকে আক্রমণ করে। গুলীবৃষ্টি হ'ল বাঘের গায়ে! অন্যূন আটটা রাইফেলের গুলী তার দেহে বিদ্ধ হ'য়েছিল এবং প্রত্যেক আঘাতের পরে সে হাতীকে আক্রমণ করেছে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। হাতীকে তাঁবুতে ফিরিয়ে আনা হল এবং সেই রক্তাক্ত রণক্ষেত্র আগলে প'ড়ে রৈল ঐ বিজয়িনী বাঘিনী। পরদিন প্রত্যুষে কিন্তু তার দেহে আর প্রাণস্পন্দন ছিলনা।

নেপাল সীমান্তে আমাদের জন্য যে শিকারের আয়োজন হ'য়েছিল, সে হাওদাশিকার নয়। আমাদের হাতীর পিঠে ক'সে বাঁধা ছিল গদি বা প্যাড। ইংরেজ শিকারীরা এই প্যাড হাতী পছন্দ করেন না।

বাঘ শিকারের প্রয়াস আমাদের সার্থক হয়নি, কিন্তু এই পর্য্যটন উপলক্ষে আমরা যা' লাভ করেছি সে আমাদের জীবনের পরম সঞ্চয়। এখানে উপলব্ধি ক'রেছি বিহারের অপূর্ব্ব সহৃদয়তা ও সৌজন্য। পেয়েছি উদার আতিথ্য ও প্রচুর সম্মান। শিকার প্রচেষ্টার এই কয়েকটা দিনের স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ ক'রব চিরদিন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার।

চম্পকারণ্যে

চম্পারণ জিলার উত্তর সীমান্ত। বিহার ও নেপাল এখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বিহারের অরণ্য দেখ্‌ছে নেপালের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গ। নেপালের পাহাড় শ্রেণী সস্মিতমুখে চেয়ে আছে সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত চম্পকারণ্যের দিকে। একটা বালুর নদী। এপারে ছোট গ্রাম "ষোণ বর্ষা"। নদীর উত্তর তীরে যতদূর চোখ যায় গভীর বনভূমি। নদীর দক্ষিণ তীরে অড়হর ক্ষেতের ধারে আমাদের ছাউনি পড়েছে—৪টী তাঁবু। তাঁবুঘেরা ময়দানের মাঝখানে ধুনি জ্বলছে—খানসামা ও ভৃত্যদের জন্য শীত থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন। সন্ধ্যার অরণ্য পর্য্যটনের পরে এর চারিদিকে খাটিয়া ও ইজিচেয়ারে আরাম করে খাকী পোযাক পরা শিকারীদল, আর শিকার-সঙ্গিনী সাবিত্রী। চা আসে, স্যাণ্ডউইচ্‌, কাটলেট্‌, ফলমূল, মিষ্টিও আসে। গল্পগুজব চলে অনেক রাত অবধি। গহন অরণ্য প্রান্তে কয়েকটী তাঁবুতে কয়েকদিন হ'ল সহরবাসীদের আবির্ভাব হয়েছে। হাস্যে-পরিহাসে, বন্দুক-রাইফেল রেডিও-মটর আর হাতীতে ষোণ বর্ষা টলমল। আমরা শিকারপুরের শ্রীযুত অবধেশবাবুর অতিথি। রামরাজাও আমাদের অতিথি বলে স্বীকার ক'রে হাতী পাঠিয়েছেন—সাহচর্য্যের জন্য পাঠিয়েছেন তার ভাই রাজা সাহেবকে। যেদিন এখানে দুপুরে পৌঁছেছি সেইদিন সন্ধ্যায় হাতীতে এলেন ব্রিচেস্‌, শিকারীর বুট পরে লোকলস্কর সঙ্গে হস্তীপৃষ্ঠে রাজা সাহেব। এরা জাতিতে নেপালী। নেপালরাজের আত্মীয় জ্ঞাতি, কিন্তু কে জানে কখন রাজসিংহাসনে লোভ জন্মে তাই রাজ্যসীমার বাইরে দিয়েছেন রামরাজার জমিদারীর আসন। বিশাল

অরণ্য আর পাহাড়-ঘেরা বিস্তীর্ণ জমিদারী। অরণ্যে প্রচুর শিকার। বাঘ ভালুক আর গণ্ডারের বিচরণক্ষেত্র।

অবধেশবাবু চম্পারণ জিলার জমিদার—বনেদীবংশ। গোহালে অসংখ্য গরু, ভাণ্ডারে অফুরন্ত শস্য, বাগানে বিচিত্র ফলমূল, সব্জী, তরি-তরকারী, ঘরে ও বাইরে দাসদাসী, লোকলস্কর। কেউ রান্না করছে বিভিন্ন দেশী খাদ্য, কেউ দুধের চার্জে। সেখানে হচ্ছে দুধ, ক্ষীর, ছানা, দই, মালাই, ঘি ; কোথাও হচ্ছে মুড়ি, চিড়ে, খই। ধান ভানা হচ্ছে, মাপ হয়ে যাচ্ছে ভাণ্ডারে। কেউ পরিবেশন করছে দাসদাসী, লোকলস্করদের খাওয়া, হাতীর খোরাক, মাহুতের সিধা গরুর খাবার, ছাগল ভেড়া হাঁসের খাদ্য—বনের কুকুর ও রাস্তার পাগলটাও বাদ যাচ্ছে না। এই অবধেশ বাবুর আমরা অতিথি। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম তাঁরা ব্যবস্থা করছেন দিনরাত্রের অশেষ যত্নে।

তাঁদেরি যত্নে এ জনহীন অরণ্যে জেগেছে নগরের কোলাহল, সহরের স্বাচ্ছন্দ্য। চতুর্দ্দিকে তাবেদারের অন্ত নেই। পাকশালায় চলছে দিনরাতের বিবিধ ভোজ্যের আয়োজন। এ আয়োজনে সোডা লেমনেড ফলমূলও বাদ যায়নি।

পূর্ব্বেই বলেছি গ্রামের নাম "ষোণবর্ষা"। গ্রাম ত ভারী—২।১ খানা দোকানঘর, একবস্তী পাহাড়ে কুলী। এরা ক্ষেতে কাজ করে, মজুরী তাদের দৈনন্দিন আহার, বস্ত্রের জন্য যৎকিঞ্চিৎ। কাঠুরেরা কাঠ কাটতে যায় দূর বনে, কেউ কেউ যাচ্ছে খয়ের প্রস্তুতের কাজে। জঙ্গলে খদির গাছ কেটে জ্বাল দিয়ে তৈরী করছে পান খাবার খয়ের। কুলীরা সেখানেও কাজ করে—এই কুলী আর ঠিকাদারের লোক সহর বা রেল ষ্টেশনে যাতায়াতের পথে কিনে নেয় গুড়-মাখানো মুড়কী, বিড়ি, চিঁড়ে আর আবশ্যকীয় চাল, তেল, নুন।

অদূরে বাঁয়ে "হস্তি বাড়িয়ার" জঙ্গল। খড়ের জঙ্গল। যতদূর দেখা যায় হাওয়ায় দুলছে দীর্ঘ খড়ের রাশি ৮।১০ ফুট উচ্চ। এর

ভিতরে দিবাভাগে আশ্রয় নেয়, বনের জানোয়ার, বাঘ, হরিণ, শূয়োর। হাতীর উপরে বসে এ খড়ের তলদেশের কিছুই নজরে আসে না। হাতীর চলার পথে তাড়া খেয়ে ছুটে যায় হরিণ, তাদের সাবলীল উল্লম্ফন, পলায়ন ভঙ্গী সহসা চোখে পড়ে—খড়ের জঙ্গলে ঢেউ খেলে যায়। এই সুবিস্তীর্ণ খড়ের জঙ্গল মিশে গেছে বনসীমায়, খড়ের ভিতরে বৃক্ষ লতা নেই। শুধু খড়, মাঝে মাঝে ২।১টী বাবলা বা আমলকীর গাছ।

পূব দিকে নদী। নদীতে জল নেই, শুধু বালুর রাশি। নদী পার হয়ে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল গহন অরণ্যের দিকে। তিনটি হাতীর পিঠে শিকারীরা বসেছে। আমার হস্তিনীর আরোহী—আমি, সাবিত্রী, শিকারে অশ্রান্ত উৎসাহী সোদরোপম কালুবাবু, একজন শিকারী ও মাহুত। এক হাতীতে মৃত্যুঞ্জয় ও অন্য লোকজন। অপর হাতীতে ভোলাবাবু ও ভাগবতবাবু। প্রত্যেক হাতীতেই আছে—এই জঙ্গল যাদের সুপরিচিত এমন গ্রাম্য শিকারী বা অরণ্যে পথপ্রদর্শক ও আকস্মিক বিপদে সাহায্যকারী দেহরক্ষী। শিকার এরা দেখতে পায় সকলের আগে —এদের অভ্যস্ত চোখ। শ্বাপদের পদশব্দ এদের কাণ এড়ায় না।

খানিকটা জঙ্গলে এগিয়ে যেতেই সঙ্গী শিকারী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। "শুনুন বাঘ ডাক্‌ছে।" তখনও ভোরের আলো রৌদ্র কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। অরণ্যের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে অপসারিত হচ্ছে ঈষৎ তরল অন্ধকার, কোথাও বিটপী শীর্ষে পড়েছে প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্য কিরণ। যে সব শ্বাপদ বেরিয়েছিল নৈশ অভিযানে—পল্লীর আশেপাশে অড়হর ক্ষেতে, তারা ভোরের আগমনে ফিরে যাচ্ছে তাদের আশ্রয় স্থলে গভীর অরণ্যে আর গুহাকন্দরে। স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি এই অদৃশ্য বিলীয়মান জানোয়ারের পশ্চাতে চলেছে আমাদের হাতী। এক হাতী থেকে

নেপাল সীমান্তে শিকার যাত্রা

—পৃঃ ১৫৬

অন্য হাতীর শিকারীদের দেখা যাচ্ছে না। আড়াল করে আছে অরণ্য আর ছোট পাহাড়। বাঘের সাড়া পেয়ে আমাদের হাতীর শিকারী হুইস্‌লের অনুকরণে শব্দ করলে জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যে তিনবার। ক্ষণিক সমস্ত নীরব—অদূরে পর পর অপর হাতীদ্বয়ে শিকারীর সাড়া পাওয়া গেল—এই একই আওয়াজ। ওদের গতি আর অবস্থান বুঝে নিয়ে আবার এগোল আমাদের হাতী। হাতী শুঁড়ে করে ভেঙ্গে দিচ্ছে অবরোধকারী শাখাপ্রশাখা—মহীরুহের সুউচ্চ শিখরে জড়ানো মজবুত স্থূল অরণ্য লতা টেনে নাবিয়ে দিচ্ছে নীচের জমিতে। এগুলো সরিয়ে না দিলে আরোহীর বিপদ। গাছের শাখায় দেখতে পাচ্ছি হনুমানের দল, লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে এক গাছ থেকে আর এক গাছে, আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কিচ্‌মিচ্‌ করে গালি পাড়ছে আমাদের। বন্দুক তুলতেই অবোধ্য অদ্ভুত শব্দে আমাদের মুণ্ডপাত করছে।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখচি রাস্তা রোধ করে দাঁড়িয়েছে পাহাড়—অনুচ্চ, সুউচ্চ কত পাহাড়—বন,—খেজুরে সমাচ্ছন্ন। দীর্ঘ সুউচ্চ বন, খেজুরের সরোবর—পর্ব্বতের সানুদেশে। খেজুর বলতে যারা বুঝবেন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো দেহ, নারিকেল গাছের মত সহজ দণ্ড, তাঁরা ভুল করবেন। মাটির কাছে গোড়ার দিকটা খানিকটা সেরকম বটে কিন্তু তার পরেই চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে এদের শাখা প্রশাখা, তাতে দুলছে উজ্জ্বল সবুজ কাঁচা বন খেজুর। এ গাছগুলি দেখতে পেলেই হাতী শুঁড়ে করে উপড়ে নিচ্ছে এর শিকড় সমেত সমুদয় গাছটি। পাহাড়ে ঠুকে ধূলোবালি সাফ্‌ করে ভেঙ্গে বার কচ্ছে ভিতরের শুভ্র নরম খাদ্য। শুঁড়ে করে তাই পূরে দিচ্ছে মুখের ভিতরে। গাছ পালার ভিতরে ডুমুর গাছ দেখলে তাও ভেঙ্গে দিয়ে টেনে মুখে পুরবে খস খসে পাতা সহ ডালপালা।

অরণ্যের শোভায় চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। অচেনা গাছ, অচেনা

লতার সঙ্গে হচ্ছে অন্তরের পরিচয়। খেজুরের ক্ষেত দেখে লাগে বিস্ময়। হঠাৎ শক্ত করে দড়ি ধরে বসতে হল—হাতী পাহাড়ে চড়ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপ হুঁসিয়ার হয়ে মজবুত করে নিয়ে পিছনের পা টেনে তুলচে উপরে। আমরা প্রাণপণে পিছনে পড়ে যাওয়ার বিপদ থেকে সাম্‌লে নিচ্ছি সামনের দিকে ঝুঁকে। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চড়ছি বাঘের অনুসরণে। কোথায় বাঘ, এ বিশাল অরণ্য সমুদ্রে কোথায় সে বিন্দু! আচ্ছাদনের অন্তরেই—গভীর খাদ পাহাড়ের উপর থেকে নেমে গেছে দিক হ'তে দিগন্তরে। তাদের হা-করা বিশাল বক্ষের তলদেশে গভীর আঁধার লতাতন্তুতে জটিল। এর আড়ালে হাজার বাঘ লুকিয়ে থাকলেও তার সন্ধান পাব না। তবু এগিয়ে চলেছি তাদেরি সন্ধানে। যদি হঠাৎ চোখে পড়ে, যদি অসীম অবজ্ঞায় পথপ্রান্তে সে আমাদের দাঁড়িয়ে দেখে, যদি ঝোপের আড়াল থেকে শুনতে পাই তার ক্রুদ্ধ শাসন। রাইফেলে গুলী পুরে রেখেছি। ভরসা আছে, সে শাসনে দিশেহারা হব না—মুখোমুখী হবে অরণ্যের শার্দ্দূল আর বিলেতী আগ্নেয় নালিকা। কিন্তু যাকে খুঁজছি সে কোথায়? হয়ত আমাদের আশেপাশে, ডাইনে বাঁয়ে কোথায় শুয়ে আছে সে অরণ্যরাজ উদগ্র চোখে উৎকর্ণ হ'য়ে, অদূরে নিক্ষিপ্ত রাত্রের শিকার, হরিণের বা শূয়োরের অর্দ্ধ-ভক্ষিত দেহ আগ্‌লে; পাছে বনের অন্য জানোয়ার কাছে এগোয়। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার উপস্থিতি তার অস্তিত্ব অনুমান কচ্ছি প্রত্যেক ঝোপে ঝাড়ে। তাই আমাদের দৃষ্টি সতর্ক—হাতীর গতি মন্থর, শিকারীর চোখ ইতস্ততঃ ধাবমান।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে শিকারী দেখালে দূরের আর একটী পাহাড়। ওরই সানুদেশে কি ভীষণ কাণ্ডই ঘটেছিল। কখন ঘটেছিল তার হিসাব সে জানে না। সে শিকারী ছিলেন ইংরেজ।

কোন মিশনারী সাহেব। শিকারের খেয়ালে বাঘের পিছু নিয়েছিল। বাঘ গেল কোন অরণ্যের আড়ালে—সঙ্গীদল সহ সাহেব খুঁজছেন সে নরখাদক বাঘ। সাহেব সামনে এগিয়ে গেছেন। অনুসরণ-কারীর দল সামান্য আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেলে। হৈ চৈ চীৎকার উঠল—সোরগোলে অদৃশ্য বাঘকে ভয় দেখানো। খানিকটা দূর যেতেই সামনে পাওয়া গেল সাহেবের হাত থেকে পড়ে-যাওয়া গুলী-ভরা রাইফেলটা। ও জিনিষটায় বাঘের কোন লোভ ছিল না—যাতে তার লোভ, তাকে মুখে করে বাঘ চলে গেছে—শেয়াল যেমন মুখে নিয়ে পালায় হাঁস কিম্বা মুরগী।

আমাদের হাতী এগিয়ে চলেছে পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম ক'রে। দুরারোহ পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে হাতী কেমন ক'রে আরোহী-সহ ঢালু বেয়ে শৃঙ্গে চড়ে যাচ্ছে, আবার মাথা নীচু ক'রে প্রত্যেক পদক্ষেপ পরীক্ষা ক'রে নীচে নেমে যাচ্ছে! মাহুতকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'হাতী পা পিছ্‌লে পড়ে যেতে পারেনা?'

মাহুত বললে,—'পারে বই কি?' পড়ে যাওয়ার দু'একটি উদাহরণও বললে। উঁচু পাহাড়ের ঢালু দেহে যখন শিথিল প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যথাস্থানে পা রেখে হাতীর আত্মরক্ষার চেষ্টা সন্তর্পণে চলেছে তখন কালুবাবু ও সস্ত্রীক আমি হাতীর পিঠে বসে এই বৃহদায়তন মূক জানোয়ারের গড়িয়ে পড়ার কল্পনা বিশেষ উপভোগ করিনি তা' বলাই অনাবশ্যক। হিমগিরি-সংলগ্ন এই পাহাড়ময় অরণ্যের গাম্ভীর্য্য আমাদের আবিষ্ট করেছে। চতুষ্পার্শে মহামহীরূহ বিশাল দ্রুমরাজি আকাশে মাথা তুলেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ ক'রে এমনি দাঁড়িয়ে আছে হয়তো কত শতাব্দী। সামনে ও মাথার ওপরে দুল্‌ছে অরণ্য-লতা, স্থূল ও দৃঢ়! নীরস পাথরের বুকে কোথায় আছে সে রসধারা যারা প্রাণ সঞ্চার ক'চ্ছে বৃক্ষের শিরায়

শিরায়, লতার দেহে! বিস্ময় ও সম্ভ্রমে স্তব্ধ হ'য়ে যাই, অন্তরে বন্দনা জাগে মহেশ্বরের উদ্দেশে।

দুপুরে আমাদের খাবার এল। ঝরণার পাশে শিলার ওপরে বিশ্রাম করছি। হাতীগুলি পাহাড় গহ্বরে সঞ্চিত জলরাশিতে নেমে খেলায় মেতেছে। উর্দ্ধে পাহাড়ের ওপরে অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী-পল্লী। খড়ের ছাউনী ছোট ছোট কুটীর, বাঘ ভালুক এই কুটীরবাসীদের প্রতিবেশী! বাবলা গাছের মত গাছ দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পেলাম এগুলো পান খাওয়ার খয়েরের গাছ—পাহাড়ীরা এই খয়ের গাছ টুক্‌রো ক'রে কেটে সিদ্ধ ক'রে রস বার ক'রে। আবার রস জ্বাল দিয়ে ঘন ক'রে মাটীতে ঢেলে দিয়ে পাটালীগুড়ের মত কেটে কেটে খয়ের তৈরী করে। শুনলাম এই অরণ্যের মালিক রামরাজা এই খয়েরের ব্যবসায়ী ঠিকাদারের কাছ থেকে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা "রয়ালটী" নিয়ে থাকেন। এক স্থানে দেখ্‌লাম মাটীর মুখ ঢাকা হাঁড়িতে বহু উনুনের ওপরে এই খয়ের গাছের নির্ব্বাচিত কাঠের টুক্‌রো বা রস ফোটানো হ'চ্ছে। নিকটের বিস্তৃত পরিচ্ছন্ন জায়গায় গরম ঘন রস ঢেলে দে'য়া হয়েছে, আস্তে আস্তে সেই রস জমে যাচ্ছে। আঙ্গুলে খানিকটা তুলে মুখে দিতে বেশ লাগল।

একটা শূয়োর ও হরিণ ছাড়া বিশেষ কোন জানোয়ার দেখা গেল না। রাত্রে তাঁবুতে ফিরেছি। তাঁবু ঘেরা জায়গার মাঝখানটিতে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার—খাটিয়াও রাখা হয়েছে। সামনেই কাঠের গুঁড়ি জ্বল্‌ছে। চা এল—সঙ্গে রাজধানীর বড় হোটেলের উপযুক্ত বিবিধ খাদ্য। পরদিন ভোরে আবার হাতীর পিঠে সেই অরণ্য যাত্রা। মাঝে মাঝে বিটিং হ'চ্ছে—কিন্তু জানোয়ারের সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধ্যায় রামরাজার ভাই—রাজা সাহেব এসেছেন; নেপালী রাজবংশীয় জেনারেল। তিনি

জানালেন পরদিনের ব্যবস্থা হবে রাজোচিত। বাঘ ভালুককে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হবে। রাজা সাহেব চলেছেন তাঁর হাতীতে—হাতে ম্যান্‌লিকার রাইফেল—ছোট হাল্‌কা রাইফেল। আমার হাতীতে কালুবাবু, আর অন্য গ্রাম্য শিকারী—বন্দুক ও রাইফেল দু'টী।

ঝাড়ু দেয়ার জন্য প্রায় ২৫০ শত লোক জমেছে—আশ্বস্ত হলাম—শিকার অব্যর্থ। আমাদের শিকারীদের বিভিন্ন গাছে তুলে দে'য়া হ'ল। আমি যে জায়গাটি নির্ব্বাচন ক'রেছি—তার পাশেই গভীর নালা। বীট্‌ আরম্ভ হলে এই রাস্তায় জানোয়ার আসাই সম্ভব। কিন্তু গাছের ডালে বসে শিকার আমার পছন্দ হোলো না। একটা উইয়ের ঢিবি বেছে নিয়ে তার আড়ালে বসে গেলাম—ডাইনে খানিকটা দূরে কালুবাবু। আমার বাঁ দিকে ৫০ গজ দূরে নালা—সেখান থেকে আরও দুই শত গজ দূরে বসেছে মৃত্যুঞ্জয়। সট্‌গানে সুদক্ষ। রাইফেল কখনও ব্যবহার করে নি। কিন্তু তার জায়গাটাই ফাঁকা মাঠের মত অরণ্যহীন।

বীট্‌ আরম্ভ হয়েছে। দূরে কোলাহল—বাদ্যোদ্যম শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল—হাতে রাইফেল। আমি বিরক্ত হ'য়েছি—"বীট্‌ আরম্ভ হয়েছে—তুমি নিজের জায়গা ছেড়ে চলে এলে কেন?"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব। বাঘ ভালুক দেখলে কি ফায়ার ক'রব?"

"ক'রবে বই কি! কিন্তু তোমার হাতে রাইফেল আমার পছন্দ হ'চ্ছে না। সট্‌গানে তুমি সুদক্ষ—সট্‌গান কোথায়?"

'সে আছে—হবে—যখন যেমন হয়—'

'তুমি এই খবর জিজ্ঞেস করতে এসেছ? যাও নিজের জায়গায় যাও, দেরী করো না—জানোয়ার আসবে যে…

"হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু বাঘ গুলী খেয়ে যদি আক্রমণ করে ?"

"একটু উঁচু ডালে জায়গা ক'রে নাও—বাঘ ঘায়েল হ'লে আমি এগিয়ে যাবো, ভয় নেই।"

মনে মনে ভাবছি—ওখানটায় বাঘ যাবেই না—কোন জানোয়ারই যাবে না। জানোয়ার যে আমার এই বাঁ দিকের নালা ধরে আসবে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় হেলে-দুলে দোদুল গতিতে এগিয়ে চল্‌ল—আমার বিরক্তি বেড়েই চলেছে—এ নন্দদুলাল—নন্দকিশোর বাবুর শিকারে আসাই বা কেন ? কি জানি হয়তো আহাম্মক জানোয়ার এই বেকুবের হাতেই মারা প'ড়বে। আশ্চর্য্য এই—শিকারে এসেছে কবিতার বই হাতে নিয়ে—এ লোকটি কি শিকারেও সিরিয়স্ নয় !

বীটারেরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমার সামনের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে একটা জানোয়ারের সতর্ক পায়ের শব্দ পেয়ে উৎকর্ণ হ'য়েছি—কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখতে না পেলে গুলী হবে কি ক'রে—মাঝে মাঝে শব্দ শুনছি—আবার সব নীরব। অদূরে বীটারদের কোলাহল ছাড়া কোন শব্দ নেই। হঠাৎ দুম্ ক'রে—সট্‌গান নয়—রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন। মৃত্যুঞ্জয় গুলী ছুড়েছে। সঙ্গী সেই মুহূর্ত্তেই বল্‌লে "বাঘ ! বাঘ !"

বাঘই তো বটে—কি ভয়ানক, মৃত্যুঞ্জয় ফায়ার ক'রেছে যে !

কিছু পূর্ব্বেই আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বাঘ ফায়ার হ'লে আমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব। আমার প্রতিশ্রুতি পালনের সময় এসেছে ! রাইফেল হাতে নিয়ে আড়ালের বাইরে এসেছি। সঙ্গী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে একটা জানোয়ার মৃত্যুঞ্জয়ের সম্মুখের দিক থেকে দূরের জঙ্গলের দিকে ছুটে পালিয়ে

যাচ্ছে—আর একটা গর্জ্জনও শোনা গেল ··এ বাঘ নয়, ভালুক। কিন্তু ভালুক পালিয়ে গেছে—আর ভয় নেই!

সামনের দিকে আবার খুস্ খুস্ শব্দ শুন্তে পাচ্ছি। এত সতর্ক পদক্ষেপ! বাঘই হবে!

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের ওদিক থেকে আবার গুড়ুম ক'রে সট্‌গানের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাপার কি—সমস্ত জানোয়ার মৃত্যুঞ্জয়কে চিনে নিয়েছে! মৃত্যুঞ্জয়ের বন্দুকের শব্দে আমার সামনের জঙ্গল থেকে ২।৩টি ময়ূর উড়ে গেল।···ঐ খুস্‌খুস্ শব্দের সতর্ক পদক্ষেপ যে কার তা' বুঝতে আর বাকী রইল না! কিন্তু ঐ নন্দকিশোরের ব্যাপারটা কি? সে কি ময়ূরের ওপর রাইফেল ছুঁড়েছে! ভালুকটাকে দ্বিতীয়বার ফায়ার করে নি কেন? আবার আরও দূরে বন্দুকের আওয়াজ—দুম্-দুম্-দুম-দুম্! আমি অসহিষ্ণু। আমার এদিকে কোন জানোয়ারই আসছে না!

বীটাররা খুব নিকটেই এসে পড়েছে। প্রত্যেক গুলীর সঙ্গে তাদের উচ্চ জয়ধ্বনি যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তাতে আমাদের উত্তেজনার আর সীমা নেই। আমার ক্ষিপ্র ও চঞ্চল চোখের দৃষ্টি প্রত্যেক ঝোপ-ঝাড়ে তীক্ষ্ণ অভিনিবেশ সহকারে জানোয়ার খুঁজছে।

বীট্ শেষ হ'য়ে গেছে। সামনেই বীটারের দল দেখা গেল। হতাশভাবে রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়েছি—সর্ব্বাগ্রে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখ্‌তে হবে! মৃত্যুঞ্জয় হাস্‌ছে—উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই—এক হাতে ইংরেজী কবিতার বই—অন্য হাতে রাইফেল। ছেলেরা খেলার নকল বন্দুক নিয়ে যেমন কাল্পনিক বাঘ মারে—মৃত্যুঞ্জয়ের রকমটা ঠিক তেমনি। আমার প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় বল্‌লে—"গাছের ডালে নয়—নীচে মাটীতে বসে বই পড়্‌ছি—সামনে একটু শব্দ পেয়ে দেখি বেটা ভালুক—আগে যেখানটায় বসেছিলাম—ঠিক

সেইখানে এসে হাজির। তাড়াতাড়ি গাছে না চড়লে আমায় ধরেই ফেলতো। যা হোক্—বড় জানোয়ার—হিংস্র জানোয়ার, তাই রাইফেল তুলে ফায়ার ক'রেছি।" 'আবার সেই হি হি হাসি!'

"হাস্‌ছ কেন? আবার ফায়ার করলে না কেন?"

"পারলাম কই! এ রাইফেলটার একটা দোষ আছে—স্প্রিংটা কাজ করে না—এ আমি আগেও দেখেছি!" সেই হি হি হাসি!

"স্প্রিং কাজ করে না—কি ভয়ানক—একটা গুলীই বেশ নিশানা ক'রে মারোনি কেন?"

"নিশানা ক'রেই তো মেরেছি—নিশানা আমার ভুল হয় না হুজুর—হি হি—হি হি! ঐ দেখুন না—নীল গাইটা শেষে মারলাম—ঐ যে পড়ে আছে।"

এই সময়ে বীটারদের চীৎকার শোনা গেল—"ভালুক মিল গিয়া—বহুত ডবল্ হায়"—

আমরা সোৎসাহে সেইদিকে ছুটে গেলাম ঠিক নিশানা হয়েছে। ভালুকটা গুলী খেয়ে ছ'শো গজ দূরে গিয়ে মরেছে!

সাবাস্ নন্দকিশোর বাবু। নন্দকিশোর বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসছে—হাতে বইখানা! সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসেছি। রাজা সাহেব মেরেছেন একটা হরিণ। ভোলাবাবুর হরিণ মাটীতে লুটিয়ে আবার উঠে ছুটে পালিয়েছে—সে তার পেছনে ছুটেও তাকে খুঁজে পায়নি। তার প্রথম শিকার—হতাশার আর অন্ত নেই!

বিকালে মৃত্যুঞ্জয় ও অন্য শিকারী মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল—রাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, সোডা-লেমনেড প্রভৃতি উপহার এসেছিল।

তাঁবুতে আমি একা—দারুণ শীত, লেপ গায়ে—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি; হঠাৎ খানসামার চীৎকারে লেপ ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছি।

খানসামা বলছে—“ব.ঠলে ''ঘ্! আমাদের রসুইখানার ঠিক সামনে—” 'ল। আ৻

বিশ্বাস হলোনা আমার। বন্দুকট.. ,এল্‌জি আর বল্ পুরে আমি ও সাবিত্রী বেরিয়ে এসেছি—কোলাহল আমার ইসারায় বন্ধ হ’য়ে গেল—সাবিত্রীর হাতে টর্চ।

খানসামা বল্‌লে—“ঠিক ঐখানটায়—ঐ দেখুন না—গুলীতে মারা জানোয়ার ক’টা পড়ে আছে—ওগুলোর লোভেই বাঘ এসেছিল।”

নেপাল সীমান্তের এই অরণ্য সমাকুল অঞ্চলে বাঘের আবির্ভাব সম্ভব বই কি! কিন্তু টর্চ নিয়ে বহু সন্ধানেও শেয়াল ছাড়া কোন জানোয়ার দেখা গেলনা।

রান্নাঘরের সামনেই জল পড়ে জায়গাটা পিচ্ছিল হ’য়ে গেছে—সেখানে লেপার্ডের পাঞ্জা স্পষ্টই দেখা গেল। একটা গাছের আড়ালে বন্দুক নিয়ে প্রতীক্ষা ক’রেও কিন্তু বাঘের পুনরাবির্ভাব হ’লনা।

গভীর রাত্রি—সকলে নিদ্রায় মগ্ন। চতুর্দ্দিকের অরণ্য থেকে একটা একটানা রিঁ রিঁ রিঁ রিঁ ঝিঝি পোকার আওয়াজের মত শব্দ, রাতের গাম্ভীর্য্যকে গভীরতর ক’রে তুলেছে। আমি চোখ বুজে এই পরিবেশ অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি—ভাবছি অদূরে ঐ জঙ্গল থেকে বাঘের আওয়াজ শুনতে পাব। আস্তে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে গেলে হয় না!··হঠাৎ শীতের স্তব্ধ সুষুপ্তি চিরে দিয়ে হি হি হাসির উচ্চশব্দ শুনে চমকে উঠেছি—কে হাসে···মৃত্যুঞ্জয় না! ওদের তাঁবুতে ওরা জেগে আছে নাকি? ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঐ তাঁবুর উদ্দেশ্যে। মৃত্যুঞ্জয় ও বাচ্চাবাবুর তাঁবুর রুদ্ধ পরদার ফাঁক দিয়ে একটা দীপরশ্মি দেখা যাচ্ছে। পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই লেপের ভিতর থেকে বই হাতে মৃত্যুঞ্জয় উঠে বসেছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে আপনি এই দারুণ শীতের রাতে উঠেছেন কেন ? তাড়াতাড়ি

আমি বল্লাম—"সে হোক্। অত জোরে হাসছিলে একাকী ?"

"কখন হাস্লাম ?"

"এই যে এখনি দু'মিনিট আগে"।

"তাই নাকি ? না ত! দেখুন না—এই পাখণ্ডী রাসবিহারীর কাণ্ডটা।" হাত থেকে বইখানা নিয়ে দেখলাম এই বিহারীবন্ধু পড়ছে, বাংলায় লেখা শরৎবাবুর 'দত্তা'। "এই বই পড়ে হাসছ বুঝি ? এত বাংলা বুঝতে পার ?"

"বুঝি বই কি ? বলতে পারি না—দেখুন না রাসবিহারী তার ছেলেকে বক্‌ছে—ছেলে ত' তার বাপের বৈষয়িক চাল বুঝতে পারে না—পাখণ্ডী বাপ আর তার বুদ্ধু ছেলে!" মৃত্যুঞ্জয়ের আচরণে আমিও খানিকটা হেসে তাঁবুতে ফিরে এসেছি, যখন ঘুম ভেঙ্গেছে তখনও অন্ধকার।

মাহুতদের ডেকে হাতী তৈরী করার হুকুম দিলাম—খানসামারা চা'র আয়োজন কচ্ছে।

আজ হস্তি বাড়িয়ার জঙ্গলে শিকার হবে।

তিনটা হাতীতে আমরা শিকারীর দল খানিকটা জঙ্গল খুঁজে খড়ের জঙ্গলে ঢুকেছি। উঁচু খড়ের সমুদ্র। হাতীর পিঠে আমরা বসেছি আমাদের পা ছুঁয়ে খড় মাথা তুলে আছে, মাঝে মাঝে বন্য আমলকী গাছে সুপক্ক লাল আমলকী ফল ঝুলে আছে। আমরা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পূরছি তেষ্টা পেলে খেতে বেশ লাগে।

খড়ের সমুদ্রই বটে! বাতাসে খড়গুলো আন্দোলিত হ'চ্ছে কিন্তু খড়ের মূলের দিকটা কিছুই দেখা যায় না। জানোয়ার কোথায় নজরে আসবে কি ক'রে! হঠাৎ ডান দিকে খড়ের জঙ্গলে আলোড়ন দেখা গেল, মনে হ'ল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ঐ

ছেদহীন খড়ের রাশ ঠেলে একটা জানোয়ার ছুটে যাচ্ছে। আমাদের সংশয় ঘুচে গেল। আন্দোলিত খড়ের রাশির ওপর আন্দোলিত ব্রাউন দেহ নজরে এল। ওটা একটা হরিণ, কিন্তু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বটে। পেছনে তাড়া করায় স্পোর্ট আছে। হাতীর গতি দ্রুততর ক'রে তিনদিক ঘুরে আমরা পিছু নিয়েছি কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

মাথার ওপর অপ্রখর সূর্য্যালোক। চতুষ্পার্শ্বের অরণ্য সূর্য্যালোকে বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে···খড়গুলিও সূর্য্যের স্পর্শে পুলকিত। মনে হ'চ্ছে বন্য জানোয়ার শিকার আমাদের উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা ছুটেছি সুন্দরের সন্ধানে—তারই আকর্ষণে—তারই ইসারায়। আজ তার হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সূর্য্যরশ্মিতে—এই বাতান্দোলিত খড়-সমুদ্রে···মাথার ওপর সীমাহীন ঐ নীল আকাশে আর ঐ দূরে অভ্রভেদী বরফে মণ্ডিত হিমালয়ের চূড়ায়। শিকার পর্য্যটন না হ'লে এমনি ক'রে হয়তো আমাদের আরণ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করা হ'তোনা। আবার ভাব্‌ছি এই অরণ্যপ্রান্তে যারা বাস করে তারা সুখী, প্রয়োজন তাদের যৎসামান্য। ক্ষেতের ভুট্টা ও অড়হরে তাদের ক্ষুধা মেটে—বনের শুকনো কাঠ কুড়িয়ে চলে এদের রান্না ···মহুয়ার মদ পান ক'রে এরা সন্ধ্যায় নাচে, গান গায়, সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ আর ধরে না। বাহিরের বিশ্বজগতে কোথায় চল্‌ছে ষড়যন্ত্র, সন্দেহ আর কানাকানি···যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতির জটিলতা—এদের কানে তা' পৌঁছয় না।

হঠাৎ সামনের খড়ের ভিতর একটা জানোয়ার ছুটে পালাচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একবার চকিতে জানোয়ারের খানিকটা দেখতে পেয়েই গুলী ছুঁড়েছি। মনে হ'ল ওর গতি মন্দীভূত হ'য়েছে, কিন্তু একেবারে মরেনি। মাহুতকে তাগিদ দিচ্ছি হাতী জোরে চালাও। খড়ের আন্দোলনে এক একবার জানোয়ারের

মৃদুগতি বোঝা যাচ্ছে—আবার সব নীরব। অদূরে খড়ের জঙ্গল শেষ হ'য়ে অরণ্যের স্বাভাবিক ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। একজন পাহাড়ী আমাদের বন্দুকের শব্দে হঠাৎ কোন্‌দিক থেকে উপস্থিত হ'য়েছে—সঙ্গে একটা কুকুর। কুকুরটা চঞ্চল হ'য়ে জঙ্গল শুঁকছে আর মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে ক্রোধ প্রকাশ করছে। হঠাৎ একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে আমরা বুঝতে পারলাম জানোয়ারটা একটা বন্য বরাহ। কুকুরটা একটা ঝোপের কাছে এগিয়ে যেতেই আহত শূকর ক্রোধে গর্জ্জন করে কুকুরটাকে ধমকাচ্ছে। কুকুরটাও আবার পিছিয়ে গিয়ে বারংবার তেড়ে আস্‌ছে। হাতী এগিয়ে এল। ঝোপের আড়ালে আহত প্রকাণ্ড শূকর—আর একটা গুলী করা হ'ল—তারপর সব নীরব।

শিকারপুরে আমাদের মোটর পৌঁছালো—গৃহকর্ত্তা জমিদার অবধেশবাবুর প্রাঙ্গণে! অবধেশবাবুর ভ্রাতা ভাগবৎবাবু এবং তাঁর পুত্র বাচ্চাবাবু ছিলেন আমাদের এই শিকার পর্য্যটনের সঙ্গী এবং সমস্ত ব্যবস্থার পরিচালক। এই উপলক্ষ্যে এবং আমার কর্ম্মজীবনের ভ্রমণ সময়ে বিহারের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার যে পরিচয় পেয়েছি তার আভাস না দিলে এ ভ্রমণকাহিনী অসম্পূর্ণ।

আমাদের রওনা হবার সময় হ'ল। গৃহস্বামী অবধেশবাবু করযোড়ে আমাদের মোটরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একখানা বড় থালায় একটি লোক নিয়ে এসেছে সেরখানেক আতপ চাল-খানিকটা সিঁদুর ধান-দুর্ব্বা, কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ও একখানা বেনারসী শাড়ী। গৃহস্বামী আমার সহধর্ম্মিণীর সামনে যুক্তকরে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করছেন তার মর্ম্ম এই—"মা তুমি আনন্দময়ী, তুমি দয়া ক'রে এসেছিলে, আনন্দের কোলাহলে আমার কুটীর পূর্ণ ক'রে দিয়েছিলে, আজ আমাদের দুঃখ দিয়ে তুমি যাচ্ছ। তোমাকে তো

যেতেই হবে···তুমি যাও···কিন্তু এমনি কোরে আমার কুটীরে আবার তুমি এস !"

অবধেশবাবুর অতিথি সেবায় ভাগবৎবাবু ও বাচ্চাবাবুর যত্নে আমরা ধন্য হ'য়েছি—আমাদের চোখে জল এল।

বিহারের প্রাচীন অভিজাত পরিবারের এই সত্যিকারের রূপ। শুধু অভিজাত পরিবার ব'ল্লে যথার্থ হয় না—নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের শিষ্টাচারের এই আভিজাত্য দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। ভারতীয় মর্য্যাদা ও আতিথ্যের সত্যকার রূপ যদি আজও কোথাও সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে, সে এই বিহারের পল্লীতে। কর্ম্ম উপলক্ষে, বহুবর্ষব্যাপী আমার বিস্তৃত ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁদের আতিথ্যের এই সাধারণ নিয়মের আমি এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও লক্ষ্য করি নি। আজ অভাবের তাড়নায় প্রাদেশিক স্বার্থদ্বন্দ্বে যে বৈষম্যের উদ্ভব হ'য়েছে তা সহরেই সীমাবদ্ধ—তুচ্ছ চাকরী নিয়ে বিরোধ আছে। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ বিহারী প্রয়োজনের তাগিদে তার স্বাভাবিক অধিকার দাবী করছে। কিন্তু বাঙ্গালী দাবী করছে তার অধিকতর শিক্ষার অধিকারের। সহরের এই বিরোধ বর্ত্তমান অন্নসমস্যার যুগে অনিবার্য্য।

চট্টলে—হাতী খেদা

দোহাজারী ও হাজারি খিল

চট্টগ্রামে আমার শিকারের কোন বিশেষ আয়োজন ছিল না। প্রিয় বন্ধু ডক্টর এ. টি. সেন আমাকে জানিয়েছিলেন চট্টলের জঙ্গলে কালবাঘ আছে। ম্যান ইটারের দৌরাত্ম্যও আছে। অফিসের কর্ম্ম উপলক্ষে চট্টগ্রাম যেতে হ'ল। বন্দুক ও রাইফেল সঙ্গেই ছিল। ভেবেছিলাম বাঘের খবর পাইত' বহুৎ আচ্ছা—না পেলে জঙ্গলে বেড়াব। বনের মর্ম্মরে যে ভাষা ফোটে তার সাড়া জাগে সমস্ত অন্তরে। কান পেতে শুনব সেই অরণ্যের ভাষা।

চট্টগ্রাম পৌঁছে বাঘ শিকারের ভরসা আর ছিল না, কিন্তু অরণ্যের আকর্ষণ ছিল তুর্নিবার। তাই একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শচীন ধর ও অমলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়'লাম।

চট্টগ্রামের অরণ্য অঞ্চল। ষ্টেশনটির নাম দোহাজারী। আমরা রাত দশটায় ষ্টেশনে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে রাইফেল, গান, গোলা-গুলীর বোঝা দেখে ষ্টেশনের কুলিরা জানালে দোহাজারীতে "রোগ" (Rogue) হাতী আছে।

আমি বল্‌লাম—"দোহাজারীতে হাতী আছে?"

—"আছে বই কি? এগিয়ে দেখুন, জঙ্গলে খেদা করে কত হাতী ধরা হয়েছে।"

শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি নেই। খানিকটা এগিয়েই বহু হাতী দেখতে পেলাম। অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাটটা হাতী; চার পায়ে ছোট ছোট মোটা দড়ি বেঁধে বড় গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছোট, বড়, রাশি রাশি সচল পাহাড়। কয়েকটা নেহাৎ

শিশু হাতীও দেখতে পেলাম, বাপ, মা, মেসো, পিসের সঙ্গে এরাও ধরা পড়েছে। বহুদিন অনশনের পরে কলা গাছের ফালি পেয়ে এরা পরম ক্ষুধায় মনের আনন্দে তাই চিবুচ্ছে। কিন্তু খেদা করে ধরা এই বন্য ঐরাবত-যূথ যে কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের তাকিয়ে দেখছিল সে তাদের বুনো স্বভাবেরই পরিচয়। শিশু গণেশের দল কিন্তু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক; কলাগাছের ফালি শুঁড়ে করে মুখে পুরছে আর চোখ ট্যারা করে আমাদের দেখছে।

শুক্লা চতুর্দ্দশীর মধ্য রাত্রি। জোৎস্নালোকে কার্পণ্যের লেশটুকু নাই। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নাধারা এই আম্র-কাননের ভিতরে অপূর্ব্ব ছায়ালোক রচনা করেছে। নিশীথের এই নীরব পল্লীপ্রান্তে ছায়ালোকে বিচিত্র এতগুলো দুর্দ্দান্ত হাতী এক সঙ্গে দেখে "দোহাজারীর" অরণ্য অঞ্চল আমার চোখে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কি উপায়ে এত হাতী এক সঙ্গে বন্দী করা হয়েছে জানতে কৌতূহল হ'ল। আমার প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ধর খেদা করে হাতী ধরার কৌশল বর্ণনা করলেন।

হাতী ধরা যাদের ব্যবসা তারা সরকারী লাইসেন্স সংগ্রহ ক'রে হাতীর বিচরণ-ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে একটি মজবুত বেষ্টনী নির্ম্মাণ করে। উঁচু পাহাড়ের নীচে মোটাসোটা কাঠের উঁচু রেলিংএর মত এই বেষ্টনী। রেলিংএর বাইরের দিকে গজালের মত সূক্ষ্মাগ্র লোহা এমনভাবে ঠোকা হয় যার ধারাল তীক্ষ্ণ ভাগ বেষ্টনীর ভিতরের দিকে অনেকটা বেরিয়ে থাকে। এর পরে কৌশলে "খেদা" আরম্ভ হয়। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর কৌশলে অসতর্ক হাতীর পাল বেষ্টনীর প্রশস্ত ফটকের রাস্তায় ঢুকে পড়তেই ফটকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। পালাবার রাস্তা বন্ধ বুঝতে পেরে হাতীর পাল বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে কিন্তু রেলিংএর গায়ে তীক্ষ্ণমুখ গজালে আহত হয়ে অন্যত্র ছুটে গিয়ে আবার আহত হয়। একমাস বা দুইমাস

এদের কোন আহার্য্য ও পানীয় দেওয়া হয় না। ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট হাতীর উপরে চলে তখন বর্শা ও বল্লমের আঘাত; ঘন ঘন বন্দুকের গুলীর আঘাতও চলে। হাতীর রুষ্ট গর্জ্জন, আর্ত্তনাদ ও উল্লম্ফনে জেগে ওঠে মহা প্রলয়। ছুঁচোল লোহার ঘায়ে রক্তাক্ত ও জর্জ্জরিত দেহে আবার আসে বল্লমের আঘাত। সমস্ত ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত নিদারুণ। ক্ষুৎক্লিষ্ট, শ্রান্ত এবং জীর্ণদেহ হাতীকে তখন "ক্যাচ" করা আরম্ভ হয়; অর্থাৎ পোষা হাতীর সাহায্যে একে একে বন্দী করা হয়। এক একটা হাতীকে দুই দিক থেকে দুটো বড় পোষা হাতী চেপে ধরে; কৌশলে হাতীর পায়ে তখন মজবুত দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হয়।

মানুষ আপন প্রয়োজনে মূক প্রকৃতিকে শাসন করছে; আকাশের বিদ্যুৎ ধরে কাজে লাগিয়েছে; নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করেছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে বনের প্রাণীকে শায়েস্তা করার যে কাহিনী শুনলাম তা' নিতান্তই মর্ম্মন্তুদ।

এই হাতীর পালকে নভেম্বর মাসে বিহারে শোনপুরে চালান করা হয়। ভারতের সর্ব্বপ্রান্ত থেকে—রাজপুতানা থেকে, এমন কি কাবুল থেকে—ক্রেতা আসে। আরাকানের বুনো হাতী চলে কাবুলের গিরিসঙ্কটে, রাজপুতানার সামন্ত নৃপতির শোভাযাত্রায়—স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারে ভূষিতা গরবিনী।

হাতীধরার কাহিনী শুনতে শুনতে নদীতীরে এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে নৌকো করে শঙ্খনদী ধরে আমাদের ফরেষ্ট বাংলোতে পেঁাছুতে হবে। ষ্টেশনের অদূরে অত্যুচ্চ তটভূমির নিম্নে নৌকাঘাট। এ কেমন নৌকো? দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তৃতি নাই; এক একটা গোটা গাছের লম্বা কাণ্ডের এক দিকটা খুঁড়ে ফেলে দিয়ে এ নৌকো তৈরী হয়েছে। স্বল্পসলিলা স্রোতস্বিনীর ঘাটে এমনি বহু নৌকো যাত্রীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছোট ছই-এর বাইরে কয়েকটা "হোল্ড অল"

ফেলে আমরা তাতে বসেছি। নাতি-প্রশস্ত এই পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর দুই পাড়ে কোথায়ও পাহাড়ে চাষীদের কুটির, কোথায়ও বা নিরবচ্ছিন্ন অরণ্য ও পাহাড়। জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত অরণ্য প্রকৃতি মায়াপুরীর মত মনে হচ্ছে। অজানা দেশ, অজ্ঞাত লক্ষ্যের অদ্ভুত পরিবেশে আমরা আছি ডুবে; দূরে চোখে পড়ছে আরাকানের পর্ব্বত শ্রেণী। আরাকানের এক রাজকুমার 'কংলা' আমার বাল্যবন্ধু। শুনতে পেলাম সে বর্ত্তমান রাজার খুল্লতাত। মাঝি বলছে—কংলা রাজা বড় ভাল। শুনে আনন্দ হল; ইচ্ছে হচ্ছিল এই পাহাড় অরণ্য অতিক্রম করে ছুটে যাই কংলার কাছে; উভয়ের জীবনের পুঁথি খুলে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে কে কি ছবি এঁকেছি তার আলোচনা করি।

জল অগভীর। মাঝি লগী ঠেলে নৌকো চালাচ্ছে। কখনও বা জলে নেমে নৌকো ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বিলম্বে আমার আপত্তি নেই। রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতীত প্রায়; ফাগুনের শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত আজ রূপে রসে টলমল, আনন্দে বিহ্বল। আমার অন্তরেও লেগেছে তার পরশ।

একটা পাহাড়ের নীচে আমাদের নৌকো বাঁধা হল। মাঝি বললে, ঐ পাহাড়ের ওপরেই ফরেষ্ট বাংলো। পাহাড়ের দেহে ঘুরে ঘুরে ওপরে রাস্তা উঠেছে। ছোট্ট একটু ফসলের ক্ষেতের পাশে এসে পৌঁছুতেই একটা অদ্ভুত শব্দ হল; মানুষের কণ্ঠ— "ইন্দে, ইন্দে"; পরে বুঝতে পেরেছি "ইন্দে" মানে "এই দিকে।" ছোট্ট পাতার তৈরী চালার নীচে এক চাটগেঁয়ে বৃদ্ধ কৃষক তামাক খাচ্ছে; সে আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দিলে। এই প্রসঙ্গে একতারা জঙ্গলে বিরোরী বেদেদের ভাষা স্মরণ হল। তারা পাহাড়কে বলে "বুড়ো"; "বুড়ো হান্না" অর্থাৎ, পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে বীট্ করো; "বুড়ো চেত্তন" মানে ভুলে গেছি। পাহাড়কে যে এরা "বুড়ো" বলে

তা নিতান্ত নিরর্থক নয়। হাজার হাজার বছর যারা প্রকৃতির সহস্র ঝঞ্ঝাবাত্যা বুকে বয়ে অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের চেয়ে বুড়ো কে ?

কাঠের তক্তার প্লাটফর্ম্মের ওপরে কাঠের ফ্রেমে বাঁশ ও চাটাই দিয়ে তৈরী চমৎকার বাংলো। গ্রীষ্মে গৃহের স্নিগ্ধতা রক্ষার জন্য দেয়ালে মসৃণ শীতলপাটি লাগানো হয়েছে। টেবিল, চেয়ার, আরাম কেদারা যথাস্থানে সজ্জিত। বাংলোর চতুর্দ্দিকে অরণ্য ; অরণ্যের লতাপাতা বারান্দা ছুঁয়ে আছে। গরম চা আর কিছু জলযোগ করে শয্যাগ্রহণ করেছি। একটা রাতের পাখী ডেকে চলেছে অশ্রান্ত ; অদূরে একটা বার্কিং ডিয়ারের ডাকও শোনা যাচ্ছে।

ভোরের বনপথ ধরে চলেছি। চতুর্দ্দিক থেকে শোনা যাচ্ছে বনকুক্কুটের আওয়াজ। হরিণ দৃশ্যপথে এসেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের গায়ে একটা হরিণ নিবিষ্ট হয়ে কি যেন খুঁজছে। লোভ সম্বরণ করা গেল না ; সট্‌গান্‌ তুলে ফায়ার করতেই ওটা পড়ে গেল। সঙ্গীদের কৌতূহল আর আনন্দের অবধি নেই ! কিন্তু আমার শিকারীচিত্ত খুঁজছে অন্য জানোয়ার। বীট করে একটা বন্য বরাহ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না।

অপরাহ্ণে আবার জঙ্গলে বেরিয়েছি। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যত্নে বীটারের অভাব নেই কিন্তু বাঘ বা "রোগ" হাতীর কোন সন্ধান মিলল না। একটা লঙ্কাক্ষেতের ভিতরে হাতীর পদচিহ্ন দেখতে পেলাম। শুনলাম একদিন পূর্ব্বে সে এই পথে বিচরণ করেছে ; লঙ্কা ক্ষেতের পদচিহ্ন তার সাক্ষী। শুনতে পেলাম হাতী খেদার পরে এদিকে বুনো হাতী সাক্ষাতকারের কোন সম্ভাবনা নাই। রাত্রে জ্যোৎস্না-প্লাবিত বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে চা খাচ্ছি। সমগ্রদিনব্যাপী জঙ্গল ভ্রমণের শ্রান্তির লেশটুকু নাই। শিকারের

চিন্তা অতিক্রম করে মনের মধ্যে ভিড় করেছে চট্টগ্রামের একটি দৃশ্য।

ডাকবাংলোতে সৈন্যসংগ্রহের জন্য রিক্রুটিং অফিসার এসেছেন। দলে দলে লোক নাম লিখিয়ে নিচ্ছে। একটা গর্ব্বের অনুভূতি অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছে—শৌর্য্যের আহ্বানে বাঙ্গালী সাড়া দিতে শিখেছে! তবু একটুখানি সংশয় মনের কোণে উঁকি মারছে; এদের এই উৎসাহের পশ্চাতে দুর্ভিক্ষের তাড়না নাই ত! দেশের দারুণ অন্নাভাবের পেছনে কোন কৌশল? হয়ত এ জাতটা একেবারে মরে যায় নি; হয়ত এমনি করেই অদূর ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাংলার যুবক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে—অত্যাচারীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে দুর্ব্বলকে; বাংলার শৌর্য্যকে প্রণতি জানাবে দূরদূরান্তরের দূত; নতজানু হয়ে প্রার্থনা ক'রবে মৈত্রী, প্রীতি, বন্ধুত্ব।

ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপরে মিঃ চৌধুরীর আফিস ও বাসস্থান। একটি ছোট চা-বাগানের মালিক। বাঙ্গালী যুবক স্বগ্রাম ও স্বজন দূরে রেখে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়ে অরণ্য-জীবন বরণ করে নিয়েছে ভেবে পুলকিত হ'লাম। প্রায় দেড় শতাধিক টর্চ-ব্যাটারীর সাহায্যে রেডিওতে জঙ্গলে বসে ইনি দেশবিদেশের সংবাদ নিচ্ছেন, সমাজের সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রছেন। মনে পড়ছে আমেরিকা-প্রবাসী কয়েকজন ছাত্রের জীবন। অর্থাভাবে এঁরা দীর্ঘ ছুটির অবসরে পাহাড় ভেঙ্গে, পাথর ভেঙ্গে অর্থোপার্জ্জন করেন। এই উপার্জ্জিত অর্থে এঁদের প্রবাসে অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়। ভাবছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রগণ অপরের অর্থ-সাহায্যে নির্ভর না করে ছুটির সময়ে দৈহিক শ্রমে অর্থাগমের পন্থা খুঁজে নেয় না কেন? আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সহরের বাহিরের জ্ঞান এবং আইডিয়া অপরিসর।

তাঁদের উৎসাহ ও নেতৃত্বে ছাত্রগণকে কর্ম্মদক্ষ করে গড়ে তোলা কি কি অসম্ভব ? যে সকল ছাত্রের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তারা স্বল্প অবসর সময়েও অরণ্যপ্রান্তে ক্যাম্প লাইফের আনন্দ লাভ করে না কেন ? থিয়েটার, সিনেমা ও রেস্তোরাঁর ব্যয়ত' অকিঞ্চিৎকর নহে। হয়ত উৎসাহ, প্রেরণা ও নেতৃত্ব লাভ করলে উৎসাহশীল যুবকের অভাব হবে না। আহারের আহ্বানে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

হাজারীখিল ফরেষ্ট আফিস নাজিরহাট রেল ষ্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে। গরুর গাড়ীর চাকায় বিধ্বস্ত বন্ধুর পথে ট্যাক্সিতে নাগরদোলায় দুলে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছেছি। সুউচ্চ পাহাড় ; পাহাড়ের উপরে ফরেষ্ট-বাংলো দেখা যাচ্ছে। এখানেও পাহাড় ঘুরে ঢালু রাস্তা উপরে উঠেছে। রাস্তার দুই পাশে সেগুন ও চাপলাশ গাছ। এই চাপলাশ গাছের সঙ্গে আমার পরিচয় নূতন। গাছগুলি দেখতে কতকটা কাঁঠাল গাছের মত। কিন্তু এর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি অসাধারণ—একটা পুরাণো গাছ, প্রকাণ্ড মহীরুহ। ফরেষ্ট-আফিসের আসবাবগুলি এই কাঠে তৈরী। আমেরিকান দেবদারু কাঠের মত এর রং অনেকটা সাদা।

শ্রেণীবদ্ধ চাপলাশ গাছের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা পাহাড়ে উঠেছে ; এই দিবা দ্বিপ্রহরেও রাস্তাটি ছায়াস্নিগ্ধ মনোরম। উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে বাংলোটি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সেই কাঠের তক্তার প্লাটফর্মের উপরে প্রশস্ত কামরার সামনে বহু প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় কেদারায় বসে চতুর্দ্দিকের অরণ্য-দৃশ্য চমৎকার। আশেপাশে বহু পাহাড়ের উপরে বিরাট বনস্পতি। তাতে ঝুলছে স্থূল অরণ্যলতা। ঐ লতা ধরে ঝুলে মহীরুহের উচ্চ মগডালে পৌঁছানো চলে। হয়ত জীবনের অপরাহ্নে পদার্পণ না করলে সে সাধ অপূর্ণ থাকত না। বাংলোর উঁচু বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়ে

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। নিকটে ও দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়; পাহাড়ের ওপরে আবার পাহাড়শ্রেণী; সমস্ত পাহাড়গুলি অরণ্যাচ্ছন্ন; মনে হল মেঘের কোলে শুয়ে এই দৃশ্য দেখছি। পাহাড় অরণ্য দূর দিকচক্রবালে মিশেছে। নিরবছিন্ন অরণ্যের দৃশ্যও চমৎকার। পাহাড়ের গাছগুলি এত বিশাল ও বিরাট যে, মনে হল এরা সহস্র বৎসরের পূরাতন। এদেশের নামগুলিতে হাজারী শব্দের যোগ রয়েছে। প্রাচীন কালের দু'হাজার সৈন্যের, দশ হাজার সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষদের গ্রেড্ অনুসারে ভূখণ্ডের এই নাম।

আট-মাইল ব্যবধানের বারাইঢালা বাংলো থেকে রেঞ্জার সুরেশবাবু আমাদের জন্য বাবুর্চি খানসামা ও বিবিধ সাহায্য পাঠিয়েছেন। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের কোলে বসে অরণ্য-পরিবেশে স্নিগ্ধদেহ সুরেশবাবুর প্রেরিত আহার্য্য ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি। আমার সঙ্গী অমল ও মিঃ ধর। শিকারে তাদের উৎকট আগ্রহ নেই; কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এবং রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যে তারাও পুলকিত।

দু'দিন ধরে জঙ্গলে বীট হল—সকালে ও অপরাহ্নে। সময়. ও বীটার শিকারের উপযোগী নয়। বীটারেরা খুঁজছে হরিণ; আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি নেই, উদ্দেশ্যের ঐক্য নেই; তাই দুএকটা হরিণ বা শূয়োর বেরোতেই তাদের যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে আমার সায় নেই। একবার একটা উত্তেজনা সুরেশবাবুকে চঞ্চল করে তুলেছিল—সাময়িকভাবে শিকারের থ্রিল উপলব্ধি করেছি। বীটার কর্ত্তৃক তাড়িত একটা প্রকাণ্ড টাস্কার শূয়োর ঠিক সুরেশবাবুকে চার্জ্জ করে ছুটে এসেছিল; দৈবাৎ তিনি রক্ষা পেয়েছেন। দূর থেকে আমরা জানোয়ারের স্বরূপ দেখতে পাই নি; ভেবেছি হয়ত বাঘ বা ভালুক। লোকজনের উচ্চ

চীৎকারে রাইফেল নিয়ে অর্দ্ধেক পথ ছুটে আসতেই শুনতে পেলাম আক্রমণকারী জানোয়ারটি অদৃশ্য হয়েছে।

রাত্রে নৈশ-ভোজনের পর বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে আছি। ঘন ঘন হরিণের ডাক শুনছি, আর একটা একটানা আওয়াজ অরণ্য পতঙ্গের। এই আওয়াজ আমাকে বাইরের দিকে টানছে; ইচ্ছে হচ্ছিল জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে বেড়াই কোথায় কি জানোয়ার লুকিয়ে আছে। বার্কিং ডিয়ারের ডাক শুনে মনে হচ্ছে এ কোন বড় জানোয়ার দেখেছে। আমাদের বাংলো পাহাড়ের চূড়ায়। অরণ্য খুঁজতে হলে বহুদূরে নীচে নেমে যেতে হয়। অরণ্যে পথও জানা নেই। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে আমার নেপালী পার্শ্বচরকে তুলে নিলাম। টর্চ ও বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে বেরোব। ভ্রাতুষ্পুত্র অমল আমার সঙ্গী হ'ল। বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখি মিঃ ধরও সশঙ্কে আমাদের পিছু নিয়েছেন।

নীচে জোৎস্নার আলো নেই রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও উঁচু নীচু। ডানে বাঁয়ে গভীর খাত; তাও অরণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে টর্চের আলো দেখাচ্ছে নেপালী গোপাল সিং। ঢালু পথ বেয়ে একবার ওপরে উঠছি, আবার উৎরাইপথে নীচে নেমে যাচ্ছি। সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের রাস্তা আরাকানের দিকে চলেছে।...হঠাৎ দু'বার বিকট আওয়াজ শুনে সকলে চমকে উঠেছে; কিন্তু আমি জানি এ আওয়াজ বার্কিং ডিয়ারের। টর্চ নিয়ে জঙ্গল খুঁজে তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। একটা জায়গায় টর্চ নিভিয়ে দিয়ে বসে গেলাম নিস্তব্ধ অরণ্যের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করতে। বেশ লাগলো—অপূর্ব্ব এক অনুভূতি। অজানা দেশ, অজানা অরণ্যের যাদু আমায় আচ্ছন্ন করেছে।

বাংলোতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। ঊর্দ্ধ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের আর সীমাপরিসীমা নেই—"তন্দ্রাহারা শশী, আকাশ

পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।” ভোরে আমাদের ফিরে যেতে হবে সহরে।

শিকার পাই নি, কিন্তু আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। রাত্রে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে হাজার বছরের পুরানো অরণ্য-প্রতিবেশের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রা ; দুপুরে ঘনপল্লবের গাঢ় ছায়ায় বন ভ্রমণ। হাওয়ায় ইতস্ততঃ “শুকনো পাতা ঝরে যায়”, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। এরা উতলা হয়েছে দূরাগত বসন্তের বাঁশী শুনে। আশেপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সেগুন, জারুল ; বনের ছায়া গাঢ়তর করে মুরলী বাঁশের ঘন কুঞ্জ ; মাঝে মাঝে “শালপ্রাংশু মহাকায়” সম চাপলীশ বৃক্ষশ্রেণী।

ভোলার জঙ্গলে—প্যান্থার শিকার

পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রাচীন সহর। এর কয়েক মাইল উত্তরে—সুদূর প্রসারী প্রান্তর ও অরণ্য। আরও উত্তরে এই বিস্তৃত অরণ্য আসামের পাহাড়ে মিশেছে। প্রান্তরের অধিকাংশই বসতি বিরল—যেখানে দু'একটি মাটীর কুটীর বা ছোট পল্লী সেখানে চাষী গৃহস্থের বাস আর তাদের ঘিরে আছে শাল বা গজারী বন, কোথাও বা ছোট ছোট গাছের দুরতিক্রম্য আগাছার জঙ্গল। এ জঙ্গলগুলি লেপার্ড ও প্যান্থারের আবাস। বাঘের গ্রাস থেকে পাড়াগাঁয়ের চাষীদের গরু বাছুর সাম্‌লে বাস করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কলেরা ও অন্যান্য মহামারীর উপদ্রবের মত এই বাঘের উপদ্রবও তাদের গা-সহা হ'য়ে গেছে। এ দিকের বাঘের দুঃসাহসের সীমা নেই। সকাল, বিকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এরা নির্ভয়ে বিচরণ করে, রাখালের সমুখেই গরুর পাল আক্রমণ করে এবং দু'চারটা জখম করে, একটাকে মুখে ক'রে নিয়ে পালায়। কৃষকদের দল কোলাহল তুলে বাঘকে তাড়াবার চেষ্টা করে, টিন ক্যানেস্তারা বাজায়। বাঘের তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। নূতন জামাইবাবুর পক্ষে শালাজ-শ্যালিকাদের ক্ষুদ্র উপদ্রব ও হাস্যপরিহাসের মতই বাঘের কাছে এই আস্ফালন ও কোলাহল হাসি ঠাট্টার সমতুল্য!

কখনও দুঃসাহসী যুবকের দল গ্রাম্য অস্ত্র-শস্ত্র, মাছ মারা যূথী, বল্লম নিয়ে জঙ্গল ঘিরে বেশী বাড়াবাড়ি করলে অতি উচ্ছৃঙ্খল শালা-শালাজকে দু'একটা থাপ্পড়, থাবা বা দ্রংষ্ট্রাঘাত ক'রে ঔদ্ধত্যের সাজা দেয়।

এম্‌নি একটা অঞ্চল থেকে বাঘের দৌরাত্ম্যের খবর পেলাম।

চম্পকারণ্যের পথে

সকলেই শিকারী নহে। ডান দিকের চতুর্থ ব্যক্তি মোহনলাল —পৃঃ ১৮

এই নিরক্ষর চাষীদের খবরে বাহুল্য থাকে প্রচুর। বাঘটা বার হাত কি চৌদ্দ হাত—তার পায়ের দাগ হাতীর পায়ের দাগের চেয়ে বড়। বিভিন্ন লোক তাদের নিজেদের আতঙ্কের পরিমাণ অনুযায়ী বাঘের দৈর্ঘ্য ও পাঞ্জার বর্ণনা দেয়।

আমি পার্শ্বচর মোহনলালকে সঠিক সংবাদের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। মোহনলালের বর্ণনায় বুঝে নিলাম সেখানকার বাঘ চাষীদের বর্ণিত সতরঞ্চ-ডোরা টাইগার নয়। লেপার্ড ছাড়া ও অঞ্চলে টাইগার দুর্লভ। বাঘ নিতান্তই বেপরোয়া—গ্রামের গো-মহিষ প্রায় শূন্য হয়েছে!

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা হল। শিকার হবে দিনের আলোতে নয়—রাত্রে। আনাড়ী চাষীরা যে কোন কাজেই আসবে না আমি তা জান্‌তাম। এরা হয় বাঘকে দূর জঙ্গলে তাড়িয়ে দেবে না হয় বাঘের কবলে প্রাণ খোয়াবে। এরা জঙ্গলে ইট পাটকেল ছুঁড়বে—শিকারী দেখলে আবালবৃদ্ধ-বনিতা কোলাহল তুলবে। নিঃশব্দে শিকার প্রচেষ্টার কোন সুযোগই দেবে না। এ অঞ্চল পরিক্রমার সময়ে আমি দেখেছি আঙ্গিনায় শায়িত দশ বারজন জোয়ান লোকের নিকট-সান্নিধ্য থেকে খোঁটায় বাঁধা গরুকে বাঘ আক্রমণ করে সেখানে বসেই নির্ভয়ে অর্দ্ধেকটা খেয়েছে! কাঁচা ঘরের সুদৃঢ় কঞ্চির দেয়াল ভেঙ্গে গৃহস্থদের কোলাহল অগ্রাহ্য করে বাঘ ঘরের ভিতর থেকে ভেড়া মুখে ক'রে নিয়ে প্রস্থান ক'রেছে। গোশালা থেকে ক্রমাগত পর পর তিন দিন তিনটা গরু নিয়ে গেছে—চতুর্থ দিনের গরুটার প্রকাণ্ড দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই তার মাংস ও হাড়গোড় চিবিয়ে খেয়েছে গোশালার বাহিরেই। ভুক্ত মাংসের পরিমাণ দেখে আমি বুঝেছিলাম এই শেষোক্ত স্থানে হয়ত বাচ্চা সহ একাধিক বাঘ ও বাঘিনীর আবির্ভাব হ'য়েছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে বাঘ একাধিক হ'লেও ক্রমান্বয়ে চারটে গরু

মেরে ফেলার ভিতরে এই জাতীয় বাঘের হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। আগেই বলেছি এরা অনেক সময়েই মানুষ বা অন্য জন্তুকে খামোকা আক্রমণ করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যা করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন—একটা জীবন্ত সিংহ অথবা একটা টাইগারের সম্মুখীন হওয়া যদি বা চলে একটা লেপার্ডের মুখোমুখি হওয়া চলে না। এইজন্যই লেপার্ড শিকারে মাচা-শিকারের প্রথা অলঙ্ঘ্য। বিশেষজ্ঞদের এই সাবধান বাণীতে আমার এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমার বর্ত্তমান শিকার ক্ষেত্রে মাচা-শিকারের কোন সুযোগ আমার ছিল না। মটর রাস্তায় রেখে আমাদের দু'কোশ পথ পায়ে চলে যেতে হবে। এ অঞ্চলে আমার বহু শিকার-পর্য্যটনের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী ননী আমার সাথেই আছে। ননীর উৎসাহ প্রচুর কিন্তু চাঞ্চল্য নেই। সে সংযত এবং স্বল্পভাষী। ননী সাহিত্যিক—সে কবি। বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের কাছে তার রচিত গান বিশেষ সমাদৃত। বিপদে তার ক্ষিপ্রতা আছে কিন্তু বিমূঢ়তা নাই। বাঘের সম্মুখীন হ'য়েও অচঞ্চল ননী নিমেষে হাতের মধ্যে পৌঁছে দেয় গুলীভরা বন্দুক। তন্ময়তা তার অসাধারণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কোন জানোয়ার তার চোখে এড়ায় না। জানোয়ার গুলীবিদ্ধ হ'লে সে চেঁচায় না। শিকার সময়ে সহচরদের শিকারীর উপরে যে অসীম নির্ভরতা ও অখণ্ড বিশ্বাসের প্রয়োজন এই সস্মিত ও সদা সপ্রতিভ যুবকের তাহা প্রচুর মাত্রায় আছে।

মাঘের অপরাহ্ন। ফাল্গুনের এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু সমস্ত তরুলতার দেহে একটা সাড়া এসেছে। চোখে যা দেখা যায় তার চেয়ে বেশী দেয় অনুভূতি। শারদীয়া পূজার প্রথমে আসে রৌদ্রের রংএ কেমন পিঙ্গল আভাস; সরোবরের জলে আসে নীল আভা। মাঘের অপরাহ্ণে ও পল্লী প্রকৃতিতে কেমন আসে একটা চেতনা, একটা অস্ফুট আয়োজন। মৃদু হাওয়ায়

শীতের তীব্রতা নাই, আছে স্নিগ্ধ বীজন। তরুলতা-ঘেরা তৃণাস্তৃতা সমতলভূমি মনের কোণে জাগিয়েছে অনির্ব্বচনীয় পুলক। পথ চ'লতে চ'লতে ভুলে গেছি আমরা শিকারী। আমাদের লক্ষ্য বন ভ্রমণ। আমরা খুঁজছি আমাদের হারিয়ে যাওয়া পল্লী-মাকে—'কি শোভা, কি ছায়া গো'। গ্রামের বট, অশ্বত্থ, শিমুল পলাশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সখ্য যে চিরন্তন তার আভাস পাচ্ছি প্রতি পদক্ষেপে। ছোট ছোট আগাছা ও গুল্মগুলি পল্লী-বালকের মতই আমাদের জানাচ্ছে—অভিবাদন, আনন্দ ও প্রীতি। সূর্য্যাস্তের পরেই কিন্তু আমাদের পথযাত্রার উদ্দেশ্য উপলব্ধ হ'ল। ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পথ চলায় সতর্কতা এসেছে। এক কৃষকের বহিরাঙ্গণে তৈরী চা খেয়ে আমাদের জঙ্গল পরিক্রমা আরম্ভ হ'ল। অনাবশ্যক দু'একজন সঙ্গীকে পশ্চাতে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ডানদিকে ফাঁকা প্রান্তর—বাঁয়ে জঙ্গল। আমরা জঙ্গলের দিকটা পরীক্ষা ক'রে দেখব। হঠাৎ একটা জানোয়ারের আওয়াজ পেলাম—ফেঁউ ডাকছে। এ জানোয়ারগুলো ভয় পেলেই এমনি ডাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে। ফেঁউ'র চীৎকার তারই এলার্ম। যে কৃষকের আঙ্গিনায় আমরা 'চা' খেয়েছিলাম সেই কৃষক জানিয়েছিল এ দিকটাতে বাঘ রোজই হানা দেয়। তাদের কুটীরের আশে পাশে আনাগোনা করে। গরু, বাছুর, কুকুর, ভেড়া যা জোটে মুখে ক'রে নিয়ে যায়। চীৎকার গ্রাহ্য করে না—তাড়াহুড়োয় ভয় পায় না।

খুব হুসিয়ার হয়ে পথ চ'লেছি। ননী নীরব, কিন্তু অদূরে অমল নিরন্তর বাঙ্ময়। আজ তার মুখেও শব্দ নাই। আমার অনুশাসন সে মেনে নিয়েছে। প্রত্যেক জঙ্গল ঝোপঝাড় তীক্ষ্ণ নজরে যতদূর সম্ভব নিরীক্ষণ করে আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি—নিশাচর তস্করের মত। পিঠে একটুখানি মৃদু স্পর্শ, হাতের ইসারা,

রাতের শিকারের এই ভাষা। মাঝে মাঝে গাছের ডালপালায়—টর্চের আলো ফেলে দেখ্‌ছি। এ জানোয়ার বৃক্ষারোহণে বিশেষ পটু। মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়াও অসম্ভব কি! এই দিকটায় নিবিড় অরণ্য নেই। প্রায়ই আগাছার জঙ্গল। বাঁশঝাড়, গুল্মলতা। কিন্তু এই জানোয়ারের লুকিয়ে থাকার পক্ষে এ রকম জঙ্গলই যথেষ্ট।

হঠাৎ ডানদিকে একটা জানোয়ার দেখা গেল। এর উপবেশনের ভঙ্গী দেখে আমার সন্দেহ হ'ল এ লেপার্ড। মোহনলাল টর্চের আলোটা সরিয়ে ফেলেছে। আমি বিরক্ত হ'য়ে তার হাত ধরেছি। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ও জানালে ওটা শেয়াল। যে মুহূর্ত্তে জানোয়ারটাকে দেখেছি সেই মুহূর্ত্তে ননী আমার হাতে বন্দুক দিয়েছে। কিন্তু আমার হুকুমে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল জানোয়ারটা নেই। এক নিমেষে বেমালুম সে অন্তর্হিত, এতটুকু শব্দ নেই আশ্চর্য্য। এদের দেহে কি অস্থি মাংসের লেশ টুকু নেই! ছায়ার মত সরে যায় বিদ্যুতের গতিতে!

'টর্চ দেখাও—এদিকে—এগিয়ে চল—গাছের উপরে দেখ,' মোহনলালের উপরে আমার হুকুম চলছে। হঠাৎ বাঁদিকে দুটো চোখ জ্বলে উঠেছে আবার সেই মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য। তার পর চলল আমাদের পরস্পরের লুকোচুরি ও সন্ধান। জানোয়ারটা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। আশ্চর্য্য এর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা আশঙ্কা এই জানোয়ারটা আমাদের সর্ব্বদাই দেখ্‌ছে। আমরা ওকে দেখতে পাই নে। আমাদের গতিবিধি, চলাচলে তার তীক্ষ্ণ নজর। আত্মগোপনে তার জোড়া নেই। অতর্কিত আক্রমণে লেপার্ডের মত ক্ষিপ্র জানোয়ার দুর্লভ। আমার এতটুকু অসতর্কতায় সঙ্গীরা বিপন্ন হ'তে পারে। বাঘ আবার অদৃশ্য হ'য়েছে! যদিও আমি নিশ্চয় জানি সে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। যতবার সে

চোখে প'ড়েছে তার উপবেশনের ভঙ্গীতে উল্লম্ফনের আয়োজন। এই তার স্বভাব ও সংস্কার। জলপাইগুড়ির বাঘের আচরণ স্মরণ হ'চ্ছে। আমাদের মটর দেখে, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনেও সে পালিয়ে যায় নি। সামনের রাস্তাটা অতিক্রম করে আবার সেই উল্লম্ফনের ভঙ্গীতে যেখানটায় বসে ছিল সে আমাদের মটর থেকে একফুট মাত্র দূরে। দুদিন আগে এই বাঘ তিনজন শিকারীকে জখম করেছিল মারাত্মক ভাবে।

আমার অপর সঙ্গীদ্বয়ের মনের অবস্থা আমি জানি নে। হয়ত তারা এর বিপদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ; অথবা মনে ভেবেছে এ বাঘ নয় হয়ত শেয়াল বা অন্য জানোয়ার। কিন্তু আমাদের এই সন্ধান ও উত্তেজনায় তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে, আমার অজ্ঞাত সারে। আমার কাছে আছে সে, ভালই হল। এদের জন্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল কম নয়।

হঠাৎ ডান দিক থেকে একটা জানোয়ার উল্কাবেগে আমাদের পেছন দিকে ছুটে গেল। অন্ধকারে ও জানোয়ারের অস্তিত্ব স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। এক নিমেষে মোহনলাল টর্চ ফেলছে, সেই মুহূর্ত্তে আমিও ফায়ার ক'রেছি। বাঘটা লাফিয়ে উঠেছে, একটা ঘোংরাণে গর্জ্জন সেই মুহূর্ত্তে আবার গুলী ছুঁড়েছি, "বাঘ পড়েছে।" সঙ্গীরা চীৎকার তুলেছে, 'খবরদার, এগিও না' হুকুম জানিয়ে অনাবশ্যক হ'লেও আমি আর একবার গুলী ছুঁড়েছি। হিংস্র জানোয়ার শিকারে এই নিয়ম অলঙ্ঘ্য। আমাদের পশ্চাতে এই বাঘের ব্যবধান ছিল মাত্র দশ গজ।

হরিণ, শম্বর ও অন্যান্য

হরিণ নানা জাতীয়। এদের মধ্যে শম্বর ও বারশিঙ্গা বৃহত্তম। আমি শম্বর অনেক শিকার করেছি কিন্তু বারশিঙ্গা কখনো চোখে পড়েনি। সাধারণতঃ মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে এদের দেখা যায়।

শম্বরের রং কতকটা ধূসর। রোমগুলি কর্কশ। মদ্দা শম্বরের মাথায় বিরাট শিং, মুকুটের মত বিরাজ করে। গয়া ও হাজারীবাগে শম্বরের শিং বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও প্রসারিত। হরিণ হিংস্র জানোয়ার নহে এইজন্য সাধারণ লোক হরিণ শিকারকে নির্দ্দয়তা বলে অভিহিত করেন। হরিণ বাঘের মত মানুষ ধ'রে খায় না—ইহা যথার্থ; কিন্তু হরিণ মানুষের কোন অপকার করে না এই ধারণা ভ্রান্ত। যে অঞ্চলে হরিণ আছে সে অঞ্চলে কৃষকদের পক্ষে এমন মহা অনিষ্টকর সর্ব্বনাশা জানোয়ার আর নাই। এই জানোয়ার রাত্রে ফসলের ক্ষেতে দলে দলে প্রবেশ ক'রে এবং কৃষকদের সযত্ন রক্ষিত এবং প্রভূত পরিশ্রমে প্রস্তুত শস্যক্ষেত্র নিঃশেষে আহার করে। এইজন্য ধান অড়হর বা অন্য ফসলের গাছ বড় হলেই কৃষকেরা শিকারীকে আহ্বান করে। তথাপি এই অহিংস জানোয়ার মানুষের প্রধান খাদ্যগুলির যে বিরাট অপচয় করে তার ইয়ত্তা নেই। চিত্র হরিণ বা চিতল যার ব্রাউন দেহের সর্ব্বাঙ্গে সাদা চাকা দাগ ও শম্বর এবং কৃষ্ণসার হরিণ বিশেষ ভাবে ফসলের প্রধান অন্তরায়।

হরিণ শিকারে বাঘ শিকারের মত থ্রিল না থাকলে ও প্রচুর কৌতুক ও উত্তেজনার সঞ্চার করে। রাত্রের শেষ দিকটায় ভোরের কিছু আগে শিকারীরা পায় হেঁটে এদের গতায়াত পথে হরিণের

অনুসরণ করে। দুপুরে বন পর্য্যটন ক'রে এদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সন্ধ্যায় বনের মধ্যস্থলে অরণ্যের পাশে এদের দেখা যায়। চিতল হরিণ খুব গভীর জঙ্গলে বাস করে না, কিন্তু শম্বর পাহাড় ও ঘন অরণ্যবাসী এইজন্য এদের দেহের লোমগুলো কর্কশ। চিতলের মত কোমল ও মসৃণ নহে।

আমাদের শিকার পর্য্যটনে বহু শম্বর মারা পড়েছে। মাথা ও ঘাড় সহ এদের বিশাল ও বিস্তৃত শিং মাউণ্ট করে গৃহ-সজ্জার উপকরণ হিসাবে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা চলে। এই দৃশ্য আমাদের সুখ দুঃখ ভরা বহু অরণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। সহরের গৃহ-কোটর গত অলস জীবন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছা হয় সেই পার্ব্বত্য জীবনের কঠোর পরীক্ষায়।

হরিণ শিকার সহজসাধ্য নয়। নূতন শিকারী গুলী ছুঁড়েই মনে করেন হরিণটা পাওয়া গেল। আমরাও এরকম মনে করতাম। কিন্তু ঘাড়ে গুলীবিদ্ধ না হ'লে গুরুতর ভাবে জখম হরিণও তীরবেগে ছুটে পালিয়ে যায়, আর তার সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে আছে একটা ধাবমান হরিণ লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে একটা চিতল হরিণের একটা পা ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গা পা খানা উঁচু ক'রে হরিণ যে তীব্র বেগে ছুটেছিল তাতে আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে ছিলাম। আর একটা রাইফেলের গুলী এর লাঙুলের কাছে প্রবেশ করল। হরিণটা একবার পড়ে গিয়ে আবার ছুটে পালাল। প্রচুর দুঃখ ও বিরক্তিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার এই পলায়মান হরিণের উপরে গুলী ছুঁড়েছিলাম। ভূপতিত দেহটা ধরে যখন এক শিকারী ওকে তুলতে গিয়েছিল তখন এই হরিণটা এমন পা ছুঁড়েছিল যে শিকারীর বুড়ো আঙুলে ও অনামিকার মাঝখানটা ভীষণ ভাবে ছিঁড়ে গেল। এর অনতিকাল পরেই দূরে একটা শম্বর হরিণ দেখতে পেয়ে গুলী ছুঁড়তেই বিরাট শম্বরটা

তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে গেল। গুলী এই শেষোক্ত হরিণের গলায় লেগেছিল।

আর একবার আর একটা শম্বর উচ্চলম্ফে খাদ গহ্বর ও ঝরণা পেরিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ফায়ার করতে ঘাড়ে গুলী লেগে প'ড়ে গেল। লাফ দেওয়ার সময় যখন জমি থেকে হরিণের পা শূন্যে উঠে ছিল ঠিক সেই মূহূর্ত্তে এর ঘাড়ে গুলী লাগে। অথচ আমাদের এক বন্ধু একটা ছোট হরিণের গায়ে গুলী মেরে ছিলেন। হরিণটা তার মাচার নীচে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক হঠাৎ তার বন্দুকটা ছুঁড়ে মারলেন ওর গায়ে। ভেবেছিলেন এই আঘাতে আহত হরিণটা পড়ে যাবে কিন্তু তেমনি কুরঙ্গ গতিতেই সে পালিয়ে গেল—জখম হল বন্দুকটা।

উদাহরণ অসংখ্য আছে কিন্তু তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা এই ঘাড়ে বিদ্ধ না হলে আহত হরিণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

শোণ নদীর বালুচরে মাথায় চূড়ার মত শিংওয়ালা কালো হরিণ প্রচুর দেখা যায়। এরা সর্ষে ক্ষেতের ভিতরে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে চোখে কিছুই দেখা যায় না, হঠাৎ একদিকে সামান্য একটুখানি শব্দ পেয়ে দেখি পায়ের খুরে বালু উড়িয়ে উল্কাবেগে ছুটেছে একটা জানোয়ার। অন্যূন হাজার গজ দূরে না গিয়ে একবারও পশ্চাতে তাকায় না।

চিতল, শম্বর, কৃষ্ণসার এইরূপ হরিণ ছুটে পালাবার সময়ে মাথার অপূর্ব্ব অলঙ্কার অথচ বহু ভারী শিং পিঠের উপরে এমন ভাবে শুইয়ে দিয়ে ছুটে পালায় যাতে বনজঙ্গলে শিং আটকে না যায়। এই দৃশ্য দেখতে বিশেষ উপভোগ্য।

চিঁকারা হরিণ হাজারীবাগ অঞ্চলে মেরেছি। মাথায় দুটী শিং। অন্য হরিণের মত শিংএ ডাল-পালা নেই। শিং দুটী বক্র

তরঙ্গায়িত দেখতে স্পাইরাল সিঁড়ির মত। হরিণের মাংস সুস্বাদু কিন্তু চিঁকারার মাস উৎকৃষ্ট।

নীল গাই হরিণজাতীয়, কিন্তু অনেক হিন্দু নাম-সাদৃশ্যের জন্য এই হরিণ শিকার করে না। কিন্তু চাত্রা অঞ্চলে পাহাড়ীরা ও পালামৌর অধিবাসীরা এর মাংস আনন্দের সঙ্গে আহার করে। শাহাবাদ, সারণ, গোরখপুর জিলায় গঙ্গার উচ্চতট দেশে ফাঁকা ময়দানে এদের প্রচুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বার্কিং ডিয়ার বা কোটরা হরিণের দেহ ব্রাউন। মাথার শিং ছোট। কোন কোন ঋতুতে এই শিং ভেলভেটে ঢাকা থাকে। এই ভেলভেট ঢাকা শিং দেখা গেলে শিকার নিষিদ্ধ। এই কোটরার ডাক গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ। এরা জঙ্গলে বাঘ দেখলে ভীষণ ডাকে। শিকারী এবং অন্যান্য জানোয়ার বুঝতে পারে বাঘের চলাচল সুরু হ'য়েছে। আরও বহু প্রকার হরিণ আছে তার অধিকাংশই সম্বর বা চিতলের তুলনায় ক্ষুদ্র!

শূয়োর বা বন্য বরাহ শিকারে থ্রিল প্রচুর। ইংরেজ শিকারীরা ঘোড়ায় চড়ে তাড়িয়ে বল্লমের সাহায্যে বরাহ শিকার করে। এতে বিপদ প্রচুর কিন্তু স্পোর্টের উত্তেজনা অপরিসীম। এইরূপ শিকারকে পিগ ষ্টিকিং বলা হয়। আমার কখনও পিগ ষ্টিকিং-এর সুযোগ হয়নি। রাইফেলের সাহায্যে পর্ব্বতময় অরণ্যপথে বরাহ শিকার করেছি। এদের বিপুল বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘ দন্ত, কষ্ট-সহিষ্ণুতায় এরা বড় হিংস্র জানোয়ারের অন্তর্ভুক্ত।

বরাহ বিশেষ ভাবে দুর্দ্ধর্ষ এবং আহত অবস্থায় এরা ভীষণ জিঘাংসু। পায়ে হেঁটে বরাহ শিকার বিশেষভাবে বিপজ্জনক। আমার এক বন্ধু একবার আহত শূয়োরের চার্জ থেকে অতিকষ্টে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমাদের একটি অনুচর একবার শূয়োরের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত এবং সংজ্ঞা শূন্য হ'য়ে মৃতবৎ পড়েছিলেন।

বহুদিনের চিকিৎসায় তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এমন বৃহদায়তন ও বৃহদ্দন্ত বরাহ দেখতে পাওয়া যায়—যা সচরাচর দুর্লভ। একবার আমার গুলীতে নিহত একটা শূকরকে তুলে আন্‌তে পাঁচজন লোক হিমসিম খেয়েছিল। ডাঃ চৌধুরী এমন আর একটা শূয়োর মেরে ছিলেন। সে শব্দে তাঁর রাইফেলের গুলীর সঙ্গে আমার কর্ণপটাহ ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ঘাড়ে বিদ্ধ হ'লে বরাহও অন্যান্য জানোয়ারের মত অবিলম্বে মারা যায়। আমার মনে আছে একবার আমার রাইফেলের গুলীতে একটা শূয়োরের ঘাড় ভেদ করে আরও একটা শূয়োরকে ঐ গুলী সাংঘাতিক ভাবে জখম ক'রেছিল। বরাহের মাংস সুস্বাদু। পাহাড় অঞ্চলে এর চাহিদার অন্ত নেই। বাঘও শূয়োরের মাংস বিশেষভাবে পছন্দ করে।

আমাদের প্রায় প্রত্যেক শিকার পর্য্যটনে শূয়োর বা শম্বর মারা যেত। বাঘের শিকারে যে ব্যবস্থা ও আয়োজন আবশ্যক বরাহ শিকারের তার প্রয়োজন হয় না। এর বিশেষ কারণ বরাহের সংখ্যা বিপুল। বাঘ জীবিত জানোয়ার ধরে খায় এই জন্য আত্ম-গোপনে অভ্যস্ত। স্বাভাবিক সংস্কারও তার গভীর কিন্তু শূয়োরের খাদ্য আক, বিশেষ গাছের শিকড় এবং কচু এই সব খাদ্য আহরণে তার আত্মগোপনের প্রয়োজন হয় না। এরা নিশীথ রাতে স্ত্রী পুরুষ ও শাবক সহ দলে দলে বিচরণ করে। আক্রান্ত হলে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে প্রবল ভাবে আক্রমণ করে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে। যে শিকারী এইভাবে আক্রান্ত হয় সে দুর্ভাগ্য।

হায়না দেখ্‌তে বিকট, স্বভাবে হিংস্র। এরা ছোট ছোট জানোয়ার শিকার করে বাঘেরই মত। দেহের খানিক অংশে বাঘের মত ডোরা বা ষ্ট্রাইপ্‌স্‌ আছে। আয়তনে শেয়ালের চেয়ে বড়—লেপার্ডের চেয়ে ছোট। দাঁতগুলি দেখ্‌তে ভীতির সঞ্চার করে।

সুদৃঢ় ও সুতীক্ষ্ণ দাঁতে জ্যান্ত ছাগল ভেড়ার মাংস ছিঁড়ে খায়। আমি অনূ্যন দুইশত দূরে একটা হায়নাকে রাইফেলে গুলী ক'রে মেরে দিলাম। এই হায়না তখন মুমূর্ষু, কিন্তু আমরা নিকটে যেতেই এর চোখ এবং ব্যাদান করা মুখের দুই পাঁটী ভীষণ দাঁতের চেহারা দেখে মুখখানা মাউন্ট করে রাখার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু যাদের কাছে তৈরী করতে দেওয়া হয়েছিল তারা চামড়া-খানাকে নষ্ট করে ফেলেছে।

জঙ্গলে আর দুটী ছোট জানোয়ার আমার বিশেষ কৌতুক উদ্রেক ক'রেছে সে শজারু ও বজ্রকীট। শজারু দিনের বেলায় গর্ত্তের ভিতরে বাস করে, রাত্রে বেরিয়ে আসে কচু জাতীয় ফসলের সন্ধানে। পাঁড়াগায়ে এগুলি মাঝে মাঝে দেখা যায়। কৃষকের কচুর ক্ষেত সাবাড় করে দিতে এর বেশী দিন লাগে না। এর সর্ব্বাঙ্গে সূক্ষ্মাগ্র কাঁটা। ভয় পেলে এই কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠে। এই তীক্ষ্ণ কাঁটার সাহায্যে এরা আত্মরক্ষায় উদ্যত হয়। গ্রাম্য শিকারী গর্ত্তের মুখে কাঁটা কুড়িয়ে পেলে বুঝতে পারে গর্ত্তে শজারু আছে। তখন গর্ত্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জানোয়ারকে বার করার চেষ্টা করে। শজারুর মাংস সুস্বাদু। একখানা বইতে প'ড়েছিলাম একটী মৃত বাঘের পেটে প্রচুর শজারুর কাঁটা পাওয়া গিয়েছিল। অনুমান এই কাঁটাগুলিই বাঘের মৃত্যুর কারণ।

বজ্রকীট গোসাপের মত জানোয়ার। দৈর্ঘ্যে বড় গোসাপের মতই পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত। গায়ে শল্ক আছে। শুনেছি এই আঁশগুলো অর্শরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে ময়ুর, বন মোরগ ও তিতির শিকারীদের তাঁবুতে আহার্য্য-হিসাবে উপাদেয়। আমি নেপাল সীমান্তে ময়ুর শিকার করেছি কিন্তু মাংস আস্বাদ কখনো করিনি কিন্তু শুনতে পাই ময়ুরের মাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ব্যাঘ্রীর জীবন কথা

সে ছিল সুবিশাল অরণ্যের ব্যাঘ্রী। শৈশবের আর কিছু তার মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু তার মা ও ভাইকে। এক অন্ধকার গহ্বরে ছিল তাদের আবাস। ভাই ছিল মাথায় আরও বড়, তার গায়ের জোরও ছিল অনেক বেশী। দিন তার সুখেই কাট্‌ত। ভাই ছিল খেলার সঙ্গী, মা দিতেন স্তন্যধারা—স্নিগ্ধ গুহায় ছিল অকুণ্ঠ নিদ্রা। মাত্র দু' মাস আগে তাদের জন্ম হয়েছে—সেই বর্ষা-রাতে। গুহার মুখ ছেড়ে আজও তারা কোথাও যায়নি। জননীর যত্নেরও কোন ত্রুটী ছিল না। শিকার সন্ধানের সময়টুকু ছাড়া শাবক দুটিকে আগলে রাখত দিনরাত। ইদানীং এক আধটা দিন বাইরেও কাটিয়ে দিত। মার এই অনুপস্থিতি কালে ভাই বোন কখনও বেরিয়ে যেতনা। ক্ষুধা পেলে মার আগমনের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকত পথের দিকে।

দিন যায়—দিনে দিনে তাদের বাড়্‌ছে শক্তি, বাড়্‌ছে কৌতূহল। গুহার বাইরে তাদের খেলা জমে। রাত্রে সুকোমল বেলে পাথরের শয্যায় মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত নিদ্রা। বাইরে জঙ্গলে ঝিঁঝি ডাকে। একটা নদী ছিল মাইলটেক দূরে। ভক্ষ্য জানোয়ার ছিল প্রচুর। আরাম ও উপভোগের কোন অভাব ছিল না।

দিন গড়িয়ে চলে। একদিন প্রথম শিহরণ জাগল ভয়ের। জন্তু জানোয়ারের ভয় নয়। ভয় হ'ল মানুষের। বাঁশ বোঝাই একটা গরুর গাড়ীকে চালিয়ে নিচ্ছিল একটা মানুষ। ঘর্ঘর শব্দে গাড়ীটা ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। মার মুখে তখন

এল গর্জ্জন,—একবার, ছু'বার, তিনবার। চতুর্দ্দিকে আর কোন শব্দ নাই। বীটারদের অগ্রগতি বন্ধ হ'ল। তারা সকলেই গাছে চড়েছে—বানর যেমন গাছে চড়ে গর্জ্জন শুনে।

অনেক সময় কেটে গেল। মাঝে মাঝে শোনা যায় কোলাহল গাছের উপরে সেই টং টং এর আওয়াজ। শুধু একদিক সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু সে দিকে যাওয়া চ'লবেনা, কোন ক্রমেই নয়।

ব্যাঘ্রী দাঁড়িয়ে আছে এক ঠাঁয়ে চোখে তার জ্বলন্ত আগুন অবজ্ঞা আর শাসন জানাচ্ছে বীটারদের। খানিক পরে সন্তর্পণে এগোচ্ছে সেই কোলাহল হীন পথে সপ্তাহ পূর্ব্বের সেই সঙ্কটাকুল গাছের দিকে। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সেই উদার প্রসারিত পর্ব্বত দেহ। ওখানে পৌঁছে গেলে আর তার ভয় নেই। এই পাহাড় তাকে টানছে—মুক্তি এই পথে। এক ঝলকে—এক ঝটকায় পৌঁছে যাবে এই পাহাড়ে। এই বেষ্টনী, গাছের উপরের ঐ রোমাঞ্চকর দৃশ্য আর কোলাহল ব্যাঘ্রীর অসহ্য! হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের মত ছুটল পাহাড়ের দিকে—কিন্তু কি ভীষণ সম্মুখেই গাছের ডালে রাইফেলে নিশানা বাগিয়ে বসেছে সেই ভয়ঙ্কর মানুষ—নিষ্ঠুর-নিয়তির মত মৌন-নির্ব্বাক!

"—গুম্"—আর কিছুই সে জানলে না—দেহ তার অসাড়। *

দুর্গম পথে দুর্জ্জয়কে জয় করার যে প্রয়াস তাতে ব্যর্থতার গ্লানি নেই। আজ শিকার জীবনের সকল সার্থকতা বা ব্যর্থতা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। নির্জ্জন অরণ্যপথে চলেছি—অরণ্যের ক্ষুদ্রতম শব্দ উৎকর্ণ ক'রে তুলছে। প্রতি পদক্ষেপে শঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা চরমে চ'ড়ছে। বাঘের খবর পাওয়া গেল—কোন ব্যবস্থায়, কোন আয়োজনে তাকে খুঁজে পাব তার প্রয়াস চ'লছে

* ডব্লিউ হোপার্ট টড অঙ্কিত।

দেহে ও মনে। জঙ্গলে বিচরণ পথে হয়ত সে আমাকে দেখছে—আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিনা। হয়ত তার আকস্মিক আবির্ভাব আমাকে অভিভূত করে দেবে তাই প্রতি মুহূর্ত্তে চলছে শৌর্য্যের পরীক্ষা—প্রতি নিমিষে তার থ্রিল। শিকার পর্য্যটনের এই অনুভূতি ব্যর্থতার ভিতরে এনে দেয় অদ্ভুত আনন্দ।

রাজন্যদের বিরাট রাজসিক আয়োজনে এই থ্রিল ও আনন্দের পরিমাণ সম্পর্কে আমার সংশয় আছে। যে শাসনকর্ত্তা জীবনে পাঁচ শত বাঘ মেরে রাজ্যময় দেয়ালীর আলো জ্বেলে উৎসব কচ্ছেন আমার চোখে তার চেয়ে দীপ্ত সুন্দর বনের ঐ নগ্নপদ আয়োজনহীন শিকারী। আধুনিক অস্ত্র সম্ভার নেই, অনুচরের বাহুল্য নেই, বুকে আছে অফুরন্ত সাহস, বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে—অপ্রমেয় শৌর্য্য। একনলা গাদাবন্দুক সম্বল করে চলেছে দুর্জ্জয়ের সন্ধানে গহন বনে।

আমাদের শিকার প্রয়াস চ'লেছে অব্যাহত। ব্যর্থতায় হতাশা নাই। প্রত্যেক সুযোগে ছুটে যাচ্ছি জঙ্গল অভিমুখে। সন্ধান চলে বাঘের, গল্পগুজব চলে বাঘের কিন্তু শিকারে জোটে, ভালুক, শূয়োর, হরিণ, শম্বর। শিকার শুধু বিশেষ অরণ্যাংশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। এর উদ্যোগ পর্ব্ব থেকে প্রত্যাবর্ত্তন এই সব নিয়ে এ সম্পূর্ণ ও সমগ্র। হিংস্র জানোয়ার নজরে এল কি দুম্ করে একটি গুলীতে মারা গেল, এইটুকুই এর সব কথা নহে। রহস্যময়ী প্রকৃতি, রহস্য ভরা এর বিচিত্র অরণ্য। এর অলি গলি গিরিগুহা, গহ্বর সবই সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এখানে বাঘ ঘুমিয়ে থাকে দুপুরে, রাত্রে প্রকাশিত হয় এর স্বরূপ। ঝড়, বাদল, অন্ধকার রাত্রে এর বিচরণ অব্যাহত ও সাবলীল। আমার পথ যাত্রায় এ দুরন্তের সন্ধান চলে মানস নেত্রে, অরণ্যে সেই প্রয়াস হ'য়ে ওঠে বাস্তব।

[library stamp]

মাঝে কেন বাজায় কি যন্ত্রগুলো—টং-টং—ট্যাং-ট্যাং একঘেয়ে একটা ভীতিদায়ক আওয়াজ! এক আধবার এক আধটা মানুষও চোখে পড়ে—নদীর তীর দিয়ে আপন মনে চলে যায় অর্দ্ধনগ্ন নগণ্য দেহ। ব্যাঘ্রী তখন আড়ালে লুকোয় কিন্তু মানুষটা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বুকের কাঁপুনি আর থামেনা!

সে একটা দিন—

জানোয়ারগুলো আজকাল সেয়ানা হয়েছে। গত রাত্রে কোন খাদ্য জোটেনি—বস্তুতঃ তিনটে রাত গিয়েছে এমনি ফাঁকা। আজ ক্ষুধায় তার পেট জ্বলছে। সন্ধ্যায় নদীর খাত ধরে বরাবর চলেছে শিকার সন্ধানে। অদূরে একটা জানোয়ার দেখা যাচ্ছে না? তাইত জানোয়ারটা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছেনা! সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যাঘ্রীকে সে দেখ্‌তে পায়নি। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে একটা ঝাঁপ দিয়ে ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছে জানোয়ারটার। জানোরারটা বাঁধা ছিল একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে। এক ঝটকায় সেটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। তারপর মোষটাকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে। এবারে সে মাংসের ড্যালা ছিঁড়ে নিয়ে গিল্‌ছে—মাংস, রক্ত। আঃ কি ক্ষিধেই পেয়েছিল—খাওয়ার আর শেষ নাই—আহার চলল ভোর পর্য্যন্ত। আকাশের তারাগুলো তখন নিষ্প্রভ হয়ে আস্‌ছে—শুধু দু'একটা জ্বলছে জ্বল-জ্বল্ করে। ব্যাঘ্রী চ'লল নদী কিনারে জল খেতে—বড্ড তেষ্টা। জল পান ক'রলে রাশি রাশি। আবার সে ফিরে এল মোষের লাশটার কাছে। আবার মাংস খাচ্ছে তাল তাল। আর নয়—এবারে তার ঘুম পাচ্ছে। শিকার ছেড়ে দূরে সে যাবেনা—আবার খাওয়া হবে সন্ধ্যায়। ততক্ষণ সে ঘুমোবে। তৃপ্তিভরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

দুপুরে—

ঘুরে আশ্রয় নিলে একটা দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বাঁশবনের শীতল ছায়ায়।

দিন কেটে যায়—কাটে—পরে মাস। মনে আর কোন ক্ষোভ নাই। শিকারে সে সিদ্ধহস্ত। আহার্য্য সুলভ। নূতন অরণ্য নূতন পরিবেশ। দেহে—শক্তি অপরিমেয়—অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফুটছে লাবণ্য—গতিভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। কি আনন্দ শিকার সন্ধানে—কি অপূর্ব্ব সুখ পশুহত্যায়—রক্ত, মাংসের দৃশ্য ও স্বাদ কি অনির্ব্বচনীয়। তবু ছুটো ভয় লেগে আছে মনের কোণে—মর্ম্মে ফোটা কাঁটার মত। বন্য কুকুরের ভয়, আর মানুষের ভয়। বন্য কুকুর রাত্রে পথ চলেনা—তাকে সে গ্রাহ্য করেনা। কিন্তু মানুষটাই কেমন অতলস্পর্শ দেহে জাগায় রোমাঞ্চ!

তবু দিন কাটে—

কার্ত্তিক মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস শুকনো ঋতু। এই সময়টা মধ্যাহ্ন কাটিয়ে দেয়—গভীর বনে—প্রগাঢ় নিদ্রায়। ঘুম ভেঙ্গে যায় বেলাশেষে পাখীর ডাকে। বনের সুগন্ধ নাকে আসে। শুক্‌নো পাতার সুকোমল শয্যায় শেষ বারের মত গড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিকার সন্ধানে। শিকারের সে কি চমৎকার অনুভূতি—কি আনন্দঘন শিহরণ! কি আনন্দ জাগে জানোয়ারের অনুসরণে! অন্ধকার অরণ্যভূমি নিথর, নিষ্কম্প। আরণ্য দ্রুম দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ মুখে। নিজের দেহের ইন্দ্রিয় আর শিরা উপশিরা সন্ধান জানায়—শব্দহীন বনচারী জানোয়ারের। তার পরে সেই হুঁসিয়ারী সন্তর্পিত অনুসরণ। ক্রমে নিকটে আরও নিকটে—একটা আকস্মিক অতর্কিত লম্ফ—হত্যা—আরও পরে রক্ত আর মাংসের সেকি নিবিড় স্বাদ!

তবু ভয় ঘোচেনা—

ভয় করে ঐ দূর বস্তীর মানুষের কোলাহল। তারা মাঝে

অগভীর জলাশয়ের ধারে। পেছন থেকে শোনা গেল ছল্ ছল্ খল্ খল্ জলের শব্দ। জল পেরিয়ে আস্‌ছে কতগুলো কিম্ভূত কিমাকার হিংস্র মুখ। এগুলো বন্য কুক্কুর একটা মুখ বেরোল ঝোপের আড়াল থেকে। মুখ... ক'রে, দাঁতগুলো বিকাশ ক'রে একটা আওয়াজ কর্লে। গর্জ্জন নয়—হুইস্‌লের ঢঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার। ওদের কি একটা সঙ্কেত। জানোয়ারটার কি কুৎসিৎ বুনো মুখ—লেজের শেষ প্রান্তে একগোছা ঘন লোম—রং তার কালো। দেহের বর্ণ লাল। ঐ তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গেই ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ—শুক্‌নো পাতা মাড়ানোর শব্দ। মুহূর্ত্তে বাঘিনীকে ঘিরে ফেলেছে এদের অনেকগুলো। এরা যে বাঘকে কিছু মাত্র ভয় কচ্ছে না বাঘিনীর সেই হ'ল সব চেয়ে বড় ভয়! একটা জানোয়ার বাঘিনীর পেছনে একটা চাঁটী মারলে। সে বিরক্তি ভরে ঘুরে দাঁড়াতেই আর একটাতে কামড়ে দিলে তার ঘাড়ের কাছে। একলাফে সে তাড়িয়ে গেল সেটাকে। তখন চতুর্দ্দিকে শুধু হিংস্র মুখ আর দাঁত! কয়েকটাকে তাড়িয়ে ফিরে এসে দেখে আট দশটা জানোয়ার তার ক্ষুধার খাদ্য হরিণটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। নিজের শ্রান্ত দেহের অনেকস্থানে জখম। প্রকৃতি জননীর একটা উপদেশ সে মেনে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিলে। ওরা অনেকগুলো, শিকারও তার পক্ষে দুর্লভ নয়। চ'লল সে নূতন শিকার সন্ধানে। সেদিন আর গুহাবাসে ফিরে যাওয়া হ'ল না। পরদিন ভোরে যখন সে ফিরে এল—গুহামুখে দেখা গেল রক্তের ছাপ। গৃহ তার শূন্য। শাবক দু'টীর চিহ্ন মাত্রও নাই। এই বন্য কুক্কুরগুলো তাদের খেয়েছে নিঃশেষে। প্রতিহিংসা জেগে উঠ্‌ল ভীষণ। কিন্তু মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শঙ্কা! এবারে হৃতশাবক উদাসিনী ছেড়ে দিলে তার পুরাণো ঘর বাসস্থান। ক্রোশের পর ক্রোশ

কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তার মা নিরুদ্দেশ হ'য়েছে তার সেই ভাবী বর বড় বাঘের সঙ্গে। সেদিন কিশোর বাঘ দু'টী হাড় ও চামড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

দিন যায়—তাদের মা আর ফিরে আসেনা। প্রথম দিন তারা লক্ষ্যহারা ঘুরে বেড়াল বনে বনে। ক্রমে ক্ষুধার জ্বালা হল অসহ্য। দু'জনে তখন একসঙ্গে বেরিয়েছে শিকার সন্ধানে। সেদিন কিশোরী মেরে ফেল্‌ল একটা হরিণ শিশুকে। মহানন্দে যখন হরিণ শিশুকে টেনে নিয়ে গপ্ গপ্ ক'রে খাচ্ছে পেছন থেকে কে করলে তাকে প্রচণ্ড আঘাত। এক আঘাতে সে উল্টে পড়ে গেল। আততায়ী আর কেউ নয় তারই খেলার সাথী তার চেয়ে বলিষ্ঠতর তার ভাই যুববাঘ। শিকারটাকে নিয়ে সে খেতে আরম্ভ ক'রছে গোটা দেহটা আগ্‌লে। বোন নিকটে এলে তাঁকে দাঁত খিচিয়ে তাড়িয়ে দেয়। নিজে সবটা না খেতে পারুক—বোনকে এক টুক্‌রোও দেবেনা!

দিন যায়—এবার এই সুবিশাল অরণ্যে কিশোরী একাকিনী। নিঃসঙ্গ পথিক। শিকার ধরা এখন সহজ হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—অংশভাগী নাই। প্রচুর খাদ্য ও শিকার চর্চ্চায় ফুটে উঠেছে দেহের শক্তি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য।

এমনি সহজ জীবনযাত্রায় একদিন জুটে গেল তার প্রণয়ী। আর সে কিশোরী নয় এবার সে যুবতী। কয়েক মাস পরে নিজেই প্রসব করলে দুটী মোটা মোটা বাচ্চা। তারা এখন খেল্‌ছে তার স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতলে। বুকের কাছে টেনে নিয়ে তাদের দেয় স্তন্য দুগ্ধ। সাবধানে তাদের গুহায় রেখে বেরিয়ে যায় শিকার সন্ধানে। এই শিকার পর্য্যটনে সে আর একবার ভয় পেলে—এই দ্বিতীয় বার। এবারে মানুষ নয়—এক পাল ছোট ছোট বীভৎস মুখের লাল জানোয়ার। একটা হরিণ মেরে ব্যাঘ্রী খাচ্ছিল একটা

কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। প্রকৃতি দিয়েছে এই সংরক্ষণকারী গাত্রাবরণ। গাছের ফাঁক দিয়ে রৌদ্রের যে পিঙ্গল আলোর রেখা গায়ে পড়ে তার বর্ণ মিশে যায় দেহের পিঙ্গল প্রভায়! তাদের ঘুমন্ত দেহের এই এলায়িত ভঙ্গী দেখে মনে হয় আলোছায়ায় বিচিত্র অরণ্যাংশ। বেণুবনের ছায়া তলে, ঝোপঝাড়ের নীচে প্রকৃতির আরণ্য অঞ্চলে তারা বেড়ে উঠেছে কৈশোরে।

আবার দিন যায়। সেদিন হঠাৎ মার আচরণ গেল ব'দলে। সেখানে স্নেহের বদলে এল রূঢ়তা! একটা শম্বরী মেরে আগ্‌লে বসে আছে তাদের মা। ভাই বোন এল তাদের অংশ নিতে। মা'র সেদিন কি বিরক্তি আর রাগ! বিরাট ছু' থাপ্পড় লাগিয়ে দিল তাদের দুই মাথায়। দাঁত খিচিয়ে আর গোংরাণো গর্জ্জনে তাদের দু'জনকে তাড়িয়ে দিলে অনেক দূরে! এমন আর কখ হয় নি। মুখ কাঁচু মাচু ক'রে ভাই বোন তখন জঙ্গলের আড়া থেকে দেখ্‌ছে তাদের জননীর সেই পেটুকের মত খাওয়া। কিন্তু মা'র ভাগ্যেও এই একলা খাওয়া আর চ'ললনা। যে নদীর খাতে তাদের মা শম্বরটাকে খাচ্ছিল—সেখানে পড়ল একটা দীর্ঘছায়া; নিকটে দাঁড়িয়েছে আর একটা বৃহত্তর জানোয়ার। হঠাৎ স্তব্ধ রাত চিরে গেল একটা বিকট গর্জ্জনে। কি কর্ণ-বধিরকারী আওয়াজ! ভাই বোন ভয়ে কাঁপছে। তাদের মা গড়িয়ে পড়ল মাটীতে বালুশয্যায়। স্পষ্ট বোঝা গেল তাদের মা কাতর মিনতি জানাচ্ছে এই আগন্তুক বাঘকে। বাঘটা মাকে আর কিছু বললেনা শুধু শম্বরের লাশটাকে টেনে নিয়ে খেতে বসে গেল।

মাংসটা অনেকখানি খেয়ে নির্ভীক ভারিক্কি চালে নদীর দিকে চলে গেল জল খেতে। বাঘকে এগিয়ে যেতে দেখে কিশোর ও কিশোরী ভয়ে পালিয়ে গেল দূর বনে। ভোরের দিকে যখন তারা সন্তর্পণে ফিরে এল তখন সেখানে কয়েক টুক্‌রো হাড় ও চামড়া ছাড়া

বিরক্তি আর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। সে মাঝে মাঝে দাঁত বের করে বিরক্তি প্রকাশ কচ্ছিল কিন্তু তার আচরণে তার মা যে খুবই ভয় পেয়েছিল তাতে সন্দেহ ছিল না, বিশেষতঃ, গাড়ীর চালক মানুষটা যখন গরু দুটোকে উৎসাহ দিতে চেঁচাচ্ছিল। গাড়ীটা এগিয়ে আসতেই হঠাৎ তার মা লাফিয়ে পালিয়ে গেল গুহার ভিতরে। এই ভয় কেমন করে অভিভূত কর্লে দুই ভাইবোনকে। মাকে অনুসরণ করে আশ্রয় নিলে তার কোলের ভিতরে—ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ। রাত্রে অন্ধকার না হতে আর তারা গুহা ছেড়ে বেরোল না। পরদিন আবার সেই ঘর্ঘর শব্দ, গাড়ী চালকের অদ্ভুত আওয়াজ, সেই অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য আতঙ্ক। এ গুহায় বাস করা আর চলে না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে চলে গেল তারা নদীর ওপারে—যে দিকে মানুষের কোলাহল নাই।

আরও দিন যায়। এখন শাবক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মা ঘুরে বেড়ায় শিকার সন্ধানে নদীর ধারে ধারে অরণ্যপথে। প্রথম দিন শাবক দুটী আধ মাইলটেক গিয়ে আর যেতে পার্লেনা। মা চলে গেল খানিকটা দূরে। যখন সে ফিরে এল তার মুখে আর পায়ের থাবায় কি যে সুগন্ধ! সুস্বাদু রক্তের গন্ধ আর স্বাদ। বাচ্চাদের সাথে নিয়ে গেল নদীর কিনারায়। যেখানে সে মেরে রেখে এসেছিল একটি শম্বরের শিশুকে। এই দিন হ'ল তাদের কাঁচা মাংস ভোজনের হাতে খড়ি। জীবনে যে এত সুখ ও আনন্দ আছে ভাই ও বোন আগে তা কি জানত।

এখন মাংসে স্পৃহা তাদের বেড়েই চলেছে। মায়ের দুধে আর স্বাদ নেই। ক্রমেই তারা বাড়ছে আয়তনে, বাড়ছে তাদের সৌন্দর্য্য, দেহের শক্তি। বাহিরে ঘোরাফেরার সময় এখন হচ্ছে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর। বিশ্রাম হ'ত অন্ধকার গহ্বরে নয়,—জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে। মধ্যাহ্নের এই বিশ্রামে তাদের দেহের বর্ণ আর অরণ্যের রং-এ

তারপর বিলম্বিত উদর প্রসারিত ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়ল তারই সান্নিধ্যে।

ভোরের সূর্য্য লাল হয়ে উঠ্ছে দিক চক্রবালে। ক্রমে উঠ্ছে সে উপরে গাছের মাথায় আরও উপরে। প্রান্তরে কি দুঃসহ গ্রীষ্ম! কিন্তু ব্যাঘ্রীর আশ্রয়স্থল কি সুস্নিগ্ধ সুনিবিড়।

মধ্যাহ্নে—

নিঃশব্দে নালাপথ ধরে চ'লেছে সারি সারি মানুষ। জঙ্গলটা তারা ঘিরে ফেলেছে। বাঘ তখন গভীর নিদ্রায়। একজন শিকারী উঠেছে সেই বৃক্ষ শাখে। সপ্তাহ পূর্ব্বে যে মাচায় ব'সেছিল আর একজন শিকারী। ব্যাঘ্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ। সমস্ত জঙ্গলটা জুড়ে আবার সেই আবার সেই—

টং টং ঢং ঢং আওয়াজ। কান ফেটে যাচ্ছে মানুষের চীৎকারে—যেমন হ'য়েছিল সেই এক হপ্তা আগে। মুহূর্ত্তে ছুটেছে বাঘ সেই নালাপথ ধ'রে নয়—সেদিনের বিপদ সে আজও ভোলেনি। ছুটেছে সে পাহাড় লক্ষ্য ক'রে। হঠাৎ গাছের উপরে কিসের শব্দ—ঠুক্—ঠুক্—ঠুক্—ঠুক্—! বুকের ভিতরে তারই প্রতিধ্বনি জেগেছে ধুক্—ধুক—ধুক্—ধুক, হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ! গাছের ডালের দিকে তাকিয়েছে—আবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রোমাঞ্চকর! মানুষ বসে আছে একলক্ষ্যে তারই দিকে তাকিয়ে। ছুটল সে নালার দিকে—নালা পেরিয়ে যাবে পাহাড়ের দিকে। আবার সেদিকেও ঐ একই শব্দ! উপরে চেয়ে দেখ্ছে গাছে গাছে ঐ মানুষের আর অন্ত নাই! শুধু গাছের ডালে শব্দ করে না—তারা কাস্ছে চেঁচাচ্ছে! আবার ফিরে এল সে বেষ্টনীর মধ্যভাগে। সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল বিহ্বল, বিমূঢ়! ওদিকে হাকোয়া মানুষগুলো এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ বাঘের দিকে! সেই হৃৎকম্পকারী চীৎকার—টং—টং—ঢং—ঢং আওয়াজ! ব্যাঘ্রীর বিরাট জঠর থেকে বেরিয়ে

একটু বিশ্রাম চাই। শিকার ধরা দূরের কথা। রাত্রে আশ্রয় ছেড়ে আর সে বা'র হ'লনা।

কয়েকটা দিন—

ক্ষুৎ পিপাসায় ব্যাঘ্রী কাতর। শিকারগুলো ধরা যাচ্ছে না। জানোয়ারগুলো কেমন করে শুনে ফেলে তার পায়ের শব্দ! ঘাড়ের কাছে ক্ষত জায়গাটায় পচন ধ'রেছে—দেহটা দারুণ অসুস্থ। দিন রাত সে পড়ে আছে নিশ্চল নিথর।

এক সপ্তাহ পরে—

আবার নালাপথ ধরে চলেছে সে ধীর গতিতে। জঠর জ্বালা তার দুর্বিবসহ। অদূরে একটা মোষ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য্য যে মোষটাকে সে মেরেছিল এক সপ্তাহ আগে ঠিক সেই মহিষটা দাঁড়িয়ে সেই একই জায়গায়। শিকারের সংস্কারবশে ব্যাঘ্রীর দেহ হল সঙ্কুচিত—শিকার ধরার ভঙ্গীতে মাটীতে পেট ছুঁইয়ে সে নিরীক্ষণ কচ্ছে এক ঘণ্টা ধরে। যেমন করে বেড়াল গর্ত্তের মুখে বসে থাকে ইঁদুরের প্রতীক্ষায়। তবু সংশয় কাটছেনা। কিন্তু রাতের বাতাসে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রীর নাকে নিয়ে এল সেই স্বাদময় গন্ধ। সুস্বাদু মোষের সেই তৃপ্তিভরা গন্ধ। সমস্ত দেহ তার ক্ষুধার্ত্ত। এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা অসম্ভব। মনের গভীরে সংস্কার ব'লছে "এগিওনা"—কিন্তু ক্ষুধা তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মোষের দিকে—নিকটে আরও নিকটে—দেহ তার মিশেছে নত হ'য়ে মাটীর সঙ্গে! তারপর একটা লাফ। মোষটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জঙ্গলের আড়ালে। খাবলে খুবলে দাঁতে করে ছিড়ে নিচ্ছে মাংসরাশি সেই বিরাট মুখ-গহ্বরে যত আঁটে। তারপরে আবার। গোটা মোষটাকে বুঝি একবারেই খেয়ে ফেলতে পারে! কিন্তু জল খেতে হবে—চ'ল্ল সে নদীর দিকে। জল খেলে অনেকটা, আবার সে ফিরে এসে মাংস খাচ্ছে, কড়মড় ক'রে চিবুচ্ছে হাড়।

একঘণ্টা পরে—

হঠাৎ আবার দেহে তার শিহরণ আজ এই তৃতীয়বার। ব্যাঘ্রীর প্রখর শ্রুতিশক্তি তাকে জানিয়ে দিলে—তার ঠিক মাথার উপরে পায়ের শব্দ মানুষের। বিরতিহীন মানুষের পদধ্বনি—যেমন ক'রে তারা অনুসন্ধান করে। আবার বুকটা কাঁপছে ভয়ে—তাকে হত্যার চেষ্টা কচ্ছে ঐ মানুষ! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—গুহার এক প্রান্ত ধরে ক্ষিপ্র বেগে সে এগিয়ে গেল গহ্বরের মুখে। কি ভয়ানক—সামনেই আবার সেই দুঃসহ মানুষ! একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চাপা গর্জ্জনে একবার জানালে তার দুর্জ্জয় ক্রোধ। মানুষটা ততক্ষণে ছুটে উপরের পাহাড়ে চড়ে যাচ্ছে। বাঘ উপরে চড়বেনা এই তার ধারণা। কিন্তু ব্যাঘ্রী জ্বল্‌ছে প্রতিহিংসায়—মানুষের এই দম্ভ তার অসহ্য। এক লম্ফে বেরিয়ে ছুটে গেল সে আততায়ীকে লক্ষ্য করে। এক থাবায় উল্টে দিলে ক্ষীণকায় মানুষটাকে—দাঁতে চিবিয়ে দিচ্ছে তার জঙ্ঘাদেশ। ব্যাঘ্রীর কাছে মানুষটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তবু দারুণ যন্ত্রণায় সেই মানুষ দুই ক্ষীণ মুঠিতে ধরেছে ব্যাঘ্রীর কানের দুইদিকের রোমরাজী—তার গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিতে তার পা-খানাকে। দুটী মুখ তখন পরস্পরের মুখোমুখী। মানুষটা আর্ত্ত আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখ্‌ছে প্রতিহিংসা-দীপ্ত বাঘের চোখ দুটো—আর ব্যাঘ্রী দেখ্‌ছে সেই ভয় জাগানো বুক কাঁপানো মানুষ। ব্যাঘ্রীর দাঁতের দংশন মুক্ত করে নিলে মুহূর্ত্তে—এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঐ হাল্কা নগণ্য দেহটাকে দূরে পাহাড়ের গায়ে। এই মর্ম্মঘাতী সর্ব্বনাশা দৃশ্য থেকে ব্যাঘ্রী ছুটে পালিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালু অতিক্রম করে নীচের দিকে। অদূরে সেই গাছের নীচে জটলা কচ্ছে আবার একদল মানুষ। সে দিকটাও এড়িয়ে ছুটে গেল সে দূর অরণ্যে। দেহের স্বচ্ছন্দ গতি আর নাই—কঠিন হ'য়ে আস্‌ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। একটু বিশ্রাম—

কিন্তু সন্ধ্যা অবধি বিশ্রাম তার অদৃষ্টে ছিলনা। ঘুম ভেঙ্গে গেল দুঃসহ কোলাহলে। একটা দারুণ বিস্ময় বুকের ভিতরে একটা দুরু দুরু জাগানো ভয়ের অনুভূতি! সেই দূর বস্তীর টং টং শব্দগুলো তাকে ঘিরে ফেলেছে—চীৎকার শোনা যাচ্ছে মানুষের কণ্ঠের! এত নিকটে এমন বিকট কোলাহল সে আর কখনো শোনে নাই। ব্যাঘ্রী সত্যিই ভয় পেয়েছে। মানুষেরা জঙ্গল পেটাতে সুরু করেছে তিন দিক থেকে। কোলাহল অসহ্য তাই ব্যাঘ্রী এগিয়ে যাচ্ছে কোলাহল-হীন সম্মুখের দিকে একটা অগভীর নালার রাস্তা ধরে। কিন্তু বেশী দূর তার এগিয়ে যাওয়া হ'ল না। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ হ'ল একটা গাছের উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড়ের দিকটায় একটা বিষম যন্ত্রণা। সে আঘাতে সে উল্টে পড়ে গেল মাটীতে—কয়েকটা সেকেণ্ড কোন সংজ্ঞাই তার ছিল না। চেতনা ফিরে এল কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই—আত্মরক্ষার স্বাভাবিক সংস্কারে। সর্ব্ব শক্তি সংহত করে সে লাফিয়ে উঠেছে খাড়া হয়ে। সেই মুহূর্ত্তে আবার সেই বজ্র বিস্ফোরণ! এবারে তার দেহে চোট লাগেনি। দুই পায়ের মাঝখানে একরাশ বালু উচ্ছৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এক রাশ ধোঁয়ার মত। ব্যাঘ্রী ছুটেছে উল্কা বেগে—নালার উল্টো দিকে—আবার সেই প্রলয়ঙ্কর শব্দ তার পেছনে। এবারেও আঘাত লাগেনি। ছুট্‌ছে সে নালা অতিক্রম করে—এক ঝলক আগুনের মত। বাঁয়ে ঢালু পাহাড়দেহ। ছুটছে সে পাহাড় বেয়ে—দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে—ঘাড়ের বেদনা জাগছে তীব্র হ'য়ে। আর খানিকটা গেলেই তার পুরাণো আবাস। সেই প্রিয় পরিচিত গহ্বর। দেহটাকে টেনে ঢুকে পড়ল সেই আশ্রয়ে। আঃ কি স্নিগ্ধ নিঃশব্দ আশ্রয়। এক ঘণ্টা সে পড়ে রৈল নিথর দেহে। খস্‌খসে জিভটা দিয়ে ক্ষত জায়গাটা চেটে দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু জিভ সেখানে পৌছায় না।